মাসুদ রানা

অরক্ষিত জলসীমা

কাজী আনোয়ার হোসেন

এক

নিজের অফিসে বসে একটু একটু ঘামছে শায়লা শারমিন। তার ব্লাড প্রেশার এখন একটু বেশি। গলাটাও শুকিয়ে যাচ্ছে। এ-সবই মাত্রা ছাড়ানো কৌতূহল ও উত্তেজনার ফল।

মায়ানমার, রাজধানী ইয়াংগন। ইসলামাবাদ টাওয়ার। বিকেল চারটে।

আটতলা এই টাওয়ারের উপরের দুটো ফ্লোর নিয়ে পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর আঞ্চলিক হেডকোয়ার্টার।

কান খাড়া হয়ে আছে শারমিনের। বারবার দৃষ্টি ছুটে যাচ্ছে ইন্টারকমের দিকে। অপেক্ষা করছে, এমিডিয়েট বস্ কখন ওকে ডাকবেন। বিকেল চারটের পর হাতে কোনও কাজ রাখতে নিষেধ করা হয়েছে তাকে, আজও বস্-এর চেম্বারে ডিউটি দিতে হতে পারে।

ওর এমিডিয়েট বস্ কর্নেল আজমল হুদা, পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর রিজিওনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর। পাকিস্তানের পাঞ্জাবে জন্ম এই সুদর্শন ও সুপুরুষ অফিসারকে অত্যন্ত মার্জিত ও মিষ্টভাষী হিসাবে চেনে শারমিন।

ছয় ফুট দু'ইঞ্চি লম্বা সে। গায়ের রঙ গাঢ় তামাটে। কাঠামোটা সুগঠিত পেশির সমষ্টি। টিয়াপাখির মত খাড়া নাক। চোখের শ্যেন দৃষ্টি ঠাণ্ডা ও অন্তর্ভেদী।

মাত্র দু'বছর হলো করাচী থেকে ইয়াংগুনে বদলি হয়ে এসেছে কর্নেল হুদা।

শারমিনের জানা নেই সে যাকে মার্জিত ও মিষ্টভাষী হিসাবে চেনে, সেই একই ব্যক্তি প্রতিপক্ষের লোকজনের কাছে কী রকম সাক্ষাৎ আজরাইল। বিশেষ করে ধরা পড়া যে-সব লোককে ইন্টারোগেট করে কর্নেল আজমল হুদা, প্রথম দশ মিনিটেই পরনের কাপড়চোপড় নষ্ট করে ফেলে তারা। বছর দু'তিন আগে, করাচীতে, ইন্টারোগেট করবার সময় তিনজন ভারতীয় ও একজন বাংলাদেশী এজেন্টকে জেরা করতে গিয়ে মেরে ফেলেছে সে।

এসপিওনাজ বিভাগে চাকরি করে ঠিকই, তবে কমপিউটার সেকশনের কর্মী হিসাবে এত কিছু জানবার কথা নয় শারমিনের।

জানলে আজকের এই মারাত্মক প্ল্যানটা তার মাথায় আসত না।

চার বছর আগে আপন চাচার সুপারিশে সাধারণ একজন কমপিউটার অপারেটর হিসাবে এই অফিসে ঢুকেছিল শারমিন।

একাগ্রতা, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতা থাকায় পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর চাকরিতে ভালই উন্নতি করেছে মেয়েটি, গত বছর কমপিউটার সেকশনের প্রধান করা হয়েছে তাকে। এমিডিয়েট বস্ কর্নেল আজমল হুদা তার কাজে অত্যন্ত সন্তুষ্ট, তাকে খুব বিশ্বাসও করে।

টপ সিক্রেট অনেক ফাইল নিজের চেম্বারের বাইরে বের করতে রাজি নয় হুদা, কাজেই ওই ফাইলের কিছু যদি কপি বা প্রিন্ট করতে হয় অমনি তার চেম্বারে ডাক পড়ে শারমিনের। কাজটা কী বুঝিয়ে দেওয়ার পর কখনও লাঞ্চ খেতে চলে যায় হুদা, কখনও পিসিআই ডিরেক্টর সোবহান মানজার-এর খাস কামরায় জরুরি মিটিঙে বসে। চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় প্রতিবার শারমিনকে মনে করিয়ে দেয়, দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ

করে দাও।

প্রায় প্রতি মাসেই দু'একবার বসের বাড়িতে যেতে হয়েছে শারমিনকে—কখনো কাজে কখনো পার্টিতে। সেই সূত্রেই জানতে পেরেছে তার বস্ আজমল হুদা ও মায়ানমার সামরিক জান্তার আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসক জেনারেল উ নিমুচি পরস্পরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

অফিস ও বাড়ি, দু'জায়গাতেই বেশ কিছুদিন গুরুতর কোনও একটা বিষয়ে আলাপ করেছে পাকিস্তানী ও বার্মিজ এই দুই বন্ধু, সেই আলাপের অংশবিশেষ শারমিনের কানে এলেও সব কথার অর্থ করতে পারেনি সে।

মাস তিনেক আগে একটা পার্টিতে শুরু হয় তাদের দুজনের বিশেষ আলাপটা। কাছাকাছি ছিল শারমিন, তাকে দেখেও সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি তারা। দুজনেই বোধহয় ধরে নিয়েছিল বার্মিজ ভাষা কিছুই বুঝবে না সে, তা না হলে তার সামনে এভাবে গোপন বিষয়ে কথা বলবে কেন। আসলে কিন্তু নিজের চেষ্টায় স্থানীয় বার্মিজ ভাষাটা বেশ ভালই শিখে নিয়েছে শারমিন।

প্রসঙ্গটা আজমল হুদাই তুলেছে। 'আপনাদের প্রতিবেশীর সীমানায় পড়েছে, আপনি কি এমন কোনও জিনিসের কথা জানেন?'

'জানি বৈকি,' জবাব দিয়েছে জেনারেল উ নিমুচি। 'বিষয়টা নিয়ে আমিও আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলাম। সীমানায় পড়েছে তো কী হয়েছে, ইচ্ছে করলে ওই জিনিস আমরা যে-কেউ নিজেদের কাজে লাগাতে পারি। পাকিস্তান দূরে হলেও, আমাদের দেশ তো প্রায় গা-ছোঁয়া। কাজেই এ থেকে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হতে চাইলে আসুন, আমার সঙ্গে একটা চুক্তি করুন।'

দুজনের পরবর্তী একটা আলাপ থেকে শারমিন বুঝতে পারে,

তাদের আলোচ্য বিষয় ছিল পঞ্চাশ বছর আগের একটা বার্মিজ জরিপ। জরিপটা কী নিয়ে বা কীসের উপর, তা শারমিন জানতে পারেনি।

জেনারেল উ নিমুচির ভাষায়–জরিপের ফলাফল সম্পর্কে মায়ানমার শুধু এই কারণেই চুপ করে আছে যে এতে তাদের কোনও স্বার্থ নেই।

হুদার ভাষায়, তার সরকারও মুখ খুলবে না, কারণ পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া অংশটার ভাল কিছু দেখতে চায় না তারা।

কাজেই দু'দেশের ফাইলই চাপা পড়ে গেছে অনেক কাগজের নীচে।

আজমল হুদাকে দেওয়া জেনারেল উ নিমুচির প্রস্তাবটা ছিল এরকম: প্রয়োজন মত বিশ্বস্ত লোকজন সংগ্রহ করুন। মায়ানমার সরকারের পারমিশন চাইবেন আপনি, প্রশসানের তরফ থেকে আমি সেটা করিয়ে দেব। যৌথ মালিকানায় একটা কোম্পানি কাজ শুরু করবে। পুঁজি যোগান দেবে আমার ব্যাঙ্ক ও বিমা কোম্পানি, আপনি ম্যানেজমেন্টের দিকটা দেখবেন। আমাদের কোম্পানি ট্যাক্স দেবে সরকারকে, ব্যস, মায়ানমার সরকার খুশি থাকবে। লাভের টাকা আপনার আর আমার মধ্যে ভাগ হবে□আধাআধি।

এরপর নানা রকম লক্ষণ দেখে বেশ বুঝতে পারছে শারমিন, প্রস্তাবটা একেবারে লুফে নিয়েছে আজমল হুদা। সময় নষ্ট না করে লোকজন বাছাইয়ের কাজও শেষ করে ফেলেছে সে, গঠন করা হয়েছে যৌথ একটা কোম্পানি। নতুন কোম্পানি বোধহয় তার কাজও শুরু করে দিয়েছে বা দিতে যাচ্ছে।

এ-সব হুদা করছে পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এ থাকা অবস্থায়। উ নিমুচি তাকে বলেছে: 'এটা ঠিক হচ্ছে না। তারচেয়ে

চাকরি ছেড়ে দিয়ে এ-দেশের নাগরিকত্ব চেয়ে আবেদন করুন, আমি দেখব সেটা যাতে মঞ্জুর হয়। আমার ভাতিজিকে তো দেখেছেন, অপরূপ সুন্দরী, আপনি তাকে বিয়ে করুন—নাগরিকত্ব পাওয়া পানির মত সহজ হয়ে যাবে। ব্যস, সব টেনশন শেষ, আপনাকে আর কখনও পাকিস্তানে ফিরে যেতে হবে না।'

পরামর্শটা ভালই লেগেছে হুদার।

এত কিছু শুনেছে, অথচ আসল বিষয়টা কী নিয়ে সেটা শারমিন ধরতে পারেনি। তবে তাদের রাখ-রাখ ঢাক-ঢাক ভাবই বলে দিচ্ছে সেটা অবৈধ ও বেআইনী কিছু না হয়ে যায় না। লক্ষ করবার মত আরও একটা বিষয় হলো, তাদের চাপা উল্লাস। বিশেষ একটি দেশের বিরাট ক্ষতি করা হবে ভেবে দুজনেই আনন্দে আত্মহারা। একেই বোধহয় বলে, কারও পৌষমাস কারও সর্বনাশ।

আজমল হুদার চেম্বারে বসে পিসি-তে কাজ করবার জন্য তৈরি হয়েছে শারমিন, সিকিউরিটি সেফ খুলে ডকুমেন্ট বের করছে আজমল হুদা□প্রায়ই এরকম হতে দেখা যায়। বস্ যখন কমবিনেশন লক খোলে, আপনাআপনি সেদিকে তার দৃষ্টি চলে যায়। এভাবে কখন যেন ডিজিটগুলো মুখস্থ হয়ে গেছে তার।

এই 'জ্ঞান'-ই প্ররোচিত করেছে শারমিনকে, জানতে হবে গোপন ব্যবসাটা তাদের কী। আর সেটা জানবার উপায় হলো ওদের মধ্যে যে চুক্তিটা হয়েছে সেটায় একবার চোখ বুলানো। নিজের চোখে দেখেছে সে, আজমল হুদার সিকিউরিটি সেফে রাখা হয়েছে ফাইলটা।

তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে শারমিন, সুযোগ পেলে আজই ফাইলটা দেখবে সে।

'পিপ্-পিপ্!' ইন্টারকম শব্দ করতেই ছলকে উঠল বুকের রক্ত, ঝট করে দাঁড়াতে গিয়ে পায়ের ধাক্কায় চেয়ারটা ফেলে দিল

শারমিন। সেটা সিধে করে রিসিভার তুলল সে, বসের প্রশ্নের জবাবে উর্দুতে বলল, 'জী, সার, বলুন–আমি শারমিন।'

'চারটের পর তোমাকে আমি ফ্রি থাকতে বলেছিলাম,' অপরপ্রান্ত থেকে মনে করিয়ে দেওয়ার সুরে বলল আজমল হুদা।

'জী, সার, আমার মনে আছে।'

'গুড, তা হলে সোজা আমার চেম্বারে চলে এসো,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল হুদা।

ব্যাপারটা শুরু হয়েছে, নিজেকে মনে করিয়ে দিল শারমিন। নিজের অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে করিডর ধরে এগোচ্ছে সে । হঠাৎ করে আশ্চর্য শান্ত ও দৃঢ় একটা ভাব চলে এসেছে তার মধ্যে, জানে ধরা না পড়ে কাজটা করতে হলে নার্ভাস হওয়া চলবে না। একটু আগের বুক ধড়ফড়ানি এখন আর নেই তার মধ্যে, এখন এমনকী ঘামছেও না সে।

এরপর কী হবে কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছে শারমিন। এবং বাস্তবে হুবহু ঠিক তাই ফলেও গেল।

কমপিউটার টাইপিং ও প্রিন্ট-আউট-এর কাজটা শারমিনকে বুঝিয়ে দিয়ে চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেল আজমল হুদা, বলে গেল ঘণ্টা দুয়েক পর ফিরবে সে। সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করে সিকিউরিটি সেফটা খুলল শারমিন। খুলে চোখ বুলাচ্ছে আজমল হুদা ও উ নিমুচির ব্যক্তিগত ডকুমেন্টটায়।

প্রথমে সাধারণ একটা ব্যবসায়িক চুক্তিপত্র বলেই মনে হলো, বেআইনী কিছু চোখে পড়ল না। তারপর শেষ দিকের দু'তিনটে কাগজে চোখ বুলাতে গিয়ে তার মাথাটা ঘুরে উঠল। ওগুলোয় মানচিত্র ও নকশা আছে। আরও আছে জটিল সব মাপজোক।

সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল শারমিন, গোটা ব্যাপারটা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অবিশ্বাস্য একটা ষড়যন্ত্র। শরীরে বাঙালী রক্ত বইছে, ওর সমগ্র অস্তিত্বে দেশপ্রেম যেন উথলে উঠল। সঙ্গে

সঙ্গে মনে পড়ে গেল মরহুম চাচা কর্নেল আরমান খান কী ছিলেন, সে নিজে কে, চাচা তাকে কী বলেছিলেন ইত্যাদি।

শারমিনের চাচা কর্নেল আরমান খান বাঙালী হলেও, মানুষ হয়েছেন দুই দেশে: বার্মা ও পাকিস্তানের পশ্চিম অংশে। একসময় পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর একজন কর্মকর্তা ছিলেন তিনি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পিসিআই থেকে অবসর নেন ভদ্রলোক, বার্মিজ স্ত্রী ইরাবতিকে নিয়ে মায়ানমারেই স্থায়ী ভাবে বাস করতে থাকেন।

বাবার সঙ্গে করাচিতে ছিল শারমিন। কমপিউটার সায়েন্সে মাত্র অনার্স কমপ্লিট করেছে, এই সময় হঠাৎ করে তিনি মারা যাওয়ায় খুব বিপদে পড়ে যায় সে। করাচির মত রক্ষণশীল শহরে একটি মেয়ের পক্ষে একা থাকা সম্ভব ছিল না। ফায়াজ শান নামে একটা ছেলেকে ভালবাসত, মাত্র দু'মাস আগে সে-ও ব্যারিস্টারি পড়বার জন্য লন্ডনে চলে গেছে। ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছে, কাছাকাছি কোনও আত্মীয়স্বজনও ছিল না। কাজেই একমাত্র নিকট আত্মীয় আরমান চাচার কাছে, মায়ানমারে চলে আসতে হয় শারমিনকে।

নিঃসন্তান আরমান খান দম্পতি সাদরে গ্রহণ করেন শারমিনকে। শারমিন চাকরি করতে চাওয়ায় সে-ব্যবস্থাও করে দেন চাচা।

ভাতিজিকে পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর রিজিওনাল হেডকোয়ার্টারে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার সময় চাচা বলেছিলেন, পিসিআই-এর এই আঞ্চলিক দপ্তরে বাংলাদেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে কিছু ঘটতে দেখলে শারমিন তাঁকে যেন অবশ্যই জানায়–তবে অবশ্যই নিজের নিরাপত্তা অটুট রেখে।

তার চাকরি হওয়ার পর মাত্র এক বছর বেঁচে ছিলেন কর্নেল আরমান খান। ওই এক বছর বাংলাদেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়

এরকম মাত্র এক কি দুটি বিষয় চোখে পড়েছে শারমিনের, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রিপোর্টও করেছে সে। তবে যাকে বলে স্পাই, তা শারমিন কখনও হয়নি, হতে চায়ওনি। রিপোর্টগুলো নিয়ে চাচা কী করতেন, কাকে দিতেন ইত্যাদি বিষয়ে তার কোনও আগ্রহ ছিল না। তিনি মারা যাওয়ার পর কেউ আর তার সঙ্গে যোগাযোগও করেনি।

শারমিন ভাবল, চাচা নেই তো কী হয়েছে, চাচী তো আছেন!

ডকুমেন্টটার বাছাই করা বিশেষ কিছু কাগজ, যেগুলোয় ম্যাপ, নকশা ও মাপজোক আছে, একে একে সবগুলো স্ক্যান করে কপি করল নিজের পেন ড্রাইভে। তারপর কর্নেল হুদার কমপিউটার থেকে মুছে ফেলল সব।

দুই

দুদিন পর।

ঢোলা একটা শার্ট পরেছে শারমিন। সাদা সিল্ক ভরে আছে কালো গোলাপ, সবুজ ঝোপঝাড় ও বহুরঙা প্রজাপতিতে। কোমরে রঙচটা, ছেঁড়া জিনস।

আবারও বসের চেম্বারে ডাক পড়েছে তার। আজ খুব সকাল সকাল, বেলা দশটারও আগে। করিডর ধরে এগোবার সময় একটু নার্ভাস ফিল করছে শারমিন। তারপর ভাবল, নাহ্, ঘাবড়াবার কোনও কারণ নেই। বদ্ধ ঘরের ভিতর সে কী করেছে,

কারুরই তা জানবার কথা নয়। তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছে সে, চেম্বারের কোথাও কোনও লুকানো ক্যামেরা ছিল না।

পেন ড্রাইভটা নিজের বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছে শারমিন। এমনভাবেই লুকিয়েছে যারা খুঁজবে তারা চোখের সামনে দেখতে পেলেও চিনতে পারবে না।

শহরতলীর ওই বিশাল বাগানবাড়ি মারা যাওয়ার মাত্র এক মাস আগে শারমিনের জন্যই কিনেছিলেন চাচা কর্নেল আরমান খান। পনের বিঘা জায়গা নিয়ে বাগানটা, বাগানের মাঝখানে দালান। দালানে ডাকাত পড়লে যতই চিৎকার করা হোক, প্রতিবেশীরা কেউ শুনতে পাবে না। তখন সিদ্ধান্ত হয়েছিল লন্ডন থেকে ফায়াজ শান সরাসরি ইয়াংগনে ফিরে শারমিনকে বিয়ে করে এই বাড়িতেই থাকবে।

কিন্তু চাচীর আপত্তি গ্রাহ্য না করে মহিলা হোস্টেল ছেড়ে একাই এত বড় বাড়িটায় বাস করছে শারমিন। চাচার আমলের পুরানো ও বিশ্বস্ত কিছু চাকরবাকর আছে, তারাই সব দেখেশুনে রাখে।

কাল রোববার ছুটির দিন, লেমিয়েথনা-য় যাবে সে–ইরাবতি চাচীকে পেন ড্রাইভটা দিয়ে আসবে। ইয়াংগন থেকে দেড়শো কিলোমিটার দূরে জায়গাটা, ছুটির দিন ছাড়া চাচীর খামারবাড়িতে যাওয়ার কোনও সুযোগ নেই। বিষয়টার গুরুত্ব বুঝে চাচী যা ভাল মনে হয় করবেন। একবার পৌঁছে দিতে পারলেই হলো, ব্যস, তার দায়িত্ব শেষ।

চেম্বারে ঢোকার সময় শারমিনের বুকটা ধড়াস করে উঠল।

রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিয়ে প্রায় শুয়ে রয়েছে আজমল হুদা, পা দুটো ডেস্কের উপর তোলা, আঙুলের ফাঁকে সদ্য ধরানো একটা বার্মিজ চুরুট। সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেল শারমিনের। বস্‌কে আগে কখনও এই ভঙ্গিতে দেখেনি সে।

নিজের আচরণে কর্নেল হুদাও যেন বিব্রত বোধ করল। তাড়াতাড়ি ডেস্ক থেকে পা নামিয়ে সিধে হয়ে বসল চেয়ারে। 'সরি,' মৃদুকণ্ঠে বলল সে, ঠোঁটে ক্ষমা-প্রার্থনার ক্ষীণ হাসি। 'এসো, বসো, সব খবর ভাল তো?'

যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়তে শুরু করল শারমিনের। স্বস্তি বোধটা এত প্রবল যে দুর্বল লাগছে শরীরটা।

'টেবিলে একটা জরুরি ফাইল আছে, শুধু আন্ডারলাইন করা লেখাগুলো টাইপ করে প্রিন্ট-আউট দিতে হবে।' কাজটা শারমিনকে বুঝিয়ে দিয়ে নিজেও একটা ফাইল টেনে নিয়ে খুলল কর্নেল হুদা।

ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসছে শারমিন। কামরার আরেক প্রান্তে চলে এসে কমপিউটারের সামনের চেয়ারটায় বসল সে, বসের দিকে খানিকটা পাশ ফিরে। মোবাইল ফোনটা জিনসের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল, ছোট্ট পার্সটা জায়গা পেল শার্টের পকেটে। এরপর কমপিউটার অন করল সে। সবশেষে হাত বাড়াল ফাইলটার দিকে।

মাঝপথে স্থির হয়ে গেল হাত। অকস্মাৎ ব্যথা করে উঠল বুক, কেউ যেন শারমিনের হৃৎপিণ্ড খামচে ধরেছে। তার সামনে টেবিলের উপর পড়ে রয়েছে কর্নেল আজমল হুদা ও বার্মিজ জেনারেল উ নিমুচির কোম্পানি 'মিউচুয়াল ভেঞ্চার'-এর ফাইল, যে ফাইলে তাদের ব্যক্তিগত ও গোপন ডকুমেন্টটা আছে। দু'দিন আগে এই ডকুমেন্টেরই ছবি তুলেছে শারমিন।

শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেল, বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে কপালে। নিজেকে প্রশ্ন করল শারমিন, ব্যাপারটা দৈবযোগ? নাকি কোনও কারণে তাকে সন্দেহ করা হয়েছে, সন্দেহটা ঠিক কি না বোঝার জন্য পরীক্ষা নিচ্ছে তার?

না বোধহয়। আবার হতেও পারে।

সেক্ষেত্রে স্বাভাবিক আচরণ করতে হবে তাকে, যেন কিছুই হয়নি। ফাইলটা খুলল শারমিন। আবার স্থির হয়ে গেল সে।

ফাইলের শুরুতেই তার একটা ফটো। ছবিটা খুব কাছ থেকে তোলা। কিন্তু এরকম কোনও ছবি কখনও তুলেছে বলে মনে করতে পারছে না শারমিন। তা হলে তার এই ছবি কে তুলল? কখন? কোথায়?

'ছবিটা কার, শারমিন?' নীরব কামরার ভিতর কর্নেল আজমল হুদার নরম, সকৌতুক কণ্ঠস্বর অবাস্তব শোনাল।

'জী, সা-সার?' ঢোক গিলতে হলো শারমিনকে, তোতলাচ্ছে। ঘাড় ফিরিয়ে বসের দিকে তাকাল। 'আ-মার, সার। আমারই ছ-ছবি।'

'তাই?' হেসে উঠল কর্নেল হুদা, যেন খুব মজা পেয়েছে। 'আরে, এতে এত নার্ভাস হবার কী আছে, বোকা মেয়ে! ওটা নিয়ে আমার ডেস্কের সামনে চলে এসো।'

হঠাৎ দম দেওয়া পুতুল হয়ে গেল শারমিন। কমপিউটার ছেড়ে ডেস্কের সামনে চলে এল সে। বসতে যাবে, কর্নেল হুদা বলল, 'উঁহুঁ, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকো। কারণ বসার পর আর তো ওঠার সুযোগ পাবে না।'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকল শারমিন। এতক্ষণে বড় আকারের কেটলিটা দেখতে পেল সে। কমকরেও সাত লিটার পানি ধরবে ওটায়। ডেস্কের উপর অত্যন্ত বেমানান লাগছে বেঢপ জিনিসটাকে, পাশে একটা গ্লাস।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে কেটলিটার দিকে তাকাল কর্নেল হুদা। 'ওটা থেকে এক গ্লাস পানি ঢেলে খাও তুমি।'

'জী... না, ধন্যবাদ,' বলল শারমিন।

'আই ইনসিস্ট,' হাসিমুখে বলল হুদা। 'পরিমাণে তো কম নয়, কাজেই তাড়াতাড়ি শুরু করলে শেষও করতে পারবে তাড়াতাড়ি।'

এক মুহূর্ত হাঁ করে কর্নেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল শারমিন। ঠোঁটের কোণে এক চিলতে বাঁকা হাসি নিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে তাকে কর্নেল।

পানি ঢালবার সময় কেটলির হাতলটা বেশ গরম লাগল শারমিনের। সাবধানে ছোট্ট একটা চুমুক দিল গ্লাসে। এরকম গরম পানি ঢক-ঢক করে খাওয়া সম্ভব নয়, থেমে থেমে খেতে হলো।

'আমি জানি আরও অন্তত পঁচিশ গ্লাস পানি না খেলে তোমার গলা ভিজবে না,' বলল হুদা। 'তবে তার আগে কাজের কথা শুরু করি এসো।' এক মুহূর্ত বিরতি নেওয়ার পর জানতে চাইল, 'ফটোটা কবে তুললে? কোত্থেকে?'

'কবে, কোত্থেকে... ঠিক বলতে পারব না, সার। মনে পড়ছে না,' কোনও রকমে বলল শারমিন, নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

'এটা আমার এই চেম্বারের সিকিউরিটি সেফে ফিট করা গোপন ক্যামেরার তোলা ছবি। সেফটা যে খুলবে তারই ফটো উঠে যায়,' বলল কর্নেল হুদা, এখন আর হাসছে না। 'তুমি খুলেছ, তাই তোমার ছবি উঠেছে। তোমাকে তো আমরা খুব ভাল মেয়ে বলে জানি। এরকম একটা কাজ কেন করলে, শারমিন?'

কী জবাব দেবে, চুপ করে থাকল শারমিন। তার বাথরুমে যেতে ইচ্ছে করছে।

'আই ইনসিস্ট,' যেন তার অবস্থা বুঝতে পেরেই বলল পিসিআই কর্মকর্তা, ইঙ্গিতে কেটলিটা দেখাল। 'আরও দু'গ্লাস। এবার ঢক-ঢক করে। আপাতত, যতক্ষণ না তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাও, এটাই তোমার শাস্তি।'

'আমার ভুল হয়ে গেছে,' বলল শারমিন, আতঙ্কে অন্তরাত্মা পর্যন্ত কাঁপতে শুরু করেছে তার। 'এরকম আর কখনো হবে না,

সার...'

'ভবিষ্যতে আর কখনও?' হেসে উঠল কর্নেল হুদা। 'এরপরও তুমি আশা করো তোমার ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকবে?' পরমুহূর্তে ক্ষিপ্ত বাঘের মত গর্জে উঠল সে। 'দুই গ্লাস! কুইক!'

'সার, আমি বাথরুমে যেতে চাই।'

'আই য়্যাম সরি।' বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে হুদা। 'যতই আনসিভিলাইয্‌ড্‌ শোনাক, যেটা বাস্তব সেটাই বলছি, প্রাকৃতিক কাজগুলো এখন তোমাকে লোকজনের সামনেই সারতে হবে—যতক্ষণ বেঁচে আছ।'

কেঁদে ফেলল শারমিন।

'অপমান ও অমর্যাদা থেকে বাঁচতে হলে সত্যি কথা বলতে হবে,' জানাল হুদা। 'আমি জানতে চাই, কে তোমাকে এই কাজটা করতে বলেছে। বিনিময়ে তার কাছ থেকে কী পাচ্ছ তুমি?'

অন্তত দশবার প্রশ্নটার জবাব দিল শারমিন: 'কেউ আমাকে এ-কাজ করতে বলেনি।'

উত্তর শুনে কর্নেল হুদা সন্তুষ্ট হতে পারল না, ফলে প্রতিবার এক কি দু'গ্লাস করে গরম পানি খেতে হলো শারমিনকে। তিনবার পানি খেতে অস্বীকৃতি জানাল সে, তিনবারই ভোগ করতে হলো কঠিন শাস্তি—জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকা।

ইতোমধ্যে আজমল হুদার চেম্বার থেকে টাওয়ারের টপ ফ্লোরে তুলে আনা হয়েছে শারমিনকে। কর্নেলের দুজন তরুণ বডিগার্ড সাউন্ডপ্রুফ সেলে ঢুকিয়ে একটা চেয়ারের সঙ্গে রশি দিয়ে বেঁধেছে তাকে। তাদের মধ্যে একজন বার্মিজ, আরেকজন পাকিস্তানী।

বডিগার্ড দুজন কালো প্যান্ট ও হালকা সবুজ রঙের ঢোলা শার্ট পরে আছে, শার্টের উপর জ্যাকেট। বেল্টের সঙ্গে সংযুক্ত হোলস্টার আছে, তার উপর শার্ট ও জ্যাকেট থাকায় বাইরে

থেকে দেখা যায় না। খাপসহ ধারাল ছোরাও গুঁজে রাখা হয়েছে ওই বেল্টে।

পানি খেতে না চাইলেই হুদা নিজে তার হাতের জ্বলন্ত সিগারেটের টকটকে লাল আগুন শারমিনের গালে চেপে ধরছে। চামড়া পোড়ার তীব্র কটু গন্ধে খক খক করে কাশছে বডিগার্ডরা। তবে কর্নেল হুদা নির্বিকার।

শারমিনের মিষ্টি, নিষ্কলুষ চেহারায় এই মুহূর্তে দগদগে তিন-চারটে ক্ষত দেখা যাচ্ছে, লাল রক্তের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে সাদা চর্বিও।

'এবার আমার দুই বডিগার্ড উ থুইমুই ও মদুদ মাকরানীর পালা,' বলল হুদা। 'আমাকে অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করে ওরা। তুমি সত্যি কথা না বললে ওদের মাথা না-ও ঠিক থাকতে পারে। রেগেমেগে কিছু যদি করে বসে, আমাকে দোষ দিতে পারবে না।'

আরও দু'গ্লাস পানি খেতে বাধ্য করা হলো শারমিনকে। তার বাথরুমে যাওয়ার আবেদন আবার প্রত্যাখ্যান করল কর্নেল হুদা।

একের পর এক প্রশ্ন করে চলেছে হুদা–ডকুমেন্টটা শারমিন কি পেন ড্রাইভে কপি করেছে, নাকি ওটার মাইক্রোফিল্ম তৈরি করেছে? কপি হোক বা মাইক্রোফিল্ম, কোথায় রেখেছে, কিংবা কার হাতে তুলে দিয়েছে সেটা? মায়ানমারে টপ ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স এজেন্টদের নাম বলো...

শারমিনের কোনও উত্তরই সন্তুষ্ট করতে পারল না হুদাকে। ফলে তার দুই বডিগার্ড থুইমুই ও মদুদের মেজাজ ঠিক থাকল না। রেগেমেগে শারমিনের দুই হাতের একটা করে নখ প্লাস দিয়ে টেনে তুলে ফেলল তারা। কামরাটা সাউন্ডপ্রুফ হওয়ায় তার চিৎকার বাইরে বেরুতে পারছে না। জোর করে মুখ ফাঁক করে আরও পাঁচ গ্লাস পানি খেতে বাধ্য করা হলো তাকে।

এরপর তিন ঘণ্টার বিরতি। পুরোটা সময় অসহ্য যন্ত্রণায়

চিৎকার করে কাটাল শারমিন।

বিরতির পর সন্ধ্যায় আবার শুরু করল কর্নেল।

'আমাদের টপ সিক্রেট ডকুমেন্টে চোখ বুলিয়েছ তুমি, কাল রাতে এটা জানার সঙ্গে সঙ্গে তোমার ফাইল নিয়ে বসি আমি,' বিরতির পর শারমিনকে বলল হুদা। 'ওরেব্বাপ-রে, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে একেবারে সাপ!'

একটুও বাড়িয়ে বলছে না পিসিআই কর্মকর্তা কর্নেল হুদা। শারমিনের ফাইল পরীক্ষা করতে গিয়ে সে জানতে পারে, মেয়েটির চাকরির জন্য সুপারিশ করেছিলেন তারই মত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন অফিসার, কর্নেল আরমান খান। জানা গেল শারমিনের আপন চাচা তিনি।

কাল রাতেই পিসিআই হেডকোয়ার্টার ইসলামাবাদ থেকে কর্নেল আরমান খানের পুরানো ফাইলগুলো ফ্যাক্সযোগে আনিয়ে পরীক্ষা করেছে হুদা।

তখনই একে একে বেরিয়ে এসেছে চমকে দেওয়ার মত কিছু তথ্য। বহু বছর পশ্চিম পাকিস্তানে বসবাস করলেও, উর্দুভাষী আরমান খান আসলে ছিলেন বাঙালী। আশ্চর্য, তাঁর সম্পর্কে এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটা বেমালুম ভুলে যাওয়া হয়েছে!

তাঁর রেকর্ড বিশ্লেষণ করে দেখা গেল বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে আরমান খান আর পাকিস্তানের স্পাই ছিলেন না, কারণ তারপর থেকে গুরুত্বপূর্ণ কোনও সাহায্যই পাওয়া যায়নি তাঁর কাছ থেকে। দায়সারা গোছের কিছু রিপোর্ট করেছেন, যেগুলোর কোনই তাৎপর্য নেই। হুদা ধারণা করল, তার মানে নিশ্চয়ই বাংলাদেশ অথবা ভারতকে সাহায্য করছিলেন তিনি।

বারবার গরম পানি খেতে হওয়ায়, সেই সঙ্গে একনাগাড়ে চিৎকার করায়, শারমিনের মুখ ও গলার ভিতর দিক প্রায় সেদ্ধ

হয়ে গেছে, উঠে গেছে সারফেসের চামড়া। মুখ, গলা ও পেটের ভিতর তীব্র জ্বালা অনুভব করছে সে। কথা বলতে চেষ্টা করলে দুর্বোধ্য ও কাকের মত কর্কশ আওয়াজ বেরুচ্ছে।

চেয়ারে বসেই, তিনজন পুরুষের সামনে, পেশাব করে ফেলল শারমিন। ঊরুসন্ধির কাছে তার জিনসের প্যান্ট ভিজে যাওয়ায় অশ্লীল লাগছে। চেয়ারের নীচে, মেঝেতে একটা খুদে পুকুর তৈরি হলো।

'ছি-ছি!' বলে নাকে রুমাল চাপা দিল কর্নেল হুদা।

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হাসি লুকাল তার দুই বডিগার্ড, উ থুইমুই ও মদুদ মাকরানী।

দু'ঘণ্টা পর, সন্ধে সাতটার দিকে, নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল শারমিন। ইতিমধ্যে সমস্ত বাঁধন খুলে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করা হয়েছে তাকে, চিৎ করে শুইয়ে রাখা হয়েছে অপারেশন টেবিলে। তার সারা শরীরে এখন চুরুটের ছ্যাঁকার সংখ্যা এত বেশি যে গুণতে হলে সময় লাগবে। হাতের দশ আঙুলের মধ্যে অক্ষত আছে মাত্র চারটে।

'ডিনার সেরে আবার আসছি আমি,' বলে সেল থেকে বেরিয়ে গেল পিসিআই কর্মকর্তা কর্নেল হুদা, তার পিছু নিল একজন বডিগার্ড।

শারমিনের জ্ঞান ফেরেনি দেখে তার উলঙ্গ শরীরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকবার লোভটা সামলাতে পারছে না হুদার বডিগার্ড উ থুইমুই। নগ্ন নারী দেহের উঁচু-নিচু খাঁজ-ভাঁজ পাগল করে তুলছে তাকে। হঠাৎ তার মাথায় কুৎসিত একটা ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল। প্যান্টের চেইন খুলল থুইমুই, অজ্ঞান মেয়েটির হাঁটুর নীচে দুই হাত ভরে কোমরটা টেনে আনল টেবিলের কিনারায়। লোডেড পিস্তল ডিসটার্ব করছে দেখে ওটা বের করে রাখল শারমিনের মাথার পিছনে।

তারপর চড়াও হলো অসাড় মেয়েটির উপর।

চোখের পাতা প্রায় বন্ধ, সরু ফাঁক দিয়ে সবই দেখেছে শারমিন। মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য জ্ঞান হারিয়েছিল সে। চুরুটের ছ্যাঁকা ও নখ তুলে নেওয়ার অসহ্য ব্যথা আবার তাকে চেতনা ফিরিয়ে দিয়েছে।

এত নির্যাতন সত্ত্বেও পেন ড্রাইভে কপি করবার কথা স্বীকার করেনি শারমিন। সে এমনকী নিজেকে রক্ষা করবার আশাও ছাড়েনি। হুদার বার্মিজ বডিগার্ড থুইমুইয়ের স্পর্শে ঘৃণায় কেঁপে উঠতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে। এটাকে মুক্তিলাভের উপায় হিসাবে দেখছে ও এখন।

না! এখনই নয়!

অটোসাজেশন দিচ্ছে শারমিন : কেউ আমার সম্ভ্রম নষ্ট করছে না, আমার শরীরে কোথাও কোনও ব্যথা নেই। আমি যা বলব, তা-ই শুনবে এখন আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

সমস্ত মনোবল ও শারীরিক শক্তি এক করে, কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে দুই পা উঁচু করলো শারমিন, তারপর জোড়া পা দিয়ে প্রচণ্ড একটা লাথি মারল থুইমুইয়ের বুকের খাঁচায়। ছিটকে গিয়ে দেয়ালে ধাক্কা খেল কামোন্মত্ত লোকটা, মাথা ঠুকে যাওয়ায় দিশে হারিয়ে ফেলেছে, কিন্তু তার পরেও পিস্তলটা তুলে নেবার জন্য থাবা চালাল হোলস্টার লক্ষ্য করে।

পরমুহূর্তে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে দেখল মাথার পিছনে রাখা পিস্তলটা এখন শারমিনের হাতে, নলের মুখটা সোজা চেয়ে রয়েছে ওর বুকের দিকে। আতঙ্কে আঁ-আঁ শব্দ বেরলো থুইমুইয়ের গলা দিয়ে। হাত বাড়িয়ে ঠেকাতে চাইল গুলি।

ছোট্ট ঘরে বোমার আওয়াজ তুলল গুলিটা। হাতের তালু ভেদ করে সোজা গিয়ে ঢুকল লোকটার হৃৎপিণ্ডে।

কয়েক সেকেন্ড আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল থুইমুই

শারমিনের দিকে। দেওয়ালে পিঠ ছেঁচড়ে বসে পড়ল মেঝেতে, তারপর ঢলে পড়ে গেল একপাশে।

পিস্তল ছেড়ে দিয়ে নেমে পড়ল শারমিন অপারেশন টেবিল থেকে। ব্যস্ত হাতে কাপড় পরছে, অসহ্য যন্ত্রণায় ফোঁপাচ্ছে।

দরজার দিকে এগোতে যাবে, এমনি সময়ে আকস্মিক একটা ধাক্কা খেয়ে ঘুরে গেল শারমিন, দেখল থুইমুইয়ের মুখে হাসি। চোখ বুজল লোকটা, এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

চোখ ফিরিয়ে এনে নিজের পাঁজরের দিকে তাকাল শারমিন। একটা হাড় ভেঙে ওর বুকের ভিতর ঢুকে গেছে থুইমুইয়ের ছুঁড়ে দেয়া ছোরা। বাঁটটা কেবল বেরিয়ে আছে বাইরে।

সারা শরীর থর থর করে কাঁপছে। একটানে ছোরাটা বের করে গর্তটায় একটা রুমাল গুঁজে দিয়ে আপাতত রক্ত বন্ধ করল শারমিন, তারপর এগিয়ে গিয়ে হাঁটু গাড়ল লাশের পাশে। থুইমুইয়ের পকেট থেকে চাবির গোছাটা বের করল। তারপর তালা খুলে ধীরে ধীরে, সাবধানে, ভারী সাউন্ডপ্রুফ দরজা সামান্য ফাঁক করে করিডরে তাকাল। আবছা অন্ধকার, কাছেপিঠে কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না।

নিঃশব্দ পায়ে সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে শারমিন, আসবার সময় দেখে রেখেছে কোন্ দিকে সেটা। নীচতলায় নেমে গেট দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, গার্ডরা আটকে দেবে। দেখতে হবে ছাদে উঠে পালানোর কোনও উপায় করা যায় কি না।

করিডরের দু'পাশে দরজার মাথায় প্লাস্টিকের খুদে প্লেট দেখা যাচ্ছে। সেগুলোয় লেখা: ইকুইপমেন্টস, ইন্টারোগেশন রুম, স্টোর রুম, ড্রেসিং রুম ইত্যাদি।

এক সেকেন্ড ইতস্তত করবার পর স্টোর রুমের সামনে থামল শারমিন। চাবির গোছা থেকে একটা চাবি ঢোকাল কি-হোলে। তিন নম্বর চাবি দিয়ে খোলা গেল তালা। দরজা খুলে দ্রুত ভিতরে

ঢুকল সে।

পাঁচ মিনিট পর আপাদমস্তক কালো বোরকায় ঢাকা একটা মূর্তি হয়ে করিডরে বেরিয়ে এল শারমিন, বোরকার ভিতর একপ্রস্থ নাইলন রশি। একটু এগিয়েই সিঁড়িটা দেখতে পেল সে, ছাদে উঠে এসে রশিটা নামিয়ে দিল নীচে।

ইসলামাবাদ টাওয়ারের পাশের অন্ধকার গলিতে নামতে পুরো দশ মিনিট সময় লাগল শারমিনের—নখ উপড়ে নেয়া আঙুল ব্যবহার করতে পারছে না, হাতের তালুতে পেঁচিয়ে ধরতে হচ্ছে রশি। ব্যথায় কোঁকাতে কোঁকাতে সেখান থেকে কাছাকাছি রেল স্টেশনে পৌঁছাতে লাগল আরও বারো মিনিট। আসবার পথে একটা ডিসপেনসারি থেকে এক বোতল অ্যান্টিসেপটিক স্যাভলন, তুলো, গজ ও কয়েকটা পেইনকিলার ট্যাবলেট কিনেছে।

কিন্তু খোঁজ নিতে গিয়ে জানা গেল সকালের আগে আরাকান-এর উদ্দেশে কোনও ট্রেন ছাড়ছে না। হিসাব করে শারমিন দেখল, লেমিয়েথনায় পৌঁছাতে প্রায় দুপুর হয়ে যাবে তার। তবে একবার পৌঁছাতে পারলে আর কোনও চিন্তা নেই, ইরাবতি চাচী ঠিকই তার উপযুক্ত চিকিৎসা ও নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করবেন।

তবে ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে শারমিন, সকাল পর্যন্ত বাঁচবে কি না সন্দেহ। ছোরার গর্তে তুলো গুঁজে দেওয়ার আগেই প্রচুর রক্ত বেরিয়ে গেছে তার শরীর থেকে।

অসুস্থ একদল ভিক্ষুকদের ভিড়ে জায়গা করে নিল শারমিন, তাদের মধ্যে বোরকা পরা কয়েকজন কুষ্ঠরোগিণীও আছে। এখন শুধু একটাই চিন্তা, তার খোঁজে পিসিআই কর্মকর্তারা মায়ানমার পুলিশকে না লেলিয়ে দেয়।

যে-কোনও কারণেই হোক, বার্মিজ সামরিক জান্তার সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের সম্পর্ক খুবই ভাল, সেজন্যই পুব ও দক্ষিণ-

পুব এশিয়ার দেশগুলোর বিরুদ্ধে গোয়েন্দা তৎপরতা চালাতে পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর কোনও সমস্যা হয় না।

তিন

লেমিয়েথনা।

পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে রয়েছে ইরাবতি আরমানের খামারবাড়ির মূল আকর্ষণ, প্রাসাদতুল্য বিশাল অট্টালিকা।

যত দূর চোখ যায় পাহাড় কেটে বিশাল সব ধাপ তৈরি করা হয়েছে, কোনওটাই কয়েক বিঘার কম নয় চওড়ায়। মাইলের পর মাইল জুড়ে এরকম কয়েক শো ধাপ ভরে গেছে সোনালি ধানে।

দালানটার টেরেসে একটা ইজি চেয়ারে বসে রোদ পোহাচ্ছেন বৃদ্ধা ইরাবতি, শান্ত দৃষ্টিতে সামনের দৃশ্যটা দেখছেন। বাতাস লেগে ঢেউ উঠছে দিগন্ত বিস্তৃত পাকা ফসলে, আর দিন কয়েকের মধ্যেই কাটা হবে সব।

সত্তরের উপর বয়স ইরাবতির, পিঠটা কুঁজো হয়ে গেছে। তবে শরীরটাকে ঠিক রাখার জন্য খেতের আল ধরে এখনও মাইলের পর মাইল হাঁটেন তিনি। প্রচুর শাক-সবজি খান, মাংস ছোঁন না।

কয়েক প্রস্থ ভাঁজ করা বার্মিজ লুঙ্গি পরেছেন তিনি, কোমরে বেল্ট বেঁধেছেন শক্ত করে। ব্লাউজটা ভাল কোনও দর্জিকে দিয়ে

সেলাই করা। পায়ে রয়েছে কালো ও নরম চামড়ার মোকাসিন। মাথায় সব সময় জড়ানো থাকে একটা সিল্ক স্কার্ফ। মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছেন তিনি ধানের খেতে বাতাসের দোলা।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তেই মনটা খারাপ হয়ে গেল তাঁর। ধান কাটা শুরু হতে না হতেই হেনযাদা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ফোর্স নিয়ে চলে আসবে জেনারেল উ নিমুচি। খবর নেবে এবার কী রকম ফসল ফলল, আধাআধি বখরা হিসাবে কী পরিমাণে পাওনা হলো তার।

ইরাবতি এই অন্যায় দাবি মেটাতে রাজি না হলেই রসিকতা করবার সুরে হুমকি দেবে জেনারেল, আমাদের কাছে কিন্তু রিপোর্ট আছে, পাহাড় কেটে আফিম চাষ করছেন আপনি। কিংবা পুরনো প্রসঙ্গটা তুলে বলবে, আঙ সান সু কি-র সঙ্গে কী বিষয়ে আলাপ করেছিলেন, সেটা জানবার জন্য আপনাকে ইন্টারোগেশন সেলে নিয়ে যাবার কথা ভাবছি আমরা।

কথাটা সত্যি, এক সময় আঙ সান সু কি-র সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ছিল ইরাবতির। কুশলাদি জানবার জন্য গৃহবন্দি এই নেত্রীকে বেশ কয়েকবারই টেলিফোনে পাওয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি। সেটাই তাঁর জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসকের বক্তব্য, সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কাজটা করায় তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা যেতে পারে।

যতদিন না সে অভিযোগ আনা হচ্ছে, লেমিয়েথনা ছেড়ে ইরাবতি কোথাও নড়তে পারবেন না, বিশেষ করে জেনারেলের ইস্যু করা পাস ছাড়া রাজধানী ইয়াংগনে যাওয়া তাঁর জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এবং, প্রতি বছর, দেশের স্বার্থে, মোট উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক জেনারেলকে দান করে দিতে হবে।

মোটকথা, একা ও অসহায় পেয়ে জেনারেল উ নিমুচি নির্লজ্জ

ভাবে ব্ল্যাকমেইল করছেন বৃদ্ধাকে।

ঢেউ খেলানো সোনালি ধানখেতের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন ইরাবতি। স্বামীর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে তাঁর। জন্মসূত্রে বাঙালী হলেও, অভিবাসন সূত্রে বার্মিজ ছিলেন তিনি। আরাকান রাজ্যের এই লেমিয়েথনা এলাকায় তাঁদের বিশাল সয়-সম্পত্তি রয়েছে। দেড়শো বছর আগে এ-সব তাঁর স্বামীর দাদা কিনেছিলেন।

হয়তো প্রেম করে বিয়ে করে আদর-যত্নে সুখে জীবনটা কাটিয়েছিলেন বলেই, স্বামী মারা যাওয়ার পরও রয়ে গেছেন তিনি এখানে; তাঁর স্মৃতিচিহ্নগুলো আঁকড়ে ধরে আছেন ইরাবতি। পাশের গ্রামেই প্রচুর সম্পত্তি রেখে মারা গেছেন তাঁর বাবা, সেই সম্পত্তির কিছুই নেননি তিনি, একমাত্র বোন মায়াবতী গাইন-কে সব দান করে দিয়েছেন।

স্বামীর কৈশোর কালটা কেটেছে চট্টগ্রামে, সেখানেও তাঁর শ্বশুরকুলের সয়-সম্পত্তি আছে, শখ হলে মাঝে মধ্যে সেখান থেকেও বেড়িয়ে আসেন ইরাবতি। স্বামীকে ভালবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন, সেই সূত্রে বাংলাদেশের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ও আন্তরিক তিনি।

মশা-মাছির উপদ্রব ঠেকাতে নেট দিয়ে টেরেসটা ঘেরা। দুই প্রস্থ সিঁড়ি, একটার ধাপে লম্বা ছায়া পড়ল। ছায়াটা ইরাবতি দেখতে না পেলেও, পায়ের শব্দ ঠিকই চিনতে পারলেন। নড়লেন না বৃদ্ধা, পাশের নিচু টেবিলে রাখা পিস্তলটাও ধরলেন না।

এদিকে প্রায়ই ডাকাতি ও অপহরণের ঘটনা ঘটে, তাই লাইসেন্স করা এই পিস্তল সারাক্ষণ নাগালের মধ্যে রাখতে হয় তাঁকে। 'কী খবর, ফালান?' মৃদুকণ্ঠে জানতে চাইলেন ইরাবতি।

থোন ফালান বার্মিজ নয়, থাই। লোকটার মুখে এত বেশি ভাঁজ যে চেহারাটা বুলডগের সঙ্গে অনায়াসে বদলে নেওয়া যাবে।

কর্নেল আরমান খানের অতি বিশ্বস্ত বডিগার্ড ছিল সে। পাঁচ বছর আগে মনিব মারা যাওয়ার পর ইরাবতি তাকে খামারবাড়ির ম্যানেজার করেছেন। কিন্তু জিজ্ঞেস করলে সে-কথা সে বলে না, বলে : আমি ম্যাডাম ইরাবতির খাস নওকর।

আসলে একই সঙ্গে অনেকগুলো দায়িত্ব পালন করে থোন ফালান। ম্যানেজার, সেক্রেটারি, বডিগার্ড–কী নয় সে!

ব্যক্তিগত কিছু কাজে ইরাবতি একবার ইয়াংগনে যেতে চান। কিন্তু রাজধানীতে যেতে হলে হেনযাদা ক্যান্টনমেন্ট থেকে পাস যোগাড় করতে হবে। সেই পাস আনতেই পাঠিয়েছিলেন ফালানকে।

'না, ম্যাডাম, কাজ হলো না,' ম্লান সুরে বলল ফালান, ইরাবতির তিন হাত দূরে এসে দাঁড়াল সে। 'জেনারেল উ নিমুচি ধমক দিয়ে ভাগিয়ে দিলেন আমাকে। বললেন, ইয়াংগনে তো একটাই কাজ তোর ম্যাডামের, সু কি-র সঙ্গে যোগাযোগ করে সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র পাকানো। যা, ভাগ, শালা বিদেশী কুত্তার বাচ্চা।'

'তোমাকে না বলে দিলাম, ব্যাপারটা উ নিমুচিকে জানাবে না।'

'কী করব, ম্যাডাম! যাকে ধরি সেই বলে তাঁর অনুমতি লাগবে। খানিক পর তিনি নিজেই আমাকে ডেকে পাঠিয়ে ধমক দিলেন।'

'হুম।' গম্ভীর হলেন ইরাবতি। প্রতি বছর ফসল বেচা প্রচুর টাকা তাঁর অ্যাকাউন্টে জমা পড়ছে, ব্যাঙ্কের ইয়াংগন হেডঅফিসে গিয়ে হিসাবটা একবার পরীক্ষা করা দরকার।

তবে রাজধানীতে আরও একটা কারণে যেতে চান ইরাবতি, সেটা এমনকী থোন ফালানকেও বলেননি। সু কি-র সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব নয়, ভাবছেন তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানতে চেষ্টা করবেন কেমন আছেন তাঁদের নেত্রী।

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে অন্য প্রসঙ্গ তুললেন ইরাবতি।

‘গাড়িটার কথা কী বলল সে?’ দু’দিনের জন্য চড়তে দিন বলে তাঁর শখের নীল মার্সিডিজটা নিয়ে গেছে জেনারেল উ নিমুচি, অথচ আজ তিন মাস হতে চলল ফেরত দেওয়ার নাম নেই।

‘বললেন, তোর ম্যাডামকে বলবি এটার কথা ভুলে গিয়ে আরেকটা যেন কিনে নেয়।’

‘হুম।’ বিষণ্ণ দেখাল বৃদ্ধাকে।

‘আপনার কিছু লাগবে, ম্যাডাম?’ জানতে চাইল ফালান।

‘এক ঘণ্টা পর কমলা ও আখের রস দিয়ো,’ বললেন ইরাবতি। ‘ঠিক আছে, ফালান।’

সসম্ভ্রমে মাথা নুইয়ে বিদায় নিল থোন ফালান।

ফালান চলে যাওয়ার পর ইজি চেয়ারটায় নেতিয়ে পড়লেন বৃদ্ধা। বুড়ো হাড় এখন আর আগের মত শীত ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। রোদে বসে থাকতে তাঁর খুব আরাম লাগছে। তারপর এক সময় তন্দ্রার ভাব চলে এল চোখে।

কিছুই শুনতে পাননি, হঠাৎ কীভাবে যেন ইরাবতি অনুভব করলেন তাঁর গায়ে কারও ছায়া পড়েছে। তন্দ্রা ছুটে গেল। ছায়াটা দেখতে পেলেন তিনি, কিন্তু চিনতে পারলেন না। ফালানের নয়। কোনও মহিলার হবে, বোরকা পরা।

তাড়াহুড়ো করে সিধে হয়ে বসতে চেষ্টা করছেন ইরাবতি, চোখের কোণ দিয়ে পিস্তলটার দিকে একবার তাকালেন। জায়গা মতই আছে সেটা।

সিঁড়ির ধাপ বেয়ে একটা মেয়ে উঠে আসছে। তাকে তিনি চিনলেও, এই মুহূর্তে চিনতে সাংঘাতিক কষ্ট হচ্ছে।

মারা যাচ্ছে মেয়েটি। তার সারা মুখে দগদগে ঘা, পরনের কালো বোরকা তাজা ও শুকনো রক্তে খয়েরি হয়ে গেছে।

নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন ইরাবতি–না, এ মেয়েকে আমি চিনি না! না, আমি যাকে আমার সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিচ্ছি,

এ মেয়ে সে নয়! হতেই পারে না!

এ মেয়েকে চেনেন তিনি, খুব ভাল করে চেনেন, কিন্তু নির্মম বাস্তবতা থেকে পালাবার চেষ্টা করছেন ইরাবতি।

তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ করে দিল শারমিন। সিঁড়ির মাথায় উঠে এসে নেট সরিয়ে ভিতরে ঢুকল। তার হাতের মুঠো আলগা হয়ে গেল, গোল পাকানো একটা ছোট কাগজ পড়ল টেরেসের মেঝেতে।

টলছে শারমিন, হড়হড় করে রক্তবমি করল। কাকের মত কর্কশ গলায় কথা বলছে, 'চা-চী...আ-মা-কে লু-কি-য়ে রা-খো...উ নিমুচি...আ-জ-ম-ল হু-দা...বা-ং-লা-দে-শ...পু-রা-নো জ-রি-প...অরক্ষিত জলসীমা...'

বৃদ্ধা কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাঁর পায়ের কাছে ঢলে পড়ল শারমিন। তারপর আর নড়ছে না।

এতক্ষণে সংবিৎ ফিরে পেয়ে গুঙিয়ে উঠলেন ইরাবতি, হাঁটু মুড়ে বসলেন তাঁদের প্রিয় ভাতিজির পাশে।

শারমিনের পালস না পেয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলেন ইরাবতি। হায় খোদা, এ আমাকে কী দেখতে হলো! উদভ্রান্ত লাগছে নিজেকে তাঁর। এই মুহূর্তের করণীয় স্থির করতে পারছেন না। কী যেন বলে গেল শারমিন?

অরক্ষিত জলসীমা...পুরানো জরিপ...বাংলাদেশ...আজমল হুদা...উ নিমুচি!

কী মানে এ-সবের?

তার পর শারমিনের বলা প্রথম কথাটা মনে পড়ল—'চাচী, আমাকে লুকিয়ে রাখো!' হায়, চলেই যদি যাবি, এরকম একটা অনুরোধ নিয়ে আমার কাছে এলি কেন তুই!

নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে এসেছিল শারমিন, ভাবলেন ইরাবতি। অর্থাৎ নিশ্চয়ই তার পিছু নিয়েছিল কেউ! ওহ্, আরমান, এখন তোমাকে আমার ভারি দরকার ছিল! তুমি থাকলে অনায়াসে

বুঝতে পারতে এই পরিস্থিতিতে কী করা উচিত।

তারপর আরেক ব্যক্তির কথা মনে পড়ল ইরাবতির। রাজধানীর নামকরা কোটিপতি ব্যবসায়ী, তাঁর ফুফাতো ভাই–সিতওয়ে আরাকানী। শুধু ফুফাতো ভাই নয়, তাঁর স্বামী কর্নেল আরমান খানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুও বটে। বহু বছর হয় দেখা-সাক্ষাৎ নেই বটে, তবে আপদে-বিপদে সব সময় তার কাছ থেকেই পরামর্শ চান ইরাবতি। টেলিফোনে।

তবে এই ব্যাপারটা অত্যন্ত বিপজ্জনক, এ নিয়ে কারও সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করা যাবে না। আবার প্রকাশ্যে সিতওয়েকে এর সঙ্গে জড়ানোও উচিত হবে না।

সিঁড়ির নীচে থোন ফালানের ছায়া দেখা গেল। হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকলেন ইরাবতি। ধাপ বেয়ে ছুটে আসছে ফালান।

নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছেন ইরাবতি। বিপদের সময় প্রথম কাজ মাথাটাকে ঠাণ্ডা রাখা। তাঁর মন বলছে, বিপদ মাত্র শুরু হয়েছে। আরও অনেক কিছু ঘটবে এখন।

সিধে হওয়ার আগে মেঝে থেকে কাগজটা তুললেন ইরাবতি। ভাঁজ খুলতেই চিনতে পারলেন শারমিনের হাতের লেখা। মাত্র আড়াই লাইনের মেসেজ–

‘আমার বাড়ি থেকে কোমরের কালো একটা বেল্ট সংগ্রহ করো। ওটার ফাঁপা অংশে লুকানো আছে পেন ড্রাইভটা। এখনই এই কাগজটা পুড়িয়ে ফেলো।’

চার

'দিদিমণি, ম্যাডাম?' বেসুরো গলায় জানতে চাইল ফালান, ক্ষতবিক্ষত মুখটা চিনতে পেরে অবিশ্বাসে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। 'আমাদের শারমিন দিদিমণি?' শোকে ও দুঃখে কাতর হয়ে পড়ল সে। শেষ শব্দটি উচ্চারণ করতে গিয়ে ভেঙে গেল গলাটা।

মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধা। সমস্ত ভাবাবেগ চেপে রেখে প্র্যাকটিকাল হওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি। 'বাড়ির কাছাকাছি কারা কাজ করছিল? কে আসতে দেখেছে বোরকা পরা শারমিনকে?'

তাঁর খেতে-খামারে যারা কাজ করে তাদের সবাইকেই বিশ্বাস করতে চান ইরাবতি, তবে তাদের মধ্যে দু'একজন জেনারেল উ নিমুচির চর থাকাটা বিচিত্র নয়।

মাথা নাড়ল ফালান, হাঁটু গেড়ে বসে আছে রক্তাক্ত লাশের পাশে। 'কেউ দেখেনি, ম্যাডাম। আমাদের সব লোক উত্তরের মাঠে কাজ করছে। তা ছাড়া, কারও চোখে পড়লে দিদিমণির সঙ্গে আসত সে।' পেশল হাত দিয়ে পোড়া ও থেঁতলানো মৃতদেহটা নরম হাতে ধরল সে, নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করে সিধে হলো। 'দিদিমণিকে খুন করা হয়েছে, ম্যাডাম। প্রথমে, জিজ্ঞেসাবাদ করার সময়, তাঁর ওপর টরচার করা হয়। তারপর স্ট্যাব করা হয়েছে ছোরা দিয়ে। তাঁর কাছ থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা আদায় করতে চেয়েছিল তারা।'

মাথা ঝাঁকালেন ইরাবতি। মুঠো খুলে কাগজটা দেখালেন ফালানকে। লেখাটায় একবার চোখ বুলিয়েই ফতুয়ার পকেট থেকে দেশলাই বের করে কাগজটা পুড়িয়ে ফেলল সে।

'ফালান,' মৃদু, অথচ দৃঢ়কণ্ঠে ডাকলেন ইরাবতি।

'জী, ম্যাডাম,' পুরোপুরি সজাগ ও স্থির হয়ে গেল ফালান।

'কর্তৃপক্ষকে কিছু না জানিয়েই শারমিনকে আমরা কবর দেব,' ধীরে ধীরে বললেন বৃদ্ধা। 'কারণ তার শত্রু আমাদেরও শত্রু। তারা যেন জানতে না পারে এখানে এসেছিল ও। আল্লাহ মাফ করবেন, আমার শারমিন মায়ের জানাজাও হবে না।'

ভারী হাত দুটো বুকে ভাঁজ করল থোন ফালান। 'আপনার কথামতই কাজ হবে, ম্যাডাম। লাশ লুকাবার জন্যে খেতের চেয়ে ভাল জায়গা আর হয় না।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে, কিন্তু সেটা পরে। শারমিনকে এখন বাড়ির ভেতরে নিয়ে যেতে হবে। ওকে আমরা কবর দেব সন্ধ্যার পর, অন্ধকারে। এই কাজটার দায়িত্ব পুরোটাই তোমার ওপর ছেড়ে দিতে হবে আমাকে। তবে এখন অন্য একটা জরুরি কাজ আছে।'

'জী, ম্যাডাম, হুকুম করুন।'

'পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এ কাজ করত শারমিন। নির্যাতন যা-ই হয়ে থাকুক, ওখানে হয়েছে—আমি বলতে চাইছি, পেন ড্রাইভটা সম্ভবত ওখান থেকেই পেয়েছে শারমিন।'

'জী, আমারও তাই ধারণা।'

'কাজেই আমাকে এখন ইয়াংগনে গিয়ে প্রথমে পেন ড্রাইভটা সংগ্রহ করতে হবে। তারপর ব্যাপারটা নিয়ে পরামর্শ করার জন্যে আমি আমার ফুফাতো ভাই সিতওয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করব। রানা এজেন্সির সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারি। ওখানে এমন কাউকে পাওয়া যেতে পারে যিনি তোমার মনিবকে চিনতেন।'

'না, ম্যাডাম।' কথার মাঝখানে ইরাবতিকে বাধা দেওয়া ফালানের স্বভাব নয়। তার মুখের এই কঠিন ভাবও আগে কখনও দেখা যায়নি।

'না? কী বলতে চাও তুমি?' ইরাবতি বিস্মিত। 'আরমান বেঁচে থাকলে ঠিক এই কাজই করত। পেন ড্রাইভটা সংগ্রহ করে রানা

এজেন্সির ইয়াংগন শাখায় পৌঁছে দিত।'

'রানা এজেন্সির লোকজন আপনাকে চেনেন না, আপনিও তাঁদেরকে চেনেন না,' বলল ফালান। 'তার মানে কাজটা খুব জটিল। তবে এটা মূল সমস্যা নয়।'

'তা হলে কোন্‌টা?'

'ম্যাডাম, আমি আপনাকে কোনও অবস্থাতেই ইয়াংগনে যেতে দিতে পারি না,' সমীহ ও বিনয়ের সঙ্গে কথা বলছে ফালান, অথচ শুনে মনে হচ্ছে কঠিন রায় ঘোষণা করছেন কোনও বিচারক। 'আমি আপনার খাস নওকর, কাজেই আপনার নিরাপত্তার দিকটা আমাকেই দেখতে হবে। জেনারেল উ নিমুচি যতদিন বেঁচে আছে...'

'আরে, রাখো তোমার জেনারেল নিমুচি! আস্ত একটা শুয়োর ওটা, কোন্‌দিন দেখবে কারও হাতে জবাই হয়ে গেছে। জোর করে ধান নিয়ে যেতে পারবে সে, কারণ বাধা দিলে মিথ্যে কেস দিয়ে আমার লেবারদের জেলে ভরে রাখবে। কিন্তু আমি যদি সত্যি ইয়াংগনে যেতে চাই, সে আমাকে বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না। তুমি এতই যখন ভয় পাচ্ছ, বেশ, আমাকে না হয় কিছু দূর পৌঁছে দিয়ে এস।'

'না, ম্যাডাম।' ইরাবতির সামনে পাথরের মত অনড় দাঁড়িয়ে আছে ফালান। 'আপনি যাচ্ছেন না। কাউকে যদি যেতেই হয়, তা হলে আমাকে যেতে হবে। বহু বছর আগে মনিব আমাকে কিছু হুকুম দিয়েছিলেন, সেগুলো আজও বহাল আছে। আপনাকে আমি বিপদের ঝুঁকি নিতে দিতে পারব না। শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, আপনাকে কোথাও যেতে দেয়া হবে না।'

খুব রাগ হচ্ছে ইরাবতির, কারণ যেতে তাঁকে হবেই। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'তর্ক করতে চাইলে পরে কোরো, তার আগে শারমিনকে সরানো দরকার।'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে কাজে হাত লাগাল ফালান। কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রাচীন খামারবাড়ির বিশাল গুহা আকারের ওয়াইন সেলার-এ লাশটাকে রেখে এল সে। সিঁড়ির ধাপ ও টেরেসের মেঝে থেকে সমস্ত রক্তও মুছে ফেলল।

তারপর আবার তর্কটা শুরু হলো। ফালানকে এরকম জিদ ধরতে আগে কখনও দেখেননি ইরাবতি। অবাক হয়ে উপলব্ধি করলেন তিনি, প্রয়োজনে যে-কোনও কৌশল, এমনকী জোর খাটিয়ে হলেও তাঁকে যেতে বাধা দেবে ফালান। অগত্যা তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, পরীক্ষিত একজন মানুষের কথা শোনা দরকার তাঁর।

'ঠিক আছে, তোমার জিদই বজায় থাকল,' বললেন ইরাবতি। 'এবার এসো, কাজের কথা শুরু করি।'

ফালানের চেহারায় কোনও ভাবই দেখা গেল না, তবে সরু চোখে ফুটে ওঠা স্বস্তির ছাপটুকু গোপন করতে পারল না সে। 'হুকুম করুন, ম্যাডাম।'

'অত্যন্ত সাবধানে ইয়াংগনে ঢুকবে তুমি। শারমিনের বাগানবাড়ি তো চেনোই, প্রথম কাজ কারও চোখে ধরা না পড়ে ওখান থেকে পেন ড্রাইভটটা সংগ্রহ করা। বেল্টটা কোমরে পরে শার্ট চাপা দিয়ে নিয়ে আসবে। বাড়ির ওপর হয়তো নজর রাখা হচ্ছে, কাজেই কাজটা করার সময় চোখ-কান খোলা রাখবে। এরপর মায়ানমার টাইমস-এ একটা বিজ্ঞাপন ছাপতে দেবে, কারণ ওই কাগজটাই সবচেয়ে বেশি চলে। ভাষা যাই হোক, অর্থটা হবে এরকম: "কবর থেকে উঠে হক মাওলা পুরানো বন্ধুদের খুঁজছে।"

'হক মাওলা, ম্যাডাম?'

'তোমার মনিবের ছদ্মনাম ছিল এটা,' বললেন ইরাবতি। 'যাও, রওনা হবার প্রস্তুতি নাও।'

মাথা নোয়াল থোন ফালান, তারপর ঘুরে চলে গেল।

সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ করেই অকাল বর্ষণ শুরু হলো। বৃষ্টির মধ্যে লাশটাকে গোপনে মাটি চাপা দেওয়া বরং সহজ হয়ে উঠল। যা করবার একা থোন ফালানই করল, ইরাবতি শুধু বৃষ্টির মধ্যে পাহাড়ের একধারে পাথুরে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকলেন। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া শরীরটা রেইনকোটের ভিতর আরও যেন ছোট ও ভঙ্গুর লাগল ফালানের দৃষ্টিতে।

ইতোমধ্যে রাজধানীতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে ফালান। বার্মিজ লুঙ্গি ছেড়ে জিনসের লম্বা প্যান্ট ও সুতি শার্ট পরেছে সে, শার্টের উপর কাপড়ের জ্যাকেট। বৃষ্টি ছাড়লে স্বচ্ছ রেইনকোট খুলে মাথায় পরবে কুলি হ্যাট।

লাইসেন্স করা পিস্তল ফালানেরও আছে, সঙ্গে করে সেটা নিয়ে যাচ্ছে সে। বিদায় দেওয়ার আগে তাকে কিছু টাকা দিলেন ইরাবতি, সেই সঙ্গে নতুন কিছু নির্দেশ। 'আমাদের প্ল্যান একটু বদলেছে, ফালান। রাজধানীতে একবার নয়, দু'বার যেতে হবে তোমাকে। ভেবে দেখলাম পেন ড্রাইভটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কাজেই সবার আগে ওটার নিরাপত্তা দরকার। শারমিনের বাড়ি থেকে সরাসরি আমার কাছে নিয়ে আসবে তুমি বেল্টটা। তারপর বিজ্ঞাপন ছাপতে দেয়ার জন্যে আবার ইয়াংগনে যাবে।'

'জো হুকুম, ম্যাডাম।'

'বেল্টটা আমরা জীবন দিয়ে রক্ষা করব,' দৃঢ়কণ্ঠে বললেন ইরাবতি। 'আমাদের ভুললে চলবে না যে ওটার জন্যেই খুন করা হয়েছে শারমিনকে।'

সশ্রদ্ধচিত্তে মাথা নোয়াল ফালান। 'তবে আমি চাই, ম্যাডাম, সমস্ত সাহস ও বুদ্ধি দিয়ে আপনি নিজের জীবনটাকে রক্ষা করবেন। কারণ আমার অনুপস্থিতিতে আপনার কিছু হলে, আমাকে না আত্মহত্যা করতে হয়। দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে

সেটাই আমাদের বংশের রীতি।'

প্রসঙ্গটাকে গুরুত্ব দিলে উৎসাহ পাবে ফালান, এই ভয়ে তার শেষ কথাটা শুনতে না পাওয়ার ভান করলেন ইরাবতি। 'তোমার সঙ্গে কেউ যোগাযোগ না করা পর্যন্ত কাউকে তুমি বলবে না এখানে কী ঘটেছে। যখন বলবে, শুধু আমার শিখিয়ে দেয়া কথাগুলো বলবে। এবার যাও।'

বৃষ্টি মাথায় করে রাতের অন্ধকারে হারিয়ে গেল থোন ফালান।

তিনদিন পর মায়ানমার টাইমস-এর পারসোনাল কলাম-এ ছাপা হলো বিজ্ঞাপনটা। এ-ধরনের অস্পষ্ট বিজ্ঞাপন রোজই দু'চারটে ছাপা হয় কাগজে; কাজেই এ নিয়ে পুলিশ, সিআইডি বা সামরিক জান্তার অস্থির হয়ে ওঠার কোনও কারণ নেই। থোন ফালান ঠিক এভাবে ছাপিয়েছে সেটা–

কবর থেকে উঠে হক মাওলা পুরানো বন্ধুদের খুঁজছে।

ম্যাডাম ইরাবতির বিশেষ দূত থোন ফালানের বিজ্ঞাপনটা অসংখ্য পাঠকের চোখে পড়লেও, দুজন লোককে রীতিমত চমকে দিয়েছে। তাদের মধ্যে একজন সাজিদ খন্দকার।

রানা এজেন্সির ইয়াংগন শাখা। শাখাপ্রধান সাজিদ খন্দকারের চেম্বার। সকাল ন'টা বিশ মিনিট।

সহকারীদের সঙ্গে বিজ্ঞাপন রহস্য নিয়ে আলোচনা করছে সাজিদ, এই সময় না চাইতেই পুষ্পবৃষ্টির মত সবার মধ্যে আনন্দঘন একটা অনুভূতি জাগিয়ে তার চেম্বারে উদয় হলো এজেন্সির কর্ণধার স্বয়ং মাসুদ রানা।

ওকে দেখে প্রথমে হকচকিয়ে গেল ওরা, তবে তা মাত্র এক সেকেন্ডের জন্য। পরমুহূর্তে আনন্দ-উল্লাসে হইহই করে উঠল সবাই।

কুশলাদি বিনিময়ের পর গল্প-গুজবের মধ্যে দিয়ে আপ্যায়ন পর্বও শেষ হলো এক সময়। তারপর সহকারীদের প্রশ্নের জবাবে রানা জানাল কোনও কাজে নয়, স্রেফ ছুটি কাটাতে বেরিয়েছে ও; পুব ভারতের 'সেভেন সিস্টার্স' ঘুরে মায়ানমারে এসেছে বন্ধুবর এয়ার কমোডর হুনান হো-র আমন্ত্রণে। একঘেয়ে লাগলে যে-কোনও দিন আবার অন্য কোনও দেশে চলে যাবে।

'কী ব্যাপার, ঢুকেই দেখলাম সবাই খুব গম্ভীর?' এরপর প্রশ্ন করল রানা। 'জানতে পারি কী নিয়ে আলাপ করছিলে তোমরা?'

'জী, অবশ্যই জানবেন, মাসুদ ভাই,' হাসিমুখে বলল সাজিদ। প্রথমে কাগজে ছাপা বিজ্ঞাপনটা রানাকে দেখাল সে, তারপর সংক্ষেপে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করল।

পিসিআই থেকে অবসর নেওয়ার পর কর্নেল আরমান খান রানা এজেন্সির শাখাপ্রধানদের মাধ্যমে□যখন যে-ব্যক্তি দায়িত্বে থাকত□বাংলাদেশকে যথাসাধ্য এসপিওনাজ সার্ভিস দিতেন।

যখনই শাখাপ্রধান বদল হয়েছে, নিরাপত্তার কারণে কর্নেল আরমান খানের কোডনেমও বদলে গেছে। বছর সাতেক আগে হক মাওলা ছদ্মনামটা সাজিদই বাছাই করেছিল। সেজন্য তার ধারণা, একা শুধু তার উদ্দেশেই ছাপা হয়েছে বিজ্ঞাপনটা।

রানা জানে, সাজিদের এ ধারণা ঠিক নয়। হক মাওলা ছদ্মনামটা সাজিদ ও ম্যাডাম ইরাবতি ছাড়াও অন্য একজন জানে।

তার নাম সিতওয়ে আরাকানী।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যে-কজন বার্মিজ স্বেচ্ছায় অংশ নিয়েছিলেন, সিতওয়ে আরাকানী তাঁদের মধ্যে অনত্যম। তবে তাঁর রণক্ষেত্র ছিল তখনকার বার্মার মাটি।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু নিরীহ ও অসহায় বাঙালী সীমান্ত পার হয়ে বার্মায় ঢুকে পড়েছিল। তাদেরকে খুন করবার জন্য ধাওয়া করে অরক্ষিত সীমান্ত দিয়ে বার্মার ভিতরে ঢুকে পড়ে পাকিস্তান আর্মি।

এরকম একটা অন্যায় ও নৃশংস কাণ্ড ঘটতে চলেছে দেখে স্থির থাকতে পারেননি সিতওয়ে আরাকানী, স্থানীয় কিছু মুসলিম-অমুসলিমদের নিয়ে পাকিস্তান আর্মির বিরুদ্ধে 'বাঙালী রক্ষা' নামে অত্যন্ত শক্তিশালী একটা প্রতিরোধ কমিটি গড়ে তোলেন তিনি।

বাঙালী রক্ষা কমিটি তৎপরতা চালাত গোপনে। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে এই কমিটির হাতে পাকিস্তান আর্মির বেশ কিছু সাধারণ সৈনিক ও অফিসার মারা যায়।

তবে বাঙালী রক্ষা কমিটির আসল কৃতিত্ব ছিল মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে। পরাজয় নিশ্চিত জেনে পাঞ্জাবি সৈন্য ও রাজাকাররা যখন পালাচ্ছে।

দখলদার বাহিনীর সদস্য ও তাদের দোসর রাজাকাররা বলাবলি করত—পাকিস্তান ও ইসলামকে রক্ষা করবার জন্য কবর থেকে দলে দলে সশস্ত্র লাশ উঠে আসতে দেখেছে তারা, আর আকাশ থেকে নেমে আসতে দেখেছে সশস্ত্র ফেরেশতাদের; এই লাশ ও ফেরেশতারা নাকি মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ করেছে; কিন্তু বাংলাদেশ-বার্মা সীমান্তে তারা এর ঠিক বিপরীত একটা দৃশ্যই দেখতে পেল।

তাদের বর্ণনা অনুসারে লাশ বা ফেরেশতার মতই দেখতে, কুয়াশার ধূসর চাদরে গা ঢাকা দিয়ে পাহাড় থেকে নেমে এল কয়েকটা দল, পাখি শিকারের মত গুলি করে মারছে পলায়নপর পাকিস্তানী সৈন্য ও রাজাকারদের!

পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর রেকর্ডে এই ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যাহীন 'ভৌতিক' কাণ্ড বলা

হয়েছে। যেহেতু নিজেরা মার খেয়েছে, তাই এর সঙ্গে কোনও লাশ ও ফেরেশতাকে জড়াতে রাজি নয় তারা, তার বদলে সন্দেহভাজন কিছু আরাকানী ভদ্রলোকের তালিকা তৈরি করেছে তারা।

সেই তালিকার প্রথম নামটাই হলো সিতওয়ে আরাকানী।

বাঙালী রক্ষা কমিটির প্রধান হিসাবে আজও তাঁর উপর কড়া নজর রাখছে পিসিআই।

কর্নেল আরমান খান মারা যাবার পর, তাঁরই করে যাওয়া সুপারিশে, বাংলাদেশকে এসপিওনাজ সার্ভিস দেওয়ার দায়িত্ব পেয়েছেন এই বার্মিজ ব্যবসায়ী।

সিকিউরিটির কারণে সিতওয়ে আরাকানী সরাসরি রানা এজেন্সির হেডকোয়ার্টার ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন, ওই একই কারণে তাঁর এই দায়িত্ব সম্পর্কে ম্যাডাম ইরাবতি কিংবা রানা এজেন্সির ইয়াংগন শাখাকে কিছু জানানো হয়নি।

সিতওয়ে আরাকানীর সঙ্গে পরিচয় ও হৃদ্যতা আছে রানার, ইয়াংগনে এলে দেখা না করে ফেরে না ও। এবারও, রাজধানীতে পা দেওয়ার পর পরই টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে ওর। গতকাল তাঁর বাড়িতে দেখাও করেছে।

সাজিদ তার কথা শেষ করল একটা প্রশ্ন দিয়ে : কর্নেল আরমান খান পাঁচ বছর আগে মারা গেছেন, তা হলে মরা মানুষ বিজ্ঞাপন দেন কীভাবে?

সব শুনে রানা জানতে চাইল, ‘একটা কিছু তো আন্দাজ করছ তুমি। কী সেটা?’

‘আমার ধারণা এ নিশ্চয়ই তাঁর স্ত্রী, ম্যাডাম ইরাবতির কাজ,’ বলল সাজিদ। ‘বিশেষ কোনও প্রয়োজনে রানা এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছেন।’

‘সম্ভব,’ বলল রানা। ‘এবার তা হলে ম্যাডাম ইরাবতি

সম্পর্কে একটা ধারণা দাও আমাকে। যে ভদ্রলোক বাংলাদেশ স্বাধীন হবার সময় অবসর নিয়েছেন, তাঁর স্ত্রীর বয়স সত্তর ছাড়িয়ে যাবার কথা।'

'ম্যাডাম ইরাবতি সম্পর্কে আমি প্রায় কিছুই জানি না,' বলল সাজিদ। 'তিনিও আমাদের এজেন্সি সম্পর্কে কখনও কোনও আগ্রহ দেখাননি। তাঁর সম্পর্কে ভাল খবর রাখতেন আমার আগে এখানে যিনি শাখাপ্রধান ছিলেন—মরহুম শাহিন সাজ্জাদ। আমি শুধু শুনেছি লেমিয়েথনার পাহাড়ী এলাকায় ভদ্রমহিলার বিরাট খামারবাড়ি ও প্ল্যানটেশন আছে, আর বাংলাদেশ ও বাঙালী লেবারদের প্রতি খুব নাকি সহানুভূতিশীল তিনি।'

'আচ্ছা। তা বেশ তো, আমরা তাঁর খামারবাড়িতে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারি কোনও রেসপন্স পাওয়া যায় কি না,' বলল রানা।

কমপিউটার থেকে ফোন নম্বর বের করে ডায়াল করল সাজিদ। বেশ কয়েকবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু ধরছে না কেউ।

এরপর প্রসঙ্গটা কিছুক্ষণের জন্য চাপা পড়ে গেল। ইয়াংগন শাখার কাজকর্ম কেমন চলছে জানতে চাইল রানা।

'মাসুদ ভাই,' হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় অন্য একটা প্রসঙ্গ তুলল সাজিদ। 'ইয়াংগনের পিসিআই অফিসে সিরিয়াস কিছু একটা হয়েছে বলে মনে হয়।'

'কী রকম?' জানতে চাইল রানা।

'বিভিন্ন সূত্র থেকে আমরা নানা রকম খবর পাচ্ছি। ওদের রিজিওনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর কর্নেল আজমল হুদার একজন বডিগার্ড অফিসের ভেতরই নাকি খুন হয়েছে। লোকটার নাম উ থুইমুই।'

'স্ট্রেঞ্জ!'

'ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কে তাকে খুন করেছে। লাশটা পাঠানো

হয়েছে হেনযাদা ক্যান্টনমেন্টে, জেনারেল উ নিমুচির কোয়ার্টারে। থুইমুই তাঁর ভাইপো।'

'ও গড।' চিন্তিত দেখাচ্ছে রানাকে। 'কেন খুন হলো, কার হাতে, এ-সব কিছু জানতে পারনি?' জিজ্ঞেস করল ও।

মাথা নাড়ল সাজিদ। 'না। তবে ওদের এক স্টাফকে খুঁজছে ওরা,' বলল সে। 'তার নাম শায়লা শারমিন, কমপিউটার সেকশনের হেড। খুঁজছে যখন, বোধহয় পালিয়েছে। খুনটার সঙ্গে তার নিখোঁজ হবার সম্পর্ক থাকতে পারে।'

'পারে,' সাজিদের যুক্তি সমর্থন করল রানা। 'আমার তো মনে হচ্ছে এমনকী বিজ্ঞাপনটার সঙ্গেও এগুলোর সম্পর্ক আছে। খেয়াল করেছ, সবগুলো খবরই পিসিআই-কে নিয়ে?'

'জী, মাসুদ ভাই।'

কেসটা ইন্টারেস্টিং লাগছে রানার। এক মুহূর্ত চিন্তা করে সাজিদকে বলল ও, 'ঠিক আছে, যার কাজ নেই সে-ই নাহয় খই ভাজুক। এ নিয়ে তোমাদেরকে মাথা ঘামাতে হবে না, কী ব্যাপার আমি দেখছি।'

মাথা ঝাঁকাল সাজিদ। 'জী, মাসুদ ভাই।'

'তোমরা শুধু শায়লা শারমিনের ঠিকানাটা যোগাড় করে দাও আমাকে,' আবার বলল রানা। 'ভাবছি তার বাড়িতে তল্লাশি চালালে দু'একটা ক্লু পেয়েও যেতে পারি। তা ছাড়া, আমার কিছু অস্ত্রও লাগবে।'

'জী, এখনই দিচ্ছি।' বিস্মিত হলেও, আর কিছু বলল না সাজিদ। তবে সে আন্দাজ করল, এর মধ্যে গভীর কোনও তাৎপর্য দেখতে পেয়েছেন মাসুদ ভাই।

পাঁচ

শারমিন পালিয়েছে, এ খবর পাওয়া মাত্র তার বাড়িতে সার্চ পার্টি পাঠিয়েছিল কর্নেল হুদা, নেতৃত্ব দিয়েছে মদুদ মাকরানী। পরদিন সকালে তারা রিপোর্ট করেছে, গোটা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও শারমিন কিংবা কোনও ডকুমেন্টের কপি কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। চাকরবাকররা বলছে, অফিস থেকে শারমিন ফেরেনি; কোনও ডকুমেন্টের কথাও তারা জানে না।

রিপোর্ট শুনে হুদা নির্দেশ দিয়েছে□দুজন পাহারায় থাকো, কারণ আমার বিশ্বাস শারমিন নিশ্চয়ই ওখানে কিছু লুকিয়ে রেখে গেছে। বাকি সবাই চাকরবাকরদের নিয়ে ফিরে এসো, ওদেরকে জেরা করতে হবে।

মকবুলকে নিয়ে বাগানবাড়িতে রয়ে গেছে মদুদ। মকবুল বাড়ির চিলেকোঠার ছাদে উঠে শুয়ে পড়েছে, পাশে পড়ে আছে একটা রাইফেল, তীক্ষ্ণ নজর রাখছে গোটা বাড়ির চারদিকে।

আর কিচেনে ঢুকে নিজেদের জন্য রান্না করবার ফাঁকে বাড়ির চারধারে টহল দিচ্ছে মদুদ।

এভাবে যে পাহারা দেওয়া হতে পারে, কর্নেল আরমান খানের সাবেক দেহরক্ষী থোন ফালান আগে থেকেই সেটা আন্দাজ করতে পেরেছে। এই বাড়ির সীমানা-প্রাচীর ও বাগান নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সেই তৈরি করিয়েছে, কাজেই কোথায় কী আছে সবই তার জানা।

রাস্তা দিয়ে আসেইনি ফালান। বাড়ির সামনের দিকটাও

এড়িয়ে গেছে। এসেছে আরেক বাগানবাড়ির পিছন থেকে, দুই বাড়ির মাঝখানের ভাঙা পাঁচিল টপকে, ঘন ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে।

আড়ালে দাঁড়িয়ে মদুদকে টহল দিতে দেখেছে ফালান। দেখেছে নীচতলার কিচেনে ঢুকে রান্না চড়াতে। সুযোগ বুঝে নিঃশব্দ পায়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এসেছে সে, পকেট থেকে ম্যাডামের দেওয়া চাবির গোছা বের করে তার শারমিন দিদিমণির ড্রেসিং রুমের দরজা খুলেছে।

বেশি খুঁজতে হয়নি ফালানকে। কোমরের কালো বেল্ট একটাই থাকার কথা, ওয়ার্ড্রোব খুলে সেটা দেখতে পেয়ে আর দেরি করেনি সে–কোমরে জড়িয়ে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে একই পথে, মকবুল কিংবা মদুদের চোখে ধরা না পড়েই।

কিন্তু তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ছোট্ট একটা ভুল করে গেছে ফালান। চাবির গোছাটা ড্রেসিং রুমের তালায় ঝুলিয়ে রেখে গেছে সে।

রিপোর্ট পেয়ে ভয়ানক খেপে গেছে কর্নেল হুদা। মদুদকে নির্দেশ দিয়েছে, অন্তত আরও তিনজন গার্ড নিয়ে বাগানবাড়ির ভিতর গা ঢাকা দিয়ে থাকুক তারা। তার বিশ্বাস, চাবিটা নিতে আবার পাঠানো হবে কাউকে। ঠিক মত ফাঁদ পাতলে তাকে ধরতে না পারার কোনও কারণ নেই।

রানার দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, তাদের তৈরি এই ফাঁদটা ওর বিরুদ্ধে কাজে লাগতে যাচ্ছে।

কবর থেকে উঠে হক মাওলা পুরানো বন্ধুদের খুঁজছে।

জানা কথা, বিজ্ঞাপনের সঙ্গে ঠিকানা না থাকায় পত্রিকা অফিসের

সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। তাই করতে যাচ্ছে রানা, তবে টেলিফোনে নয়, সশরীরে হাজির হয়ে।

পত্রিকা অফিসে যাওয়ার পথে পড়ল শায়লা শারমিনের বিশাল বাগানবাড়িটা। ওটাকে পাশ কাটিয়ে বেশ কিছুদূর চলে এল ট্যাক্সি, ড্রাইভারকে থামতে বলে ভাড়া মেটাল রানা, তারপর পায়ে হেঁটে ফিরতি পথ ধরল।

থোন ফালানের মত রানাও আন্দাজ করল, বাড়িটাকে পাহারা দিচ্ছে পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স। প্রথমে কয়েকটা চক্কর দিয়ে চারপাশটা ভাল করে দেখে নিল ও। গোটা বাড়ি খালি ও পরিত্যক্ত লাগল ওর। কেউ কোথাও নেই, জানালাগুলো বন্ধ।

কোনও রকম পাহারা না থাকায় মোটেও খুশি হলো না রানা। এর মানে হলো গার্ডরা বাড়ির ভিতরে কোথাও লুকিয়ে আছে। ঢোকা মাত্র ক্যাঁক্ করে ধরবে।

কী করা যায় ভাবছে রানা। ওর ধারণা ভুলও হতে পারে, বাড়িটা হয়তো আসলেই খালি। তবু সাবধানের মার নেই।

সিদ্ধান্ত নিল, দিনে-দুপুরে সুট-টাই পরে পাঁচিল টপকাবে না। তারচেয়ে নিরীহ সরল মানুষের অভিনয় করবে—খোলা গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে নক করবে সদর দরজায়। সত্যি যদি কেউ না থাকে, মাস্টার কি দিয়ে তালা খুলে ভিতরে ঢুকবে।

গেট দিয়ে উঠানে ঢুকল রানা। কেউ বেরিয়ে এসে বাধা দিচ্ছে না। উঠান পেরিয়ে পাশ কাটাল শ্বেতপাথরের দেব-দেবীদের মূর্তিগুলোকে। এখনও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। পাথুরে ধাপ কটা পেরিয়ে সদর দরজার সামনে দাঁড়াল। কোথাও কোনও শব্দ নেই। কল বেলে চাপ দিল। ভিতরে বেল বাজছে। কেউ সাড়া দিচ্ছে না।

রানার এক হাতে মাস্টার কি বেরিয়ে এল, অপরহাতে ওয়ালথার পিস্তল।

কোনও সমস্যা হলো না, সদর দরজা খুলে দালানের ভিতর ঢুকল রানা। সামনে লম্বা করিডর। একের পর এক কয়েকটা দরজার সামনে থেমে তালাগুলো পরীক্ষা করল, সবগুলোই বন্ধ।

শুধু কিচেনের দরজায় তালা দেওয়া নয়। ভিতরটা ঝকঝক তকতক করছে, দেখে মনে হলো না সম্প্রতি কেউ ব্যবহার করেছে।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এল রানা। করিডরের দু'পাশের বেশ কয়েকটা কামরা বন্ধ, প্রতিটি দরজায় তালা দেওয়া। পুরো দোতলাটা ঘুরে দেখল ও। লোহার তৈরি প্যাঁচানো একটা সিঁড়ি দেখা গেল পিছনদিকে, নীচের বাগানে নামা যায়।

সামনের দিকে ফিরে এসে লিভিংরুম মনে করে একটা কামরার দরজা খুলে দেখল ওটা আসলে কোনও মেয়ের বেডরুম, লেস লাগানো নাইট ড্রেস ঝুলছে চেয়ারের পিঠে।

কামরাটা ভাল ভাবে সার্চ করল রানা। কাজের ফাঁকে মাঝে মধ্যে কান পাতল, কোথাও থেকে কোনও আওয়াজ আসছে কি না শোনার চেষ্টা করল। না।

প্রতিপক্ষরা এক চুল নড়ছে না কেউ, ভুলেও কোনও শব্দ করছে না। রানা কিছু টের না পেলে কী হবে, বন্ধ কামরার ভিতর থেকে, জানালা আর ভেন্টিলেটারের ফাঁক ও তালার ফুটো দিয়ে ওর উপর কড়া নজর রাখছে তারা।

বিশ মিনিট তল্লাশি চালিয়েও কিছু পেল না রানা। করিডরে বেরিয়ে এসে তালা খুলল ডান পাশের কামরাটার। ভিতরে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজা।

এটা শারমিনের ড্রেসিং রুম। ভিতরে বেশ কিছু ফার্নিচার দেখা যাচ্ছে□ওয়ার্ড্রোবটা বিরাট ও ভারী, ডিম আকৃতির বিরাট আয়না লাগানো ড্রেসিং টেবিল, এক কোণে ইস্পাতের তৈরি প্রকাণ্ড ট্রাঙ্ক, আরেক ধারে ডিভান ইত্যাদি।

সার্চ শুরু করবার আগে সংলগ্ন বাথরুমটা দেখে নিচ্ছে।

আগেই খেয়াল করেছে রানা, ড্রেসিং রুমে দরজা মাত্র দুটো; একটা দিয়ে ঢুকেছে ও, আরেকটা দিয়ে বাথরুমে যাওয়া যায়। কামরাটায় কোনও জানালা নেই, তার বদলে দেয়ালে ফিট করা এয়ারকুলার দেখা যাচ্ছে। তবে বাথরুমে জানালা আছে, একটু উঁচুতে। গ্রিল ভাঙতে পারলে ভিতরে মানুষ ঢুকতে পারবে ।

বাথরুম থেকে ড্রেসিং রুমে ফেরার আগে দরজা খোলা রেখেই ব্লাডারটা খালি করে নিল রানা। ট্রাউজারের চেইন লাগাচ্ছে, হঠাৎ ঝোপ-ঝাড় নড়ে ওঠার, সেই সঙ্গে পাখির ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ ঢুকল কানে। তারপর চাপা স্বরে কে যেন শ্‌শ্‌শ্‌ করল। স্থির হয়ে গেল ও, শুধু চোখের দৃষ্টি ঝট করে উঠে গেল জানালার দিকে।

হার্টবিট বেড়ে গেছে রানার। গোটা বাড়ি খালি, তা হলে শ্‌শ্‌শ্‌ করল কে?

ফাঁদ?

সাবধানে কমোডের উপর দাঁড়াতে যাচ্ছে রানা, খেয়াল রাখছে যাতে কোনও শব্দ না হয়।

এই সময় অকস্মাৎ ওকে হকচকিয়ে দিয়ে ড্রেসিংরুম থেকে বাইরে বেরুবার একমাত্র দরজায় কর্কশ ধাতব শব্দ হলো। স্পষ্ট বোঝা গেল ইস্পাতের বোল্টটা বাইরে থেকে ঘটাং করে জায়গামত ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রানা এখন বন্দি, ড্রেসিং রুমের ভিতর আটকে ফেলা হয়েছে ওকে।

ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে গেল, সঙ্গে সঙ্গে রিয়্যাক্ট করারও সময় পেল না রানা। সংবিৎ ফিরতে লাফ দিয়ে ড্রেসিং রুমে চলে এল। দেয়াল ঘেঁষে থেমে দরজাটা পরীক্ষা করল দ্রুত, বাইরে থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ভিতর থেকে নিজেও বোল্ট

টেনে দিল ও। তারপর কঠিন, ধমকের সুরে প্রশ্ন করল ও, 'হু ইজ দেয়ার?'

'তেরা বাপ ইজ হিয়ার, সালে বুড়বাক কাহিঁকে!' করিডর থেকে অকথ্য ভাষায় আরও কয়েকটা গালি দিল কেউ, কথার সুরে পাঞ্জাবি টান স্পষ্ট।

লোকটা একা নয়, উপলব্ধি করল রানা। অন্তত তিনজনের হাসির আওয়াজ পাচ্ছে ও।

পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর। বন্ধ ঘরে আটকা পড়ার মত আর খারাপ কিছু হতে পারে না।

মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভাবো।

ওর পিস্তলে গুলি আছে আটটা। স্পেয়ার ক্লিপ থেকে পাওয়া যাবে আরও আটটা। ডান বাহুতে ছুরি আছে, স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো। ব্যস, এগুলো দিয়েই আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে হবে।

জানা দরকার সব মিলিয়ে কজন ওরা। বাথরুমে এসে কমোডের উপর দাঁড়াল রানা, জানালায় নাক ঠেকিয়ে বাইরেটা দেখবার চেষ্টা করছে। একটা ঝোপের ধারে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাব করছে এক লোক, আরেক লোক তার দিকে পিছন ফিরে সিগারেট ধরাবার জন্য দেশলাই জ্বালল। দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল, দুজনেই পাঞ্জাবি। সন্দেহ নেই, পিসিআই অপারেটার ওরা। সংখ্যায় কমপক্ষে পাঁচজন।

আবার ড্রেসিং রুমে ফিরে এল রানা। কি হোলে চোখ রেখে দেখল, উঁহুঁ, কিছু দেখা যাচ্ছে না। এদের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না ওর, তবু তথ্য পাওয়ার স্বার্থে মুখ খুলতে হলো।

'তোমরা কারা? এই বাড়িতে কী করছ?' জানতে চাইল রানা। 'বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করার মানে কী?'

'আমরা তোমার আজরাইল, সালা বানচোত। দরজা বন্ধ করেছি, কারণ জানি শারমিন তোকে চাবির গোছাটা নিতে পাঠিয়েছে।

জায়গামত মোবাইল করে দিয়েছি,' করিডর থেকে এক লোক জবাব দিচ্ছে। 'বিগ বস্ আসছেন, বাতচিত যা করার তিনিই করবেন।'

'কে তোমার বস্?' প্রশ্ন করল রানা।

'কার্নেল আজমাল হুদা।'

'কে সে? এই বাড়ির সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?' কিছুই না জানার ভান করছে রানা।

'দোস্তের জন্যে আমাদের কার্নেল দিলদরিয়া, দুশমনের জন্যে আজরাইল,' জবাব দিল আর একজন। 'এটা আমাদের কলিগের বাড়ি।' জবাব দিলেও, রানাকে কোনও প্রশ্ন করছে না তারা।

কর্নেল হুদা যদি ফোর্স নিয়ে আসে, তাতে কম করেও আরও পাঁচজন থাকবে। তার মানে সব মিলিয়ে দশজনের সঙ্গে একা যুঝতে হবে রানাকে। ঘামছে ও।

এখন ওর সামনে দুটো পথ খোলা।

পাঁচজনের সঙ্গে লড়বে, নাকি দশজনের?

ভাবছে রানা। হোক দশজন, তারা ওকে দেখামাত্র গুলি না-ও করতে পারে। আবার ধরে নিয়ে গিয়ে পুরানো আক্রোশ মেটানোর জন্য দিন সাতেক নরকযন্ত্রণা ভোগাবার পর খুন যে করবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এ এমন অনেক কর্মকর্তা আছে যারা বাংলাদেশের মাসুদ রানাকে তাদের সবচেয়ে বড় দুশমন বলে মনে করে।

না! সিদ্ধান্ত নিল রানা। বিকল্প থাকতে ঝুঁকি নেবে না। এখনই লড়বে ও। পাঁচজনের সঙ্গে।

তবে আলোচনার মাধ্যমে কিছু করা যায় কি না... অন্তত চেষ্টা করে একবার দেখা যেতে পারে। 'আমার কাছে মাস্টার কার্ড আছে। ভেবে-চিন্তে করে বলো, কত টাকা পেলে কেউ এসে পড়ার আগেই চলে যেতে দেবে আমাকে।'

করিডর নীরব হয়ে গেল। তারপর শোনা গেল তিনজনের

মিলিত কণ্ঠের হাসি।

'হারামজাদা জাত গোক্ষুর,' মন্তব্য করল একজন।

'আরে রাখ্,' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল আরেকজন। 'দেখ্ গে যা, ভয়ে বোধহয় প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলছে।'

বাথরুমে ঢোকার সময় নিজেকে ইস্পাতের মত শক্ত করল রানা। এখন রক্ত ঝরবে। তবে বলা যায় না কার রক্ত।

কমোডে পা দিয়ে জানালার গ্রিলের ফাঁক দিয়ে ওয়ালথার তাক করল রানা, লক্ষ রাখল বাইরে থেকে যাতে দেখা না যায়। জানালার দিকে পাশ ফিরে, পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শান্ত ভঙ্গিতে গল্প করছে দুই অপারেটার।

'গ্রিল ভেঙে বেরিয়ে যাই আমি,' একটু গলা চড়িয়েই বলল রানা, যেহেতু জানে করিডরের লোকগুলো শুনতে পাবে না। 'বাধা না দিলে এক লাখ ডলার...' কথা শেষ হয়নি, তার আগেই ওয়ালথারের ট্রিগার টিপ দিতে বাধ্য হলো ও।

পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স অপারেটররা একযোগে যে যার পিস্তল ড্র করেছে, তবে জানালার দিকে মাজল তাক করবার সুযোগ পেল না, তার আগেই বদ্ধ জায়গার ভিতর গর্জে উঠেছে রানার ওয়ালথার।

একজনের খুলি উড়িয়ে দিয়েছে রানার প্রথম বুলেট। প্রায় একই সঙ্গে দ্বিতীয় বুলেট ফুটো করে দিয়েছে তার সঙ্গীর হৃৎপিণ্ড।

প্রতিপক্ষের শক্তি কমে এখন পাঁচভাগের তিনভাগে ঠেকল।

গ্রিলটার একপ্রান্তের উপরে ও নীচে আরও দুটো গুলি করল রানা, ফলে দেয়ালে গাঁথা অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ওদিকটা। এবার জোরে চাপ দিলে হয়তো অপর প্রান্তটাকে বাঁকিয়ে ফেলা যাবে, কিংবা আরও দুটো গুলি করে গোটা গ্রিল থেকে মুক্ত করা যাবে জানালাটাকে।

হইচই ও খিস্তি শুনে রানা বুঝল, করিডর ঘুরে, লোহার

প্যাঁচানো সিঁড়ি বেয়ে, বাথরুমের পিছন দিকে ছুটে এসেছে দুজন পিসিআই অপারেটার। মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে কমোড থেকে নেমে ড্রেসিং রুমে ফিরে এল ও, বাথরুমের দরজা বন্ধ করে নিঃশব্দ পায়ে চলে এল দ্বিতীয় দরজার আড়ালে।

রানার হিসাব যদি ভুল না হয়, করিডরে এখন মাত্র একজন লোক পাহারায় আছে। এখন যে ঝুঁকিটা নেবে ও, সেটাকে ডুয়েল লড়ার সঙ্গে তুলনা করা যায়।

সংশয় জাগল জিপগাড়িটা ওর মাথার ভিতর ব্রেক কষল কি না। শুনতে ভুল হোক বা না হোক, ওর প্রতিটি নড়াচড়া মাপা হয়ে উঠল, প্রায় যান্ত্রিক; জানে এই ফাঁদ থেকে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারলে মিরাকলকেও হার মানানো হবে।

দরজার গায়ে, তালা ও বোল্ট লক্ষ্য করে, পর পর দুটো গুলি করল রানা। বিরতি না নিয়ে প্রচণ্ড একটা লাথি মারল কবাটে। দড়াম করে খুলে গেল সেটা।

একমাত্র গার্ড মওদুদ মাকরানী চমকে উঠে পিছাতে শুরু করেছে, তবে হাতের পিস্তলও তুলছে সে, জানে সদ্য ভাঙা দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসবে রানা।

তাই এল রানা। ঠিক যেন ডুয়েলই, একইসঙ্গে ট্রিগার টানল দুজন।

কেউ মারা গেলে তার ছুটি, তাকে আর কিছু করতে হয় না। এক্ষেত্রে ছুটিটা রানা পেল না।

দেখা গেল করিডর ধরে ওর দিকে ছুটে আসছে নতুন বিপদ–চারজন সহকারীকে নিয়ে স্বয়ং কর্নেল আজমল হুদা। তার হাতে পিস্তল রয়েছে, সহকারীদের হাতে অটোমেটিক কারবাইন। এখনও অনেকটা দূরে তারা, তবে ফটোতে দেখা দীর্ঘদেহী কর্নেলকে চিনতে ওর কোনও অসুবিধে হলো না।

কে জানে ওর ফটোও লোকটার দেখা আছে কি না। সেদিকে

একটা গুলি করল রানা, স্রেফ সাবধান করবার জন্য। তারপর রিলিয বাটন টিপে খালি ম্যাগাযিন বের করে নিয়ে দ্রুত হাতে স্পেয়ার ক্লিপটা পিস্তলে ভরল, স্লাইড টেনে ছেড়ে দিতেই তৈরি হয়ে গেল অস্ত্রটা আরও আটটা গুলি উগরানোর জন্য।

ড্রেসিং রুমটা ফাঁদ, জানে রানা। ঘুরে উল্টোদিকে ছুটতে যাবে, স্থির হয়ে গেল আবার। বাড়ির পিছনদিক থেকে লোহার প্যাঁচানো সিঁড়ি বেয়ে গার্ড মওদুদ মাকরানীর সঙ্গী দুজন ফিরে আসছে। দূর থেকেই রানাকে লক্ষ্য করে গুলি করল তাদের একজন। তবে লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হলো সে, আর একটু হলেই খুন করে ফেলত ওদের বস্‌কে।

অবশ্য রানার লক্ষ্য ব্যর্থ হয়নি। পর পর দুটো গুলি করল ও। গুলি লেগেছে দুজনকেই, করিডরে আছাড় খেয়ে পড়ল তারা। তবে দুজনের মুখ থেকেই অশ্রাব্য খিস্তি বেরিয়ে আসছে দেখে মনে হলো কারও আঘাতই খুব বেশি গুরুতর নয়।

আপাতত তো বাঁচি ভেবে, লাফ দিয়ে আবার ড্রেসিং রুমে ঢুকল রানা।

ড্রেসিং রুমের দরজাটা এখন আর বন্ধ করবার কোনও উপায় নেই।

এখন কী করবে রানা? কোথায় লুকাবে?

ভারী ওয়ারড্রোবটা ভাঙা দরজার পাশে, সেটার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো গুনতে পারে।

নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গিয়ে শুনতে পারে আহত পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স অপারেটারদের মুখে রিপোর্ট শোনার পর কর্নেল হুদা কী নির্দেশ দেয়।

কিংবা চিৎকার করে বলতে পারে, 'আমি সারেন্ডার করছি।' তারপর মাথার উপর হাত তুলে ধীরে ধীরে করিডরে বেরিয়ে যেতে পারে।

যদিও এ-সবের কিছুই করল না রানা।

আগে বলা দরকার কর্নেল হুদা কী করল।

না, আহত অপারেটাররা তাকে কোনও রিপোর্ট দিতে পারেনি। বাথরুমের পিছন থেকে যে দুজন ফিরে আসছিল, খিস্তি করবার পরপরই মারা গেছে তারা।

পরিস্থিতি সম্পর্কে কর্নেল হুদা ধারণা পেল নিজের লোকদের লাশ ও কোণঠাসা ইঁদুরের মত রানাকে গর্তের ভিতর লুকাতে দেখে।

'কিল হিম!' বজ্রকণ্ঠে নির্দেশ দিল হুদা, প্রচণ্ড ক্রোধে থরথর করে কাঁপছে শরীরটা। 'কিল হিম! কিল হিম!'

'বাট হাউ, কর্নেল, সার?' সহকারীদের কেউ একজন জিজ্ঞেস করল।

'খোলা দরজা লক্ষ্য করে ব্রাশ ফায়ার করো, যেন কোনওভাবেই করিডরে বেরুতে না পারে বেজন্মা কুত্তাটা,' বলল হুদা, হিংস্র বাঘের মত লাগছে তাকে। 'তারপর ঘরের ভেতর গ্রেনেড চার্জ করো–একের পর এক–অন্তত দশটা। সবশেষে...'

কথাটা শেষ করল না হুদা।

'সবশেষে, কর্নেল?'

'জিপ থেকে পেট্রল এনে ঢালো, গোটা বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দাও,' বলে নিরাপদ দূরত্বে সরে দাঁড়াল সে।

শুরু হলো ড্রেসিং রুমের ভাঙা দরজা লক্ষ্য করে কারবাইন থেকে ব্রাশ ফায়ার, সেই সঙ্গে পিন খুলে একের পর এক গ্রেনেড নিক্ষেপ। ড্রেসিং রুমের ভিতরটা, যা কিছু আছে সবসহ, চুরমার হয়ে যাচ্ছে। ডিভান, ওয়ার্ড্রোব ও ড্রেসিংটেবিল চুরমার হয়ে গেল। ট্রাঙ্কটা হয়ে গেল ছিন্নভিন্ন।

সবশেষে সত্যি সত্যিই গোটা বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো। দাউ-দাউ আগুনে ছাই হয়ে গেল সব।

ছয়

বেশ অনেকটা দূর থেকে ব্রাশফায়ার ও গ্রেনেড বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে রানা। ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে হাঁটার সময় নিজের কাপড়চোপড়ের উপর চোখ বুলিয়ে একটু অবাকই হলো□কোথাও কিছু ছেঁড়েনি, পোড়েনি, রক্ত লাগেনি, এমনকী ভাঁজ পর্যন্ত নষ্ট হয়নি।

একটু পর মেইন রোডে উঠে ট্যাক্সি নিল রানা। তবে জানালা দিয়ে পিছনে তাকিয়ে আকাশে কালো ধোঁয়া দেখতে পেল, আন্দাজ করল শারমিনের বাড়িতে ওকে পোড়ানোর আয়োজন শুরু হয়েছে।

রানার আন্দাজ নির্ভুল। বাথরুমের জানালা দিয়ে ও যে পালিয়েছে, এই রিপোর্টটা কেউ দেয়নি কর্নেল হুদাকে।

ইয়াংগন, একচল্লিশ নম্বর পুতাও স্ট্রিট। সাগরের কাছাকাছি মনোরম বাগান সহ একটা বাড়ি। এর মালিক দায়েম সিতওয়ে আরাকানী। একাধিক চা-বাগান ও জুট মিলের মালিক ভদ্রলোক।

সিতওয়ে আরাকানীর জীবনে দুটো গোপন বিষয় আছে।

প্রথমটা হলো, প্রাণপ্রিয় বন্ধু ও মামাতো বোনের স্বামী কর্নেল আরমান খানের সান্নিধ্যে এসে রোমাঞ্চকর নেশা এসপিওনাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া।

দ্বিতীয়টিকে তিনি গোপন বলে মনে করলেও, কিছুদিন হলো সেটা আর তেমন গোপন নেই। তাঁর জীবনের এই কলঙ্কের নাম তিসতা আরাকানী।

তিসতা তাঁর একমাত্র সন্তান। স্ত্রী মারা যাওয়ার সময় মেয়ের বয়স ছিল মাত্র সাত। একাই মা ও বাবার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে গোটা ব্যাপারটা লেজেগোবরে করে ফেলেছেন ভদ্রলোক। মেয়ে যতটুকু চেয়েছে বা যতটুকু হজম করতে পারবে, তারচেয়ে অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করতে উৎসাহ যুগিয়েছেন তাকে।

আর্থিক প্রাচুর্য বরাবরই ছিল সিতওয়ে আরাকানীর। বার্মিজ সমাজ-ব্যবস্থাকে রক্ষণশীল বলা চলে না, তা সত্ত্বেও পশ্চিমা জীবনধারার প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করেন তিনি। তাই তাঁর খুব শখ হয় মেয়েকে আধুনিকা বানাবেন।

মাত্র বারো বছর বয়েসেই তিসতাকে পাঠিয়েছিলেন আমেরিকায়, সেখানে অভিজাত এক আবাসিক স্কুলে লেখাপড়া শিখেছে সে। ওখানে বাবার চোখের আড়ালে, তবে অজ্ঞাতে নয়, বয়সের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে গেছে তিসতা। ব্যাপারটাকে তখনও তিনি প্রশংসার চোখেই দেখছেন।

মেয়ে লেখাপড়া শেষ না করে হঠাৎ দেশে ফিরে এল, দেখতে না দেখতে তার লাইফস্টাইলের সঙ্গে মেলে এমন কিছু বন্ধু-বান্ধবও যোগাড় করে ফেলল। সেই সঙ্গে শুরু হলো নাইট পার্টি, লং ড্রাইভ, গভীর রাতে বাড়ি ফেরা ইত্যাদি।

তারপর হঠাৎ একদিন একটা ধাক্কা খেলেন আরাকানী। পেটের অবৈধ বাচ্চা নষ্ট করবার জন্য এমন এক ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল তিসতা, যিনি তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু।

যা হওয়ার হয়েছে, এরপর থেকে সাবধান হতে চাইলেন আরাকানী। আর তখনই টের পেলেন বিশ বছরে পা দেওয়া তিসতার উপর আসলে তাঁর কোনও নিয়ন্ত্রণই নেই। তা ছাড়া,

দেখা গেল, একমাত্র মেয়ের প্রতি কঠিনও হতে পারছেন না তিনি; শুধু অসহায় বোধ করছেন আর দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন।

নিত্য নতুন বয়ফ্রেন্ড দরকার তিসতার, দরকার নতুন নতুন অ্যাডভেঞ্চার। ছোটবেলা থেকে শিখেছে সে, জীবন একটাই, সেটাকে যেভাবে খুশি মন ভরে উপভোগ করতে হবে। করছেও ঠিক তাই।

দুদিন আগেও মেয়ের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলেছেন আরাকানী। 'মা-মণি, সোনামণি,' আদুরে সুরে শুরু করেছেন তিনি। 'একটু আস্তে-ধীরে এগোও। জীবনটা অনেক বড়, ভোগ করার জন্যে সময়ও পাবে প্রচুর। ধীরে ধীরে চুমুক দাও, তা হলেই না বুঝবে, ওয়াইনে কী মজা। এটা আর সব ব্যাপারেও সত্যি।'

'পাপা! ওহ্, পাপা!' একরাশ কালো চুল ঝাঁকিয়ে হেসে উঠেছে তিসতা। 'ছেলেরা আমাকে পছন্দ করে! তারা আমার জন্যে পাগল! আর কী সব ছেলে তারা—প্রত্যেকে মার্সিডিজ নয়তো নেক্সাস হাঁকায়। ওদের অনেকের বাপ তোমাকে পাঁচ-সাতবার করে কিনতে পারবে। নো, ড্যাড, তুমি নাক গলাতে এসো না। আমার জীবনটাকে আমি আমার মত করে চালাব।'

আরাকানী জানেন না তিসতার কাছে জীবনটাকে নিজের মত করে চালানোর একটা নমুনা হলো: পূর্ণিমার রাতে নির্জন সৈকতে চারজন একসঙ্গে শোয়া, তাদের মধ্যে সে ছাড়া সবাই পুরুষ, বাকি সবার মত সে-ও বিবস্ত্র।

কাল বেলা এগারোটার দিকে রানার সঙ্গে ড্রইংরুমে বসে আলাপ করবার সময় বাথরুমে যেতে হয়েছিল আরাকানীকে, ফিরে এসে দেখেন সদ্য ঘুম থেকে ওঠা তিসতা আলুথালু বেশে ভিতরে ঢুকে বুভুক্ষু রাক্ষসীর মত রানার উপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে।

সুদর্শন ও সুপুরুষ একজন তরুণকে দেখে যে-কোনও মেয়ে আকৃষ্ট হতে পারে, তাই বলে এভাবে তার গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে হবে? মাসুদ রানা তাঁর জুনিয়র বন্ধু, তিসতার আচরণে ওকে বিব্রত হতে দেখে প্রচণ্ড রাগ হয়েছে তাঁর।

কী স্পর্ধা মেয়ের, বাপকে ফিরে আসতে দেখেও রানাকে কথাটা বলতে বাধল না তার, 'বাংলাদেশে আপনার মত স্মার্ট যুবক আছে, এ আমার জানা ছিল না। আজই আপনার সঙ্গে আমার একটা ডেটিং হওয়া দরকার। কোথায়? কখন? কে ঠিক করবে–আপনি, না আমি?'

শুনতে পেয়ে আঁতকে উঠেছেন সিতওয়ে আরাকানী। 'তিসতা, হোয়াট আর ইউ ডুইং?'

'ওহ্, পাপা, ইউ আর ইমপসিবল! আমি আমার বয়ফ্রেন্ডের সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করছি। প্লিজ, মাঝখান থেকে তুমি নাক গলাতে এসো না তো।'

বিব্রত বোধ করলেও কৌশলে পরিস্থিতিটা সামলে নেওয়ার চেষ্টা করল রানা। 'তুমি ভুল করছ, তিসতা। আমি টিন-এজার মেয়েদের গাইড হতে পারি, গার্জেন হতে পারি, কিন্তু ভুলেও কখনো বয়ফ্রেন্ড হই না।'

'প্রথম কথা: আমি টিন-এজার নই,' হেসে উঠে বলল তিসতা, লাফ দিয়ে রানার পাশে সোফায় চড়ল। 'তা ছাড়া, আমার বয়েসি এক মেয়ের কাছে এই খানিক আগে টেলিফোনে শুনলাম, হোটেল সেভেন হেভেন-এ মাসুদ রানা নামে এক ড্যাশিং হিরো তার সঙ্গে মাঝ রাত পর্যন্ত নেচেছে। তার নাম নিদানি থুয়ে, সে আমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী।'

'কথাটা সত্যি নয়। নিদানি নিজে আমাকে বলেছে, গতমাসে তার ছাব্বিশতম জন্মদিন ছিল। আর তার সঙ্গে নাচা তো দূরের কথা, কাল রাতে আমি সেভেন হেভেনে ছিলামই না। সে হয়তো

তার কোনও স্বপ্ন কিংবা ফ্যান্টাসির বর্ণনা দিয়েছে তোমাকে।'

মনে মনে উদ্বিগ্ন বোধ করছে রানা। সিতওয়ে আরাকানী যেখানে এসপিওনাজ পেশায় জড়িত, নিদানি থুয়ে তাঁর মেয়ের বান্ধবী হয় কী করে? পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে বেশ নাজুক।

বাঁকা চোখে কটাক্ষ হেনে হেসে উঠল তিসতা। 'তার স্বপ্ন কাল যদি ফলে না থাকে, শুক্রবারের মধ্যে ফলে যাবে না তা কে বলতে পারে।' তার চোখের দৃষ্টি বলে দিচ্ছে কী যেন একটা ফন্দি আঁটছে সে। 'অত কথার দরকার কি, পাপা সাক্ষী, আমিও টিন-এজার নই!'

'মা-মণি, তা নও বলেই এ-ধরনের ছেলেমানুষি করা সাজে না তোমার,' নরম সুরে বললেন আরাকানী, ভয় পাচ্ছেন কী না কী করে বসে মেয়ে।

কাজের কথা আগেই শেষ হয়েছে, তাই তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে এক রকম পালিয়েই গেছে রানা।

তারপর বাপ ও মেয়ে নতুন করে শুরু করল।

'কাল রাত কটায় ফিরেছ তুমি?' জানতে চাইলেন আরাকানী।

'ভোর হবার আগেই তো,' বলল তিসতা। 'এই সাড়ে চারটের দিকে। তাতে কি কিছু আসে যায়?'

কঠিন হওয়ার চেষ্টা করলেন আরাকানী। কিন্তু যে মেয়ের চেহারায় দুনিয়ার মিষ্টি ও পবিত্র ভাব ফুটে থাকে, অথচ শরীরটা পরিণত রমণীর মত ভরাট ও পুরুষ্টু, তার উপর রাগ করা সত্যি খুব কঠিন। 'তিসতা, আমি আশা করেছিলাম যে অপমান ও শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে তোমাকে, তাতে তোমার শিক্ষা হয়ে গেছে।'

নীল চিনামাটির পট থেকে নিজের জন্য এক কাপ কফি ঢালছে তিসতা। 'তা হয়তো হয়েছে, পাপা। কিন্তু আজ তোমাকে স্বাভাবিক লাগছে না কেন?' জানতে চাইল সে। 'ব্যাপারটা কী?'

'আমি তোমার নতুন বন্ধুটাকে পছন্দ করতে পারছি না।'

বাবা কার কথা বলছে আন্দাজ করবার ভান করল তিসতা। 'কার কথা বলছ তুমি? চিনা দূতাবাসের থার্ড সেক্রেটারি, মিন চাও? নাকি থাই রাজ পরিবারের দূত মিস্টার হীরকবরণ...'

'না।'

'তা হলে তোমার জুনিয়র বন্ধু, মাসুদ রানা?'

'তিনিও নন। তাঁর দ্বারা তোমার কোনও ক্ষতি হবে না।'

'আচ্ছা!' দৃষ্টিতে শয়তানি ভাব নিয়ে তাকিয়ে থাকল তিসতা। 'তিনি নন। তা হলে কি ধরে নেব তুমি আমার বান্ধবী নিদানি থুয়েকে পছন্দ করতে পারছ না?'

'তোমার বান্ধবী!' বিস্ফোরিত হলেন আরাকানী। 'ওই বুনো জন্তুটা? বান্ধবী, না শত্রু? তুমিও জানো ওটা একটা রাক্ষসী, তিসতা! তার কাজই হলো তোমার পার্টিতে ইয়াংগন চষে যত চরিত্রহীন লম্পট পুরুষ যোগাড় করে আনা। প্লিজ, তিসতা, ভুলে যেয়ো না তুমি কার মেয়ে। সমাজের মানুষ তোমার কীর্তিকলাপের কথা শুনে মুখ টিপে হাসছে।'

হাসি হাসি মুখ করে থাকলেও, ভ্রূ জোড়া কুঁচকে রেখেছে তিসতা। 'পাপা, আমি বেশ বুঝতে পারছি নিদানি নয়, তুমি অন্য কোনও ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। আমাকে বলবে না, প্লিজ?'

'বেশ, তা হলে শোনো।' আরেক ঢোক ঠাণ্ডা কফি গিললেন আরাকানী। 'নিদানি যাদেরকে তোমার কাছে নিয়ে আসছে তাদের মধ্যে অন্তত একজনকে আমি একেবারেই মেনে নিতে পারছি না। ওটা একটা অভিশাপ! লম্বা ওই পাকিস্তানী লোকটার কথা বলছি। এই লোকটাকে আমি ঘৃণা করি...'

মেয়ের চেহারা রাগে গোলাপি হয়ে উঠছে দেখে থেমে গেলেন আরাকানী।

'কার সম্পর্কে কী বলছ তুমি, পাপা?' রাগের লাগাম টেনে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টায় হিসহিস করে উঠল তিসতা। 'তিনি একজন

কর্নেল। কর্নেল আজমল হুদা ইয়াংগনে পাকিস্তান এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট এজেন্সির আবাসিক প্রতিনিধি। ভদ্রলোক আমাদের একজন জেনারেলের ভাতিজিকে বিয়ে করে মায়ানমারের নাগরিকত্ব পাবার চেষ্টা করছেন বলে শোনা যাচ্ছে। এরকম একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব থাকলে তোমার সামাজিক মর্যাদা বরং বাড়বে—অথচ বলছ তাঁকে তুমি ঘৃণা করো!'

'তার সম্পর্কে তুমি আসল কথাটাই জানো না!' বললেন আরাকানী। তারপরই সামলে নিলেন নিজেকে। না, আজমল হুদা যে স্পাই, এটা কোনমতেই তিসতাকে বলা যাবে না। এমনকী নিদানি থুয়ে যে ফ্রি লান্সার ইনফরমার, এটাও তার কাছে গোপন রাখতে হবে। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই যে মেয়ের, বিপজ্জনক তথ্য তার না জানাই ভাল।

'আসল কথা, পাপা? কী সেটা, বলো, শুনি।' সোফা ছেড়ে শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়াল তিসতা।

'না, মানে, তার সম্পর্কে প্রায় কিছুই তো আমরা জানি না...'

'বলো, তুমি জানো না। আমি কিন্তু জানি,' বলল তিসতা। 'অত্যন্ত আধুনিক, অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় একজন মানুষ। তাঁর সান্নিধ্য আমাকে নানাভাবে আনন্দ দেয়।'

'কিন্তু তার বয়সটার কথা ভেবে দেখেছ? অন্তত চল্লিশ তো হবেই।'

'পাপা, তুমি কিন্তু আমার ওপর এক ধরনের অত্যাচার করছ। আমার ইচ্ছে করছে বিদ্রোহ করি। বয়স? কেন, আমার ভাল লাগলে ওই বয়সের কারও সঙ্গে আমি যদি প্রেম করি, তুমি কি বাধা দেবে?'

'শুধু বাধা দেব ভেবে থাকলে ভুল করবে তুমি,' রেগেমেগে বললেন আরাকানী। 'তোমার গায়ে হাত তুলতে বাধ্য হব আমি। ঘরের ভেতর তালা দিয়ে আটকে রাখব।'

হি-হি করে হেসে উঠল তিসতা, বাবার কানে কেমন

অস্বাভাবিক লাগল সেটা। ছুটে এসে বাপের পাশে বসে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরল সে। 'অনেক দেরি করে ফেলেছ, পাপা। সুযোগটা আরও আগে কাজে লাগানো উচিত ছিল তোমার। আমার চোখ খুলে গেছে, এখন আর আমি তোমার শাসন মানব কেন! আমি তোমাকে ভালবাসি, ব্যস, এতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে তোমাকে। আমারটা আমাকেই বুঝতে দাও।'

'শুধু ভালবাসি বললে হবে না। আমাকে তোমার শ্রদ্ধা করতে হবে। আমি তোমার বাবা, তিসতা। তোমার জীবন আমারও জীবন।'

'না, আসলে তা নয়,' মাথা নেড়ে বলল তিসতা, তার কথার সুরে ঠাণ্ডা একটা ভাব ফুটল। বাবার গলা থেকে হাত দুটো নামিয়ে নিল সে, সোফা ছেড়ে চলে যাচ্ছে ড্রইংরুম থেকে।

সিতওয়ে আরাকানীর বুকের গভীর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। নিচু টেবিল থেকে মায়ানমার টাইমসটা তুলে নিয়ে ভিতরের পাতায় চোখ বুলালেন। পত্রিকার পারসোনাল কলামের বিজ্ঞাপনগুলোই শুধু পড়া বাকি আছে তাঁর।

থোন ফালানের বিজ্ঞাপনটা যেন লাফ দিয়ে উঠে এল তাঁর চোখে।

কবর থেকে উঠে হক মাওলা পুরানো বন্ধুদের খুঁজছে।

কয়েক বার পড়লেন আরাকানী। হালকা মেজাজে ভাবলেন, কী ব্যাপার? বন্ধু আমার পরপার থেকে ফিরে এল নাকি?

তারপর আন্দাজ করলেন, কোনও বিপদে পড়ে তাঁর মামাতো বোনই এই বিজ্ঞাপন ছেপেছেন। ধরে নিতে হবে ব্যাপারটা বিপজ্জনক, তা না হলে স্বামীর কোডনেম 'হক মাওলা' ব্যবহার করতেন না তিনি। এই ছদ্মনাম শুধু তিনজন মানুষের জানবার

কথা–বন্ধু হিসাবে তাঁর, স্ত্রী হিসাবে ইরাবতি দিদির ও কনট্যাক্ট হিসাবে রানা এজেন্সির শাখাপ্রধানের।

অর্থাৎ মামাতো বোন ইরাবতি গোপনে হয় তাঁর সঙ্গে, নয়তো রানা এজেন্সির ইয়াংগন শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছেন। কিন্তু কেন?

'যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি আমার নিরাপদ টানেল, প্রিয়তমা,' ফিসফিস করে বলল পাকিস্তানী কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স অফিসার আজমল হুদা। 'তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে তুমি নিজের ভেতর লুকিয়ে রাখো।' তিসতার একটা নগ্ন পা ধরে নিজের গালে ঘষছে সে।

ইয়াংগনের অভিজাত এলাকা। গোল্ডেন প্যাগোডা রোডের এই বিলাসবহুল ফ্ল্যাটটা সম্প্রতি বেনামে ভাড়া নিয়েছে কর্নেল হুদা, মূল উদ্দেশ্য সিতওয়ে আরাকানীর ফুর্তিবাজ মেয়েটিকে ড্রাগসের ফাঁদে ফেলে তার বাপ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা। তার যৌবনপুষ্ট শরীরটাকে যেভাবে খুশি ব্যবহার করাটা আসলে উপরি পাওনা।

অনেকদিন থেকেই সন্দেহ করছে কর্নেল হুদা, সিতওয়ে আরাকানী গোপনে বাংলাদেশ কিংবা ভারতকে এসপিওনাজ সার্ভিস দিচ্ছে।

পিসিআই-এর পুরানো ফাইলও দেখা আছে তার, জানে 'বাঙালী রক্ষা সমিতি'-র প্রধান হিসাবে সন্দেহ করা হত এই ভদ্রলোককে। সুযোগের সন্ধানে ছিল সে, কীভাবে সিতওয়ে সম্পর্কে গোপন তথ্য সংগ্রহ করা যায়। তাঁর মেয়ে তিসতা বিদেশ থেকে ফিরে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন শুরু করেছে শুনে হুদার আনন্দ দেখে কে। 'ও লা লা' নামে এক ইনফরমারের মাধ্যমে তিসতার সঙ্গে পরিচিত হলো সে। তারপর নিজ গুণে তিসতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছে।

ওরা প্রথমবার বিছানায় মিলিত হওয়ার পর পরিস্থিতি বদলে গেল, এবার হুদার পা ধরে কান্নাকাটি শুরু করল তিসতা। 'আই লাভ ইউ, হুদা। প্লিজ, প্লিজ! এবার সুইটা দাও আমাকে!'

'সত্যি আজও তোমার দরকার?' নিরীহ, সরল ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল কর্নেল হুদা।

'হুদা, তুমি বেহুদা দেরি করছ,' বলল তিসতা, কর্নেলের শক্ত একটা পায়ে অনবরত ঠোঁট বুলাচ্ছে সে।

'বেশ।'

আজমল হুদাকে একটা ট্রলির দিকে হেঁটে যেতে দেখছে তিসতা। ওটায় একটা কিট রয়েছে, তাতে সিরিঞ্জ, গজ ও নারকোটিক আছে। ক্লান্ত, অথচ উত্তেজিত লাগছে নিজেকে তিসতার। তার শরীর প্রায় থেঁতলে গেছে, কিন্তু এখনও তৃপ্ত হয়নি। অন্য রকম আনন্দের ক্ষুধা অনুভব করছে সে, অলৌকিক কার্পেটে চড়ে নক্ষত্রমণ্ডলীর উপর দিয়ে উড়ে বেড়াতে ইচ্ছে করছে, যেখানে বেঁচে থাকার প্রতিটি মুহূর্তই চরমপুলক, যেখানে অভিযোগপ্রিয় পাপা নেই, কেউ জিজ্ঞেস করে না তুমি বৌদ্ধ না মুসলমান, বন্ধু নাকি শত্রু...

ড্রাগস নিয়ে ফিরে এল আজমল হুদা। জানালা দিয়ে ঢোকা রোদ লেগে ঝিক করে উঠল তার হাতের সিরিঞ্জ।

'প্লিজ!' সেটা দেখতে পেয়ে মিনতির সুরে গুঙিয়ে উঠল তিসতা।

দ্রুত ইঞ্জেকশনটা পুশ করল কর্নেল হুদা, ভাবছে সিতওয়ে আরাকানী সম্পর্কে কত কিছুই না জানতে চায় সে!

সাত

সিতওয়ে আরাকানী সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন, মামাতো বোন ইরাবতি তাঁর পরামর্শ পেতে চান, তবে প্রকাশ্যে যোগাযোগ করতে চাইছেন না। সেটা নিশ্চয় সিকিউরিটির কথা ভেবেই।

সময় নষ্ট না করে ক্রেডল থেকে টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন তিনি। 'হ্যালো, মায়ানমার টাইমস?'

জবাব এল, 'জী, হ্যাঁ। বলুন আপনার জন্যে কী করতে পারি?'

'আজকের পারসোনাল কলামে একটা বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে, সেটার ব্যাপারে খোঁজ নিতে চাই,' বললেন আরাকানী। 'ওই যে, যেটা হক মাওলার নামে ছাপা হয়েছে।'

'ও, হ্যাঁ, বুঝেছি।'

'এমন হতে পারে যে ওটা হয়তো আমার উদ্দেশেই ছাপা হয়েছে, তবে আপনাদের কাছে কে ওটা নিয়ে এসেছিল তা না জানা পর্যন্ত আমি ঠিক নিশ্চিত হতে পারছি না। তিনি কি আপনাদেরকে কোনও নির্দেশ দিয়ে গেছেন?'

উত্তরে 'না' শোনার জন্য তৈরি থাকলেও, আরাকানীকে অবাক করে দিয়ে অপরপ্রান্ত থেকে লোকটা বলল, 'জী, সার। আমাদেরকে বলা হয়েছে, উত্তর পাঠাবার বা সাড়া দেয়ার ঠিকানা হলো–থোন ফালান, থাই স্টুডেন্টস হোস্টেল, সার্কুলার রোড।' তারপর অকস্মাৎ, গলার আওয়াজে উল্লাস ফুটিয়ে লোকটা আবার বলল, 'তবে দুঃখের বিষয় হলো, সার, আপনি দেরি করে ফেলেছেন। বিজ্ঞাপনটা পড়ে এরইমধ্যে একজন সাড়া দিয়েছেন,

প্রায় এক ঘণ্টা আগে।'

আরাকানীর হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল। থোন ফালান! আর কোনও সন্দেহ নেই যে বিজ্ঞাপনটা তাঁর মামাতো বোন ইরাবতিই ছাপতে দিয়েছেন।

কিন্তু তাঁর আগে কে আবার সাড়া দিল!

'দেখুন,' ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন আরাকানী, 'এটা কোনও প্রতিযোগিতার বিষয় নয় যে প্রথম বা দ্বিতীয় হবার সুযোগ আছে। এখন ব্যাপারটা পরিষ্কার যে বিজ্ঞাপনটা আমার উদ্দেশেই ছাপা হয়েছে। আমাকে দয়া করে বলবেন, যিনি সাড়া দিলেন তিনি কে?'

'এই তথ্যটা, সার, কাউকে দেয়ার ক্ষমতা আমার নেই,' পত্রিকার লোক জানাল। 'তা ছাড়া, বিজ্ঞাপনটা আসলে কার উদ্দেশে ছাপা হয়েছে সেটাও নিশ্চিত করে বোঝার কোনও উপায় নেই আমার।'

'আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, ওটা আমার উদ্দেশেই ছাপা হয়েছে,' রাগের লাগাম টেনে ধরে বললেন আরাকানী। 'কাজেই এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমার বদলে কোন্ সে ব্যক্তি...'

'সমস্ত এনকোয়েরি কনফিডেনশিয়াল, সার। আমাদের পলিসি যতটুকু অনুমোদন করে তার সবই আপনাকে আমি বলেছি।' লোকটার কথার সুরে সকৌতুক ভাব।

'কিন্তু...'

জবাবে অপরপ্রান্ত থেকে যোগাযোগ কেটে দেওয়া হলো।

ধীরে ধীরে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন আরাকানী, কী করা যায় চিন্তা করছেন।

তাঁর জানা আছে থোন ফালান বন্ধুবর কর্নেল আরমান খানের বডিগার্ড ছিল। তিনি মারা যাওয়ার পর তাঁর মামাতো বোন

ইরাবতি দিদির বিশ্বস্ত ম্যানেজার ও রক্ষক হিসাবে কাজ করছে সে।

বেল বাজিয়ে নিজের বিশ্বস্ত বডিগার্ড তথা ম্যানসারভেন্ট মাইদ দেভাই-কে ডাকলেন সিতওয়ে আরাকানী। বিভিন্ন পদে আজ বিশ বছরের বেশি তাঁর কাজ করছে মাইদ দেভাই।

কাছে ডেকে নিচু গলায় তাকে কয়েকটা নির্দেশ দিলেন আরাকানী।

তিসতার সমগ্র অস্তিত্ব উল্লাসের আধারে পরিণত হলো। আজমল হুদার কামরাটা হয়ে উঠল স্বর্গ। পেঁজা তুলোর মত মেঘ ও গাঢ় নীল আকাশের মাঝখানে উড়ে বেড়াচ্ছে সে। যেন তার কোনও শরীর নেই, স্রেফ চেতনাসমৃদ্ধ অশরীরী একটা আত্মা মনে হচ্ছে নিজেকে। কোনও রকম বন্ধন অনুভব করছে না, এই নতুন জগতের কোথাও পাপা নেই, ভ্রূ কোঁচকানো সমাজ নেই, মেনে চলতে হয় না এক কণা নৈতিক দায়-দায়িত্ব। যেন গোটা বিশ্ব তার নীচে রয়েছে, অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও নগণ্য, তার মাথা ঘামানোর কোনও বিষয় নয় সেটা।

'এবার বলো, তিসতা, আমাকে তুমি ভালবাস তো?' তার নিরাবরণ শরীরটাকে আদর করছে হুদা।

'ওহ্, ইয়েস! আই লাভ ইউ।'

'অন্য যে-কোন পুরুষের চেয়ে বেশি? তোমার বাবার চেয়েও বেশি?'

কোথাও যেন একটা ব্যথা লাগল তিসতার। 'পাপা! ওহ্, গড, ইয়েস। পাপা আমার জেলখানা, আমার জেলার। তুমি...তুমি আমার ভালবাসা। পাপা নয়।'

'আমি একটা জিনিস বুঝি না, সুইটহার্ট। তিনি তোমার প্রতি এত অবহেলা দেখান কেন? একমাত্র মেয়ের সঙ্গে কথা বলারও

সময় পান না, সারাক্ষণ একা স্টাডিতে বসে থাকেন, এটা কেমন কথা? কী করেন ওখানে তিনি?'

'আমাকে আবার তুমি ভালবাস, হুদা ডার্লিং,' শিরদাঁড়া ধনুকের মত বাঁকা করে আবদার ধরল তিসতা। 'পাপা? ওখানে বসে কি করে? জানি তো কী করে। বলছি তোমাকে, তার আগে তুমি আমাকে আর একটু ভালবাসো...'

প্রথম সুযোগেই টেলিফোনে ইয়াংগন পুলিশকে 'ফাইভ মার্ডার কেস' সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে রানা, নিজের পরিচয় না দিয়ে। 'আসল খুনিদের' পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছে—ওরা সবাই পিসিআই অপারেটার, নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরে গেছে।

ইয়াংগন পুলিশ যথেষ্ট তৎপর, রানার ফোন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা টহল টিমকে অকুস্থলে পাঠিয়ে দিয়েছে। সাইরেন বাজিয়ে সেখানে যাওয়ার পথে তাদেরকে পাশ কাটিয়েছে পিসিআই-এর জিপ, সেই জিপে বসে থাকা কর্নেল আজমল হুদাকে চিনতেও পেরেছে তারা।

মাস মার্ডার সিন থেকে পুলিশ তাকে ফিরতে দেখলেও, ব্যাপারটাকে কোনও গুরুত্বই দিচ্ছে না কর্নেল হুদা। সে জানে কী ঘটেছে বুঝিয়ে বললে জেনারেল উ নিমুচি তাকে পুলিশী ঝামেলা থেকে ঠিকই রক্ষা করবে।

পুলিশ যাতে কোনও ঝামেলা না করে তার জন্য ভাল একটা অ্যালিবাই তৈরি করে রেখেছে রানা। ইয়াংগনের বাংলাদেশ দূতাবাসকে বলে রেখেছে, পুলিশ প্রশ্ন করলে বলতে হবে সকাল দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত ওখানেই ছিল সে।

যথেষ্ট বেলা হয়ে গেছে, তাই পত্রিকা অফিসে সশরীরে না গিয়ে পাবলিক পে বুদ থেকে টেলিফোন করবার সিদ্ধান্ত নিল রানা। ইতোমধ্যে সাজিদের দেওয়া ওয়ালথারটা ইরাবতি নদীতে

ফেলে দিয়েছে ও ।

টেলিফোনে মায়ানমার টাইমস-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতেই সেখান থেকে বলা হলো, 'থোন ফালান, থাই স্টুডেন্টস হোস্টেল, সার্কুলার রোড—এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে আপনাকে । থ্যাঙ্ক ইউ, সার । গুড ডে ।'

ব্যাপারটা এত সহজ, একটু অস্বাভাবিক লাগল । ফোন নম্বর দেওয়া হয়নি, কাজেই ট্যাক্সি ডেকে রওনা হলো রানা ।

মূল শহরের বাইরে হোস্টেলটা । রাস্তা খারাপ, দু'পাশে নোংরা বস্তি । জানা কথা এদিকে ভুলেও কোনও ট্যুরিস্ট আসে না । ট্যাক্সি থেকে রানাকে নামতে দেখে এক কিশোর এমনভাবে তাকিয়ে থাকল যেন ভাল পোশাক পরা কোনও লোককে আগে কখনও দেখেনি সে ।

হোস্টেলের সামনে দিয়ে দু'তিনবার আসা-যাওয়া করল রানা । আশপাশে এমন কেউ নেই যাকে দেখে স্পাই কিংবা ইনফরমার বলে মনে হতে পারে । তারপরেও কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না ও । দেখল রিসেপশন ডেস্কটা গেটের পাশেই ।

হাতছানি দিয়ে কিশোর ছেলেটাকে ডাকল রানা, তারপর একশো গজ হেঁটে এসে সরু খালের কিনারায় দাঁড়াল । কিশোর ছেলেটা পিছু নিয়ে এল ঠিকই, কিন্তু কাছে ঘেঁষতে ইতস্তত করছে । অভয় দিয়ে হাসল রানা, মানিব্যাগ খুলে টাকা বের করে দেখাল ।

একটা মার্কিন ডলার পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হলো ছেলেটা, কী করতে হবে ভাল করে তাকে বুঝিয়ে দিল রানা ।

আসলে ঠিক এখনই থোন ফালানের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে না ও । আজ তাকে শুধু চিনে রাখবে । তারপর জানতে চেষ্টা করবে বিজ্ঞাপনটা পড়ে আর কে সাড়া দেয় ।

কাজ সেরে একা ফিরে এল ছেলেটা, আশপাশে রানাকে

কোথাও দেখতে না পেয়ে হতভম্ব হয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে।

প্রথমে রানা নিশ্চিত হয়ে নিল ছেলেটাকে কেউ অনুসরণ করে আসেনি, তারপর একটা বাড়ির দোরগোড়া থেকে বেরিয়ে এল। 'তুমি একা যে?' কিশোরকে প্রশ্ন করল ও। 'লোকটা তোমার সঙ্গে আসতে রাজি হলো না বুঝি?'

'না, সার। ব্যাপারটায় একটু প্যাঁচ আছে।' হাসছে ছেলেটা, বিদেশী ট্যুরিস্টের সঙ্গ উপভোগ করছে সে। 'তিনি ওখানে নেই। তবে একটা মেসেজ রেখে গেছেন।'

'তাই? মেসেজ রেখে গেছে... আমার জন্যে?' জানতে চাইল রানা।

'যে খোঁজ নেবে তার জন্যে, সার। মেসেজটা আমি মুখস্থ করে এসেছি।'

'তা হলে বলছ না কেন?' তাগাদা দিল রানা।

'তাকে সে-ই খুঁজে পাবে যে তাকে চেনে, কিংবা সে যাকে চেনে—চালাঙ লামপাঙ বাজারে।'

রানা জানে মায়ানমারে প্রচুর থাই বাস করে, চালাঙ লামপাঙ এলাকায় তাদের সংখ্যা খুব বেশি। তবে থোন ফালানকে চেনে না ও, তারও ওকে চেনবার কথা নয়।

ট্যাক্সি নিয়ে উল্টোদিক থেকে চালাঙ লামপাঙে পৌঁছাল রানা। ড্রাইভারকে বিদায় করে দিয়ে বাজারের ভিতর দিয়ে হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে বিরাট ফ্লাওয়ার মার্কেটে চলে এল, ভাবছে থোন ফালান নামটা ছাড়া আর কোনও সূত্র নেই ওর কাছে।

তারপর মনে পড়ল, থোন ফালান নামটা আসলে থাই। চালাঙ লামপাঙ নামটাও থাই ভাষার একজোড়া শব্দ। বেশ, একটা মিল পাওয়া গেল। কিন্তু তাকে কী?

এক ঘণ্টা পরও দেখা গেল সূত্রটা কোনও কাজে আসছে না। হাল ছেড়ে দিয়ে হোটেলে ফেরার কথা ভাবছে রানা। ফ্লাওয়ার

মার্কেট থেকে বেরুবার সময় একটা খুদে বার চোখে পড়ল।

রোদের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করে তেষ্টা পেয়েছে, ভিতরে ঢুকে জানালার পাশের একটা টেবিলে বসল রানা। ঠাণ্ডা বিয়ারে চুমুক দিচ্ছে, সেই সঙ্গে অলস ভঙ্গিতে চওড়া রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া লোকজনের উপর চোখ বুলাচ্ছে। জেলে, মিস্তি, ফেরিওয়ালা, খদ্দের–প্রায় সবাই থাই, তাদের সবার চেহারাও প্রায় একই রকম লাগছে চোখে।

বিয়ারের গ্লাস খালি হয়ে এসেছে, এই সময় চেনা এক লোককে দেখতে পেল রানা। লোকটা অত্যন্ত মোটা ও খাটো। হনহন করে হাঁটছে, আর অস্থির চোখে নিজের চারপাশে তাকাচ্ছে। কাল সকালেও তাকে দেখেছে রানা। এই লোক ওকে সিতওয়ে আরাকানীর বাড়ির দরজা খুলে দিয়েছে।

তবে ঠিক দারোয়ান নয় সে। কেষ্টা ব্যাটার মত অতি পুরাতন ভৃত্য গোছের কেউ হবে, বাড়ির যাবতীয় দৈনন্দিন ছোটখাট কাজ তাকেই সারতে হয়। দেভাই...? হ্যাঁ, নামটাও মনে পড়ছে। বেশ মজার একটা নাম। কথাটা আসলে অনেক ক্ষেত্রেই ঠিক এক দেশের বুলি, আরেক দেশের গালি। সিতওয়ে আরাকানী তাকে মাইদ দেভাই বলেই ডাকছিলেন।

খানিক ইতস্তত করে লোকটাকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে রানার আগ্রহ বেড়ে গেল। কিছু একটা নড়তে দেখে ওর দৃষ্টি ছুটে গেল রাস্তার ধারের সারি সারি দোকানগুলোর মাঝখানে। ওখানে লম্বা এক লোক কুণ্ডলী ছাড়াচ্ছে, বোঝা গেল উবু হয়ে বসে কারও জন্য অপেক্ষা করছিল সে। লোকটার হাত দুটো অত্যন্ত শক্তিশালী, পেশল। মুখে এত ভাঁজ, দেখতে ঠিক যেন একটা বুলডগ। লোকটা থাই।

লোক দুজন পরস্পরকে খুঁটিয়ে দেখল, তারপর সংক্ষেপে দু'একটা কথা বলল। টেবিল ছেড়ে বার থেকে বেরিয়ে আসছে

রানা, না থেমেই বিল মেটাল কাউন্টারে।

বাজার থেকে বেরিয়ে পাশাপাশি হাঁটা ধরেছে লোক দুজন, বেশ খানিকটা দূর থেকে তাদের পিছু নিল রানা। ও যে অনুসরণ করছে সেটা গোপন করবার কোনও চেষ্টাই করল না, চাইছে ওদের মাধ্যমে সিতওয়ে আরাকানীও জানুন ব্যাপারটা।

ওদের ট্রেইল শেষ হলো সিতওয়ে আরাকানীর বাড়ির গেটে। থোন ফালান ও মাইদ দেভাইকে ভিতরে ঢুকতে দেখে একটা ট্যাক্সি নিয়ে নিজের হোটেলে ফিরে এল রানা। কী বিষয় জানবার জন্য পরে এক সময় আরাকানীর সঙ্গে যোগাযোগ করলেই হবে।

আর যদি খুব জরুরি কিছু হয়, ওর অপেক্ষায় না থেকে তিনি নিজেই যোগাযোগ করবেন।

*

হোটেলের রিসেপশনে একটা মেসেজ পেল রানা। অজ্ঞাতপরিচয় এক মেয়ে ফোন করেছিল ওকে, বলেছে পরে আবার যোগাযোগ করবে।

স্যুইটে ফিরে শাওয়ার সারল। কোমরে শুধু তোয়ালে জড়ানো, বেডরুমে বসে স্কচ হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দেওয়ার সময় টিভি অন করে মায়ানমার টিভির খবর শুনছে। না, ফাইভ মার্ডার সম্পর্কে কিছুই বলা হলো না। শুধু জানানো হলো, শহরের একটা বাগানবাড়িতে আগুন লেগেছে, ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যায়নি। একটু পরেই নক হলো দরজায়।

'হু ইজ ইট, প্লিজ?' জিজ্ঞেস করল রানা, কার্পেটের উপর দিয়ে নিঃশব্দ পায়ে দরজার দিকে এগোল।

খসখসে একটা নারীকণ্ঠ ভেসে এল, 'লেট মি ইন, মাই প্রেসাস। এই মুহূর্তে তুমি ভদ্র অবস্থায় না থাকলেও আমি কিছু মনে করব না।'

তিসতা আরাকানীকে ভাল মত নিঙড়াবার কাজটা এখনও শেষ হয়নি কর্নেল আজমল হুদার। ‘কিন্তু যে লোক চা বেচে তার এরকম আচরণ খুব অদ্ভুতই বলতে হবে,’ বলল সে, ভান করল একটু অবাক হয়েছে।

‘হোয়া–! চা বেচে? মাই লাভ, আমার পাপার বিশাল আকারের পাঁচ-পাঁচটা চা-বাগান আছে, আরও আছে বিরাট সব জুট মিল।’ প্রেমিকের উষ্ণ কাঁধে মুখ গুঁজল তিসতা।

‘তা হলে আমি কনফুসিয়াসের ভূত।’

হেসে উঠল তিসতা। ‘তুমি ভূত নও, মাই সেক্সি লাভ। তুমি আমার রক্ত-মাংস, আমার অস্তিত্ব।’ হুদার নগ্ন বুকে হালকা ঘুসি মারছে। ‘তবে পাপাকে ছোট করে দেখো না, লাভ। মারাত্মক ধনী সে, ভয়ানক প্রভাবশালী। প্রতিবেশী দেশগুলোতেও তার প্রভাব কম নয়, প্রতিটি দূতাবাসে আসা-যাওয়া আছে।’

‘ডার্লিং, তোমার পাপাকে আমার স্পাই বলে সন্দেহ হচ্ছে।’

ভ্রূ উঁচু করে চিন্তিতভাবে হুদার দিকে তাকিয়ে থাকল তিসতা। এরইমধ্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা চোখ দুটোকে একটা আইডিয়া আরও জ্বলজ্বলে করে তুলল। ‘কী জানো, আমারও ঠিক তাই মনে হয়। ওহ্, গড, কী চালাক তুমি! শুধু স্পাই হলে পাপার অনেক কিছু মিলে যায়।’

‘ধ্যাত, তিসতা, তুমি সিরিয়াস নও! স্পাই হবার ঝুঁকি নেবেন, তেমন মানুষই নন তিনি।’

‘পাপা তা হলে বিদেশিদের সঙ্গে এত মিটিং করে কেন? গভীর রাতে রেডিওতেই বা কাদের সঙ্গে কথা বলে? আমাকে নিয়ে চিন্তিত হবার তা হলে এটাই কারণ!’

আধ ঘণ্টা পর অন্ধকারে হাসল পিসিআই কর্মকর্তা। যা জানে তার সবই তিসতার পেট থেকে বের করা যাবে। আরও অনেক তথ্য দরকার তার। যেমন, উ থুইমুইকে খুন করে কোথায় পালাল

শায়লা শারমিন? মেয়েটা কি আসলে তাদের টপ সিক্রেট ডকুমেন্ট-এর কপি সরিয়েছে?

ইন্টারোগেট করবার জন্য শারমিনকে দরকার তার। সে যদি ডকুমেন্টটা কপি করে থাকে, যে-কোনও মূল্যে সেটাকে ফেরত পেতে হবে।

'এবার তোমার ফেরা দরকার, তিসতা,' বলল কর্নেল হুদা। 'আমার জরুরি কিছু কাজ আছে।'

'ফেরা দরকার?' প্রতিবাদ করল তিসতা। 'এত তাড়াতাড়ি? কিন্তু আমার যে আরও চাই।'

'পাবে, তিসতা। আমরা দুজনই যখন আবার রেডি হতে পারব।'

'আমি এখনই রেডি।'

'না, এত বেশি ভাল নয়। এসো, একটা খেলা খেলি। তুমি আমাকে খবর এনে দাও—পাপার কাছে যারা আসে তাদের নাম-ঠিকানা, কী নিয়ে আলাপ করে তারা। ভাবছি তিনি যদি সত্যি স্পাই হন, তাঁর সঙ্গে আমিও কোনও ব্যবসায় জড়ালে অতিরিক্ত কোনও বেনিফিট পাব কি না। এ ব্যাপারে তুমি আমাকে সাহায্য করবে তো, তিসতা, ডার্লিং? বিনিময়ে যা চাইবে তাই পাবে তুমি, যত খুশি।'

'আমি না তোমার দাসী? তুমি শুধু হুকুম করবে।' হুদার উপর চড়াও হলো তিসতা। 'তোমাকে আমি সাহায্য না করলে ভালবাসবে কে আমাকে? সুই দেবে কে?'

'ঝুঁকি নিয়ে, স্বেচ্ছায় ঢুকছ তুমি,' বলল রানা, দরজার চেইন লক খুলে দিল।

'ও লা লা!' খসখসে কণ্ঠে বলল নিদানি থুয়ে। 'এটা তোমার হুমকি, নাকি আমন্ত্রণ?'

মেয়েটির দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে আছে রানা। প্রায় ওর কাছাকাছি লম্বা সে। কাঠামোয় নারীসুলভ সমস্ত বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বার মতই, অথচ এতটুকু অতিরিক্ত চর্বি নেই কোথাও। এমন সুগঠিত দেহসৌষ্ঠব খুব কমই দেখা যায়, সম্ভবত ব্রিটিশ ও জাপানি রক্তের সংমিশ্রণ ঘটায় এরকমটা হয়েছে।

শুধু যে দেখতে পরীর মত তা নয়, অনেক গুণও আছে নিদানির। ভাল নাচ-গান জানে, কথা বলতে পারে কয়েকটা ভাষায়। সমাজের উপর মহলেই তার ওঠাবসা। বিপদের মারাত্মক সব ঝুঁকি নিয়ে নির্বিচারে সবাইকে তথ্য যোগান দেওয়া তার পেশা। ক্রেতা-বিক্রেতার কাছে নিজের পেশা গোপন করে না সে। টাকাটাই তার কাছে বড় কথা।

ফ্রি লান্সার ইনফরমার হিসাবে খুব ভাল করছে নিদানি। তবে শোনা যায় নিজের শরীরের উপর তার নাকি নিয়ন্ত্রণ নেই। রানা ভাবল, এই মিল থাকার কারণেই কি তিসতার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছে?

'জানতে পারি, কি চাই?' দরজা বন্ধ করে প্রশ্ন করল রানা।

'তোমাকে,' উত্তরটা যেন ঠোঁটের কাছে তৈরি রেখেছিল নিদানি। রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলাল সে।

'মুখ সামলে কথা বলো, তা নইলে□গেট আউট,' বলে হাত তুলে দরজাটা দেখিয়ে দিল রানা।

হেসে উঠল নিদানি। 'তিসতা ঠিকই বলেছে, সত্যি তুমি একটা ইন্টারেস্টিং চরিত্র!'

'তোমার এখানে আসার সঙ্গে তিসতার কী সম্পর্ক?'

'বলছি। তার আগে বসতে বলবে না?'

হাত তুলে একটা সোফা দেখিয়ে দিল রানা। 'তাড়াতাড়ি শেষ করবে, কেমন?'

সোফায় বসে পায়ের উপর পা তুলে দিল নিদানি, তার খাটো

স্কার্ট ঊরুর ইঞ্চি পাঁচেক ঢাকতে পারেনি। ‘আমাদের তিসতার পার্টির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তুমি বোধহয় জানো না। শহরের আকর্ষণীয় ও বাছাই করা পুরুষদের ইনভাইট করা হয়, বেশিরভাগই তারা অবিবাহিত। শুক্রবার রাত ন'টায় একচল্লিশ নম্বর পুতাও স্ট্রিটে তোমার জন্যে অপেক্ষা করবে তিসতা। আগেই জানিয়ে রাখি, তিসতার পার্টি মানে... স্কাই ইজ দ্য লিমিট।’

‘বেশ। কথা দিচ্ছি না, তবে চেষ্টা করব যেতে,’ বলল রানা, হাতঘড়ি দেখল ও।

ইঙ্গিতটা ধরতে পেরে সোফা ছাড়ল নিদানি। ‘আমাকে তোমার বেডরুমটা দেখাবে না, মাসুদ রানা?’

‘দুঃখিত, আমার হাতে সময় নেই।’

‘তার মানে কি আ-মা-র কাছ থেকে কোনও ইনফরমেশনই তুমি জানতে চাও না?’ বাঁকা চোখে তাকাল নিদানি, ঠোঁটের কোণে রহস্যময় হাসি।

‘কী ইনফরমেশন?’

‘এই ধরো, শারীরিক আকৃতি, রঙ, কোমলতা, দৈর্ঘ্য, গভীরতা ইত্যাদি।’

‘না, ধন্যবাদ।’

কাঁধ ঝাঁকিয়ে দরজার দিকে এগোল নিদানি, নিতম্বে ঢেউ উঠছে। ‘যাবার আগে অন্য একটা প্রসঙ্গ,’ দরজার কাছে পৌঁছে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল সে। ‘শায়লা শারমিন নামে একটা মেয়ে কোথায় আছে, কী করছে ইত্যাদি জেনে দেয়ার অনুরোধ করা হয়েছে আমাকে। তার খোঁজ দিতে পারলে ওই পার্টি আমাকে পঁচিশ হাজার ব্রিটিশ পাউন্ড দেবে। তথ্যটা পাবার বিনিময়ে দশ হাজার পাউন্ড ছাড়তে রাজি আছি আমি।’

‘কে সে?’ রানা যেন কিছু জানে না।

'একট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের টেকনিকাল অফিসার। কমপিউটার সেকশনের হেড,' বলল নিদানি।

'কে তার খোঁজ করছে?'

হাসল নিদানি। 'নামটা জানতে হলে... না, টাকা নয়, তোমার বেডরুমে আধ ঘণ্টা সময় দিতে হবে আমাকে।' এটা তার ভণিতা, সে জানে নামটা আন্দাজ করতে রানার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।

রানার জবাব নেতিবাচক হতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে আবার নিদানি তাড়াতাড়ি বলল, 'ভদ্রলোক তিসতার পার্টিতে আসতে পারেন। তাঁর সঙ্গে আমি তোমার পরিচয় করিয়ে দিতে পারি।'

'ঠিক আছে, ব্যাপারটা আমি ভেবে দেখব,' বলে নিদানিকে বিদায় করে দিল রানা। তারপর ভাবল, তিসতার পার্টিতে যদি যায় ও, সাজিদের কাছ থেকে আরেকটা পিস্তল চেয়ে নিতে হবে। কর্নেল হুদার সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার পর কী ঘটবে বলা কঠিন।

তবে শারমিনের বাড়িতে দেখে হুদা ওকে চিনতে পেরেছে কি না সন্দেহ আছে রানার। অনেকটা দূর থেকে মাত্র দু'এক সেকেন্ডের জন্য ওকে দেখেছে সে।

রুপোর বাক্স থেকে আরেকটা বার্মিজ চুরুট বাছাই করলেন সিতওয়ে আরাকানী। 'তোমাদেরকে যে ভদ্রলোক অনুসরণ করছিলেন,' থোন ফালানকে বললেন তিনি, 'তাঁকে আমি চিনি। অনুসরণ করা হচ্ছে, তা তিনি তোমাদেরকে বুঝতে দিয়েছিলেন। চিন্তার কিছু নেই, তিনি আমার বন্ধু।'

মাথা নুইয়ে সাড়া দিল থোন ফালান।

'পেন ড্রাইভটা যত গুরুত্বপূর্ণই হোক, উপযুক্ত কারও হাতে তুলে দেয়ার ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত ইরাবতি দিদির কাছেই থাকুক সেটা,' বললেন আরাকানী। 'ফুলপ্রুফ একটা প্ল্যান তৈরি করতে

কিছুটা সময় লাগবে আমাদের। ওটা ফিরে পাবার জন্যে পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স চেষ্টার কোনও ত্রুটি করবে না।'

আবার মাথা নোয়াল ফালান। 'এর মানে আমাকে এখন ম্যাডামের কাছে ফিরে যেতে হবে। আমি আমার রক্তের কসম খেয়েছি, নিজের জীবন দিয়ে হলেও তাঁকে রক্ষা করব।'

অস্বস্তি বোধ করছেন আরাকানী। তাঁর চুরুট এখনও ধরানো হয়নি। 'আমি দুঃখিত, ফালান। তোমার কিংবা ইরাবতি দিদির ঠিক বোঝার কথা নয় যে কীসের সঙ্গে তোমরা জড়িয়েছ। তোমরা বিপদে পড়ো, এরকম কিছু করা যাবে না। সব কিছুর জন্যে প্ল্যান দরকার। তুমি কয়েকটা দিন ইরাবতি দিদির কাছে ফিরতে পারবে না।'

ম্যাডাম একা আছে, এই যুক্তি দেখিয়ে তাঁর প্রস্তাবে রাজি হতে চাইল না থোন ফালান। তবে সময় একটু বেশি লাগলেও অবশেষে তাকে বোঝাতে পারলেন আরাকানী।

মাইদ দেভাইয়ের সঙ্গে সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে চলে গেল ফালান, এতক্ষণে চুরুটটা ধরিয়ে টেলিফোনে রানার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন আরাকানী।

দুপুর পার করে বাড়ি ফিরল তিসতা। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু প্রাইভেট লিভিং রুমে দাঁড়িয়ে বারবার বেল বাজালেও মাইদ দেভাই সাড়া দিল না। রাগে গজগজ করতে লাগল সে, পাথরের মত ভারী পা টেনে বিশাল কিচেনে এসে ঢুকল। যেখানে থাকবার কথা, সেই সার্ভিস প্যান্ট্রিতেও দেভাইকে দেখা গেল না। দুটো রিফ্রিজারেটারের মধ্যে থেকে ছোটটা খুলে ঠাণ্ডা পানীয় বের করছে সে, এই সময় শুনতে পেল সার্ভিস প্যাসেজ থেকে কারও দ্রুত পায়ের আওয়াজ ভেসে আসছে।

'ওহ্, দেভাই!' রাগে চেঁচিয়ে উঠল তিসতা। 'ডাকলে

তোমাকে পাওয়া যায় না কেন?'

কারও আঁতকাবার মত আওয়াজ শুনতে পেল তিসতা। ঝট্ করে দরজার দিকে ঘুরল সে। কিচেনের বাইরে দেভাই একা নয়, তার সঙ্গে লম্বা-চওড়া ও স্বাস্থ্যবান একজন অচেনা লোকও রয়েছে। বেশভূষা দেখে মনে হলো একেবারেই চাষাভুষো।

'অত্যন্ত দুঃখিত, দিদিমণি,' বলল দেভাই। 'আপনি যে বাড়ি ফিরেছেন আমার জানা ছিল না। আপনার কি কিছু লাগবে...?'

'লাগত,' ধমকের সুরে বলল তিসতা। নিজের এই মেজাজ ভাল লাগছে না তার, তবে নিয়ন্ত্রণ করবার শক্তিও নেই। 'এখন আর লাগবে না। অনেক ডেকেও পাইনি তোমাকে।' ঠিক চিনতে পারছে না বটে, কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে চাষা লোকটাকে আগেও কোথাও দেখেছে সে। 'তোমার সঙ্গে এই লোক কে? কী চায় সে?'

'আমাদের নতুন মালী, দিদিমণি। এবার ক্ষমা করুন আমাদের।' মাথা নোয়াল দেভাই।

'না, দাঁড়াও! ওকে আমার চেনা চেনা লাগছে কেন?' ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল তিসতা।

'হয়তো খুব ছোটবেলায় দেখেছেন। গ্রামের ওদিকে তো পনের বছর হলো যাওয়া হয় না,' বলল দেভাই। আবার মাথা নোয়াল সে। 'আমি ওকে ওর কোয়ার্টার দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি। ফিরে এসে আপনার যা লাগবে...'

'বললাম না আমার আর কিছু লাগবে না।'

সশব্দে ফ্রিজের দরজাটা বন্ধ করল তিসতা। নতুন মালী! ইস্, কিছু মানুষ কী দুঃস্থ অবস্থায়ও সন্তুষ্ট থাকে। লোকটাকে অনায়াসে ওরিয়েন্টাল হারকিউলিস বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। হঠাৎ তার চিন্তাধারা দ্রুত একটা বাঁক নিল।

মালী? পাপার স্টাডির ওদিক থেকে হেঁটে আসবে? সিতওয়ে

আরাকানী তো কখনও চাকর-বাকরের ইন্টারভিউ নেবে না!

তিসতার ঠোঁটের কোণে তৃপ্তিমাখা হাসি ফুটল।

'বাড়ি থেকে ফোন করে মারাত্মক ভুল করেছ তুমি!' রাগে কর্কশ শোনাল কর্নেল আজমল হুদার গলার আওয়াজ। 'কী করে জানলে আড়ি পেতে কেউ শুনছে না?'

'কে কোথায় কী করছে এ-সব জেনেই ফোন করছি,' ঠাণ্ডা সুরে বলল তিসতা। 'এরকম বুদ্ধি খাটানোর জন্যে আমার প্রশংসা করো তুমি, হুদা। তবে এই লোক সম্পর্কে তোমার যদি কোনও আগ্রহ না থাকে তা হলে আলাদা কথা...'

'আরে, কী বলো, আগ্রহ নেই মানে! আমি শুধু বলতে চাইছি তোমার আরও সাবধান হওয়া উচিত। যতটা না আমার জন্যে, তারচেয়ে তোমার নিজের জন্যে। কে এই লোক? কোত্থেকে এসেছে?'

'এখনও সব কথা জানি না। মাইদ দেভাই কিছুই পরিষ্কার করেনি। তোমার সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে কখন, লা-ভা-র ব-য়?' সুর করে জানতে চাইল তিসতা।

'আমরা দুজন কী খেলাটা খেলছি মনে আছে তো, আমার বসরাই গোলাপ? আমার জন্যে কিছু তথ্য নিয়ে এসো, তার বদলে আমি তোমাকে দেব—বেহেশতের স্বাদ। এখন পর্যন্ত তুমি তো তেমন কিছুই আমাকে জানাতে পারনি।'

'কিন্তু কীভাবে আমি...'

'চেষ্টা করো, তিসতা। নিশ্চয়ই একটা উপায় পেয়ে যাবে। লক্ষ্মীটি, তোমার ওপর আমি নির্ভর করছি। ঠিক তুমি যেমন আমার ওপর নির্ভর করো,' কর্নেল হুদার কণ্ঠস্বর খুবই নরম। 'কিছু যদি জানতে পার, তোমার পার্টিতে গিয়ে শুনব।'

'অত পরে?' হতাশায় কাহিল হয়ে পড়ল তিসতা।

নরম সুরে হাসল হুদা। 'অতই পরে। তোমাকে ছাড়াই পার্টি থেকে বেরিয়ে আসব আমি, আমাকে যদি সত্যি তোমার কিছু বলার না থাকে। গুড নাইট, তিসতা ডার্লিং।'

রিসিভার রেখে দেওয়ার আওয়াজটা নির্মম লাগল তিসতার কানে। বদমাশ, বদমাশ, বদমাশ!

তবে কর্নেল হুদার ওখানে যেতে হবে তাকে। খুব তাড়াতাড়ি। যেভাবেই হোক, হুদা যা চাইছে দিতে হবে। তা না হলে সে যা চাইছে, হুদা তাকে দেবে না।

আট

লেমিয়েথনা।

আজও টেরেসে বসে রোদ পোহাচ্ছেন ম্যাডাম ইরাবতি। তবে এটা তাঁর নিজের নয়, একমাত্র বোন মায়াবতী গাইন-এর বাড়ি। স্বামী হুয়ে গাইন-কে নিয়ে আমেরিকায় ছেলেমেয়ের কাছে বেড়াতে গেছে সে। থোন ফালান তাঁকে ইয়াংগন থেকে শারমিনের বেল্টটা নিয়ে এসে দেওয়ার পর নিরাপত্তার কথা ভেবে বোনের এই খালি বাড়িতে এসে উঠেছেন তিনি।

থোন ফালানের কথাই ভাবছেন বৃদ্ধা। একের পর এক প্রশ্ন

জাগছে তাঁর মনে। দ্বিতীয়বার সে নিরাপদে ইয়াংগনে পৌঁছাতে পেরেছে তো? বিজ্ঞাপনটা ঠিকমত ছাপা হয়েছে মায়ানমার টাইমসে? সাড়া দিয়েছে কেউ? যদি দিয়ে থাকে, কে দিল...রানা এজেন্সির শাখাপ্রধান, নাকি তার ফুফাতে ভাই দায়েম সিতওয়ে?

অপেক্ষার সময়টা কাটতে চাইছে না। ফালানের এত দেরি করবার কথা নয়। কে জানে তার কোনও বিপদ হলো কি না।

টেরেসটাকে ঘিরে থাকা গাছগুলো দুলে উঠল বাতাসে। অজানা একটা আশঙ্কায় শিরশির করে উঠল বৃদ্ধার শরীর।

উদ্বেগ ও অস্থিরতা দূর করবার জন্য টেরেস থেকে বাড়ির অন্দরমহলে চলে এলেন ইরাবতি। ঠাণ্ডা পানি ভর্তি বাথটাবে বেশ কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলেন। তারপর সুতি কাপড়ের ঢোলা একটা ড্রেস পরে নেট দিয়ে ঘেরা টেরেসে এসে বসলেন আবার। মুখ তুলতেই দেখতে পেলেন আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। বাড়ির দারোয়ান কমলার রস দিয়ে গেল তাঁকে। গ্লাসটা শেষ করে এনেছেন, এই সময় দূর থেকে ভেসে আসা ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনে স্থির হয়ে গেলেন ইরাবতি।

ফালান ফিরে আসছে? না, ফালান নয়; সে গাড়ি করে আসবে না। শব্দটা দ্রুত কাছে চলে আসছে। তারপর দেখতে পেলেন ইরাবতি। নিজের নীল মার্সিডিজ চিনতে পারলেন তিনি।

যতটা না লম্বা, তার তুলনায় চওড়ায় বেশি। শরীরের মধ্যভাগে মাত্রারিতিক্ত স্নেহ জমার কারণে তাকে পেটমোটা বলা হয়। দেখতে যাই হোক, দানবীয় শক্তির অধিকারী। বদমেজাজী বলে কুখ্যাতি আছে। সংক্ষেপে এই হলো আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসক জেনারেল উ নিমুচি।

আজ সকালে তার মেজাজ উত্তেজিত আগ্নেয়গিরি হয়ে আছে। প্রচণ্ড ক্রোধে চকচক করছে খুদে চোখ দুটো। কারণ

হলো, পিসিআই কর্মকর্তা, তার পার্টনার, কর্নেল আজমল হুদা মর্মান্তিক একটা দুঃসংবাদ পাঠিয়েছে। একটা নয়, আসলে দুটো দুঃসংবাদ।

প্রথমটা হলো জেনারেল উ নিমুচির ভাইপো উ থুইমুই কদিন আগে খুন হয়েছে। তাকে খুন করেছে পিসিআই কমপিউটার সেকশনের হেড শায়লা শারমিন। খুন করে পালিয়ে গেছে সে।

শুধু দুঃসংবাদ নয়, গাড়ি করে ভাইপোর লাশটাও আজ তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে কর্নেল আজমল হুদা।

সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়ে বেকার সময় কাটাচ্ছিল থুইমুই, জেনারেল নিমুচির সুপারিশে মাস কয়েক আগে তাকে নিজের বডিগার্ড বানায় আজমল হুদা। নিমুচি আসলে পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সে নিজের একজন লোককে রোপণ করেছে। কর্নেল হুদাও জানত যে থুইমুইকে পিসিআই-এ ঢোকানো হয়েছে তার উপর নজর রাখবার জন্যই, কিন্তু আপত্তি করেনি।

হঠাৎ সেই ভাইপোর মৃত্যু সংবাদ শুনে শোকের চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে ক্রোধ, বিশেষ করে এই কারণে যে আজমল হুদা তাকে আরও জানিয়েছে শায়লা শারমিন মেয়েটা লেমিয়েথনার ম্যাডাম ইরাবতির শ্বশুরকুলের আত্মীয় হয়।

কর্নেল হুদা বলছে, ওই মেয়ের চাচা বাংলাদেশী ছিল। হুদার সিকিউরিটি সেফ খুলে তাদের গোপন ডকুমেন্টে চোখ বুলাবার সময় গোপন ক্যামেরায় তার ফটো উঠেছে, তা না হলে মেয়েটা ধরা পড়ত না। ধারণা করা হচ্ছে শুধু চোখ বুলায়নি, ডকুমেন্টটা কপিও করেছে সে।

নির্যাতন চালিয়ে মুখ খোলাবার চেষ্টা হচ্ছিল শারমিনের, এক পর্যায়ে তার ছোঁড়া বুলেটে মৃত্যু হয়েছে থুইমুইয়ের। এরপর থেকে তার কিংবা কপি করা ডকুমেন্টের কোনও হদিস পাওয়া যাচ্ছে না।

হুদা পরিষ্কার করে কিছু বলেনি, তবে জেনারেল সন্দেহ করছে থুইমুইকে খুন করে লেমিয়েথনার দিকেই যাবে শারমিন। ওখানে তার চাচী ইরাবতি আছে, সেই বুড়িই তার নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করবে। ডকুমেন্টটাও লুকিয়ে রাখবে, সুযোগ মত বাংলাদেশি কোনও কর্মকর্তার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য।

ব্যস, তা হলেই সব শেষ! কাজ শুরুর আগেই তাদের কোম্পানি 'মিউচুয়াল ভেঞ্চার' লালবাতি জ্বালবে। মাটির বুকে নিজেদের জন্য স্বর্গ বানাবার প্ল্যানটা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যাবে তাদের।

একটু বেলা হতে আরেকটা মারাত্মক খবর দিয়েছে তার পার্টনার কর্নেল হুদা। পলাতক শায়লা শারমিনের বাড়িতে আজ খুন হয়েছে পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর পাঁচ-পাঁচজন অপারেটর। খুনি হিসেবে সন্দেহ করা হচ্ছে বিসিআই-এর একজন দুর্ধর্ষ এজেন্ট মাসুদ রানাকে। পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স হেডকোয়ার্টার ইসলামাবাদ থেকে মাসুদ রানার ফটো আনাচ্ছে সে, ওটা পৌঁছালে তার খোঁজে অপারেটরদের মাঠে নামানো হবে। এ-ব্যাপারে তার□জেনারেল উ নিমুচির□সাহায্যও লাগতে পারে কর্নেল হুদার।

তবে অজ্ঞাতনামা কারও ফোন পেয়ে পুলিশ সন্দেহ করছে লাশ পড়েছে পিসিআই অপারেটাররা নিজেদের মধ্যে মারামারি করায়। অকুস্থল থেকে কর্নেলকে ফিরতেও দেখেছে তারা।

পার্টনার হুদা অনুরোধ করেছে, জেনারেল যেন পুলিশকে বলে দেন যে পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স অফিসারদের বিরক্ত করা যাবে না।

উ নিমুচির জন্য সেটা কোনও ব্যাপার নয়। পুলিশ তার কথায় ওঠে-বসে।

তবে চিন্তার বিষয় হলো মিউচুয়াল ভেঞ্চার-এর ভবিষ্যৎ। না,

প্রাণ থাকতে এই কোম্পানির ক্ষতি হতে দেবে না জেনারেল নিমুচি। ওই বুড়িকে ধরা হবে। একটা একটা করে তার হাড় ভাঙা হবে। শালী বাপ বাপ করে শারমিনকে তাদের হাতে তুলে দেবে, ডকুমেন্টটাও বের করে দেবে সুড়সুড় করে।

জেনারেল উ নিমুচির অফিসটা হেনযাদা ক্যান্টনমেন্টে। এখান থেকে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে লেমিয়েথনা। সার্জেন্টকে ডেকে মার্সিডিজটা বের করতে বলল সে।

পঁচিশ মিনিট পর ইরাবতির বিশাল খামারবাড়ির সামনে থামল মার্সিডিজ। দূর থেকে দেখে খালি মনে হলো বাড়িটাকে। ভিতর থেকে এক বার্মিজ চাকর বেরিয়ে এসে জানাল, তার ম্যাডাম বাড়িতে নেই, কোথায় গেছেন বলে যাননি।

জেনারেলের নির্দেশে গোটা কয়েক চড়-থাপ্পড় মারা হলো লোকটাকে, ভয় দেখানো হলো গুলি করবার। করজোড়ে মাফ চেয়ে নিয়ে লোকটা হাত তুলে দেখিয়ে দিল, বলল, 'ওদিকে ম্যাডামের বোনের বাড়ি, পাশের গ্রামে, ওখানে হয়তো গেছেন তিনি।'

তিন মিনিট পর মায়াবতী গাইনের খামারবাড়ির সামনে এসে আবার থামল মার্সিডিজ।

এখানেও একজন বার্মিজ চাকরকে এগিয়ে আসতে দেখে উ নিমুচি ভাবল, কী ব্যাপার, দু'জায়গার কোথাও থোন ফালানকে দেখা যাচ্ছে না কেন?

উ নিমুচিকে টেরেসে অভ্যর্থনা জানালেন ম্যাডাম ইরাবতি। জেনারেলের চোখে অদ্ভুত একটা আলো দেখতে পেলেন বৃদ্ধা, আগে কখনো এরকম দেখেছেন বলে মনে পড়ল না।

'আপনার মেহমান শারমিন কোথায়?' অকস্মাৎ জানতে চাইল জেনারেল।

ইরাবতির সারা শরীরে ভয়ের একটা অনুভূতি হলো, তারপর

সেটা বুকের মাঝখানে জমা হয়ে ব্যথা ছড়াতে লাগল। 'আপনি কি বোধবুদ্ধি ও ভব্যতা বোধ, দুটোই হারিয়েছেন, জেনারেল? একজন ভদ্রমহিলার কাছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করে চলে আসতে আপনার বাধল না?' বুকের ব্যথাটা বাড়তে শুরু করায় শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হচ্ছে। তাঁর এই অবস্থা টের পেয়ে গেলে কারণটাও বুঝে নেবে চতুর জেনারেল।

তবে এখনও কিছু ধরতে পারছে না উ নিমুচি। কঠিন সুরে সে বলল, 'আপনি কর্কশ ব্যবহার করছেন, ম্যাডাম ইরাবতি। ভুলে যাচ্ছেন আপনার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সামরিক জান্তার একজন আঞ্চলিক প্রশাসক। আপনি কি অস্বীকার করছেন, শায়লা শারমিন এখানে আসেনি? আমার কাছে তথ্য আছে, এদিকে তাকে আসতে দেখা গেছে।'

ইরাবতি ভাবলেন, মিথ্যেকথা বলছে জেনারেল। শারমিনকে এদিকে আসতে দেখে থাকলে তিনদিন পর কেন জেরা করতে এসেছে? 'আপনার প্রশ্নটাই উদ্ভট। শারমিন আমার স্বামীর ভাতিজি। আমার সমস্ত সয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী সে। অথচ আপনি তাকে মেহমান বলছেন। বোকার মত জিজ্ঞেস করছেন সে তার চাচীর কাছে এসেছে কি না। আমি হতভম্ব...' হঠাৎ আঁতকে ওঠার ভান করলেন তিনি। 'ওহ্, গড! জেনারেল, কোনও খারাপ খবর নয় তো? আমার শারমিন ভাল আছে?'

'কেন যেন মনে হচ্ছে সব আপনি জানেন, ম্যাডাম ইরাবতি,' ঠাণ্ডা সুরে বলল জেনারেল নিমুচি। 'সত্যি যদি সব জেনেও ভান করেন কিছু জানেন না, আপনার জন্যে তার পরিণতি একটুও ভাল হবে না। শেষবার জিজ্ঞেস করছি, শারমিনকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন?'

চোখে-মুখে হতচকিত ভাব ফুটিয়ে তুলে পাল্টা প্রশ্ন করলেন ইরাবতি, 'লুকিয়ে রেখেছি? কিন্তু কেন? আমাদের ভাতিজি কী

করেছে যে তাকে লুকিয়ে রাখার দরকার হবে? আমি তো আপনার কোনও কথাই বুঝতে পারছি না।'

'আমার ধারণা আপনি সবই জানেন, সবই বুঝতে পারছেন; তবু নিয়ম রক্ষার জন্যে বলছি কী ঘটেছে।' ইয়াংগনের পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স অফিসে কী হয়েছে সংক্ষেপে তার ব্যাখ্যা দিল জেনারেল।

অভিনয় নয়, শারমিনের উপর টরচার করা হয়েছে শুনে বৃদ্ধার চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠল।

'আমার ধারণা আপনি আরও জানেন যে,' কর্কশ গলায় বলল জেনারেল, 'আজ সকালে শারমিনের বাড়িতে পাঁচজন পাকিস্তানী খুন হয়েছে, এবং খুনি আপনার পরিচিত□শারমিনই তাকে খুন করতে পাঠিয়েছিল।'

'এ আপনি কী বলছেন!'

'ন্যাকামি বাদ দিয়ে আমার প্রশ্নের জবাব দিন, কোথায় ও?' কর্কশ সুরে আবার জিজ্ঞেস করল নিমুচি।

'আমার কাছে আসেনি ও,' চোখ মুছে বললেন ইরাবতি।

'আপনি মিথ্যেকথা বলছেন!' হঠাৎ গর্জে উঠল জেনারেল। 'ভাল চান তো বের করে দিন তাকে, ডকুমেন্টটাও আমার হাতে তুলে দিন, তা না হলে আপনাকে আমি অ্যারেস্ট করতে বাধ্য হব।'

'এটা ভদ্রলোকের বাড়ি, গলা চড়িয়ে কথা বলবেন না,' ঠাণ্ডা সুরে রীতিমত ধমক দিলেন ইরাবতি। 'আপনার স্পর্ধা দেখে আমি হতভম্ব হয়ে যাচ্ছি। কোন্ সাহসে আপনি আমাকে মিথ্যেবাদী বললেন! যান, ইচ্ছে হলে এখনই আমার খামারবাড়ি সার্চ করুন। খুঁজে বের করুন কোথায় তাকে আমি লুকিয়ে রেখেছি।'

কথাগুলো এত জোরের সঙ্গে বললেন ইরাবতি, মেজাজের লাগাম টেনে ধরতে বাধ্য হলো জেনারেল। সেই সঙ্গে কৌশলও

পরিবর্তন করল। 'বেশ, তা হলে থোন ফালানকে ডাকুন একবার। তার সঙ্গে কথা আছে। আপনি বলছেন দেখেননি, সে হয়তো দেখেছে। তাকে ডেকে পাঠান।'

বুকের ব্যথাটা আবার বেড়ে গেল, উত্তর দিতে দু'সেকেন্ড দেরি করে ফেললেন বৃদ্ধা। 'লেমিয়েথনায় নেই সে। আপনারা যেহেতু এলাকা ছেড়ে কোথাও যেতে দেন না আমাকে, ফালানকে দিয়েই বাইরের কাজগুলো সারতে বাধ্য হই আমি।'

'বাইরে মানে? কোথায় গেছে সে?' ভ্রূ কুঁচকে জানতে চাইল জেনারেল।

'সাংসারিক কিছু জিনিস কিনতে হেনযাদায় গেছে।'

উ নিমুচির ছোট চোখ দুটো সরু হলো। 'হেনযাদায়? আপনি ভুল করছেন না তো, ইয়াংগনে পাঠিয়ে বলছেন হেনযাদায় পাঠিয়েছেন?'

'আপনি আবার আমাকে মিথ্যুক বলছেন। আপনার সঙ্গে কথা বলতে সত্যি আমার রুচিতে বাধছে।'

'আমি তা হলে লোক পাঠাচ্ছি হেনযাদায়,' বলল জেনারেল। 'ফালানকে খুঁজে নিয়ে আসুক সে।'

'তার কোনও প্রয়োজন নেই। আপনার লোক ওখানে পৌঁছাবার আগেই ফিরতি পথ ধরবে ফালান।'

'ও, আচ্ছা। কখন তাকে আশা করছেন আপনি?'

হাত নেড়ে অনিশ্চিত একটা ভাব প্রকাশ করলেন ইরাবতি। 'ঠিক নেই, কাল কিংবা পরশু। দেখতেই তো পাচ্ছেন, আকাশের অবস্থা ভাল নয়।'

'আচ্ছা।' জেনারেলের চোখে বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টি, ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি। 'তা হলে তার সঙ্গে কথা বলার জন্যে কাল আবার আমি আসছি। দেখা না হলে পরশুও। কিন্তু, ম্যাডাম, তারপরও যদি সে ফিরে না আসে, তখন আপনার সঙ্গে তালা দেয়া বন্ধ

ঘরের ভেতর কথা বলতে হবে আমাকে। সেখানে কী হবে আমি জানি না; তবে যাই হোক, এটুকু বলতে পারি যে আপনার আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করবে না।'

'আপনার হুমকি আমাকে ভয় দেখাতে পারছে না,' ঠাণ্ডা সুরে বললেন ইরাবতি। 'তবে আবারও বলছি, বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে আসবেন না। আজকাল এটাকে অসভ্যতা বলা হয়।'

কেতা-দুরস্ত ভঙ্গিতে ইরাবতির সামনে মাথা নোয়াল জেনারেল উ নিমুচি। 'হাতে ক্ষমতা থাকলে সভ্যতার সংজ্ঞা তো আমরাই দিই, আপনি জানেন না? কাজেই অসভ্যতাকেও সভ্যতা বলে চালিয়ে দিতে পারব আমি। আপনাকে আমি জানিয়ে যাচ্ছি, রাত কিংবা দিনের যে-কোনও সময় বিনা নোটিসে চলে আসব। তারপর, প্রয়োজন হলে আপনার চুল ধরে হিড়হিড় করে ত্রিশ কিলোমিটার হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।'

টেরেস থেকে নেমে মার্সিডিজে চড়ল জেনারেল। সেদিকে তাকিয়ে ইরাবতি ভাবছেন, আসলে কতটুকু জানে সে?

সন্দেহ নেই, আবার ফিরে আসবে লোকটা।

মাইদ দেভাই তো থ। তার দিদিমণি তিসতা সাংসারিক ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছে। বলছে পার্টির জন্য বাগানের ফুল যথেষ্ট নয়, জানালার পরদা বদলাও ইত্যাদি। তার হাতে লম্বা একটা ফর্দ ধরিয়ে দিয়ে বলেছে, এগুলো নিয়ে এসো।

খুশি মনেই ফর্দ নিয়ে বাজারে ছুটল দেভাই।

আপদ বিদায় করে দিয়েছি, ভাবল তিসতা। ডাইনিং রুমে বসে মুচকি মুচকি হাসছে সে। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর বাড়ির বাকি সব চাকরবাকরকে এটা-সেটা কাজ দিয়ে সরিয়ে দিল অন্যদিকে, তারপর পা টিপে এসে দাঁড়াল পাপার স্টাডি রুমের কাছে। মাত্র কয়েক মিনিট আগে এখানে সেই বডিবিল্ডার

মালীটাকে ঢুকতে দেখেছে সে।

কান পাততেই চাষাভুষো লোকটার গলা শুনতে পেল তিসতা।

'না! আপনার কোনও যুক্তিই আমি মানতে পারছি না। কে মাসুদ রানা, কেন পাঁচজন পাকিস্তানী খুন হলো, এ-সব আমি শুনতে চাই না। আমি আমার ম্যাডামের কাছে ফিরে যাব। কয়েক দিন হয়ে গেল একা রয়েছেন তিনি।'

'এই, এত জোরে নয়, থোন ফালান! আর মাত্র এক কি দুদিন, তারপরই তোমাকে ছেড়ে দেব। শারমিন যে জিনিসের জন্যে মারা গেছে সেটা যার পাওনা তার হাতে তুলে দিতে হলে নিখুঁত একটা প্ল্যান দরকার। এখন পরিস্থিতি এতই সিরিয়াস যে তুমি বেরুলেই বিভিন্ন এজেন্সির এজেন্টরা তোমার পিছু নিয়ে লেমিয়েথনায় পৌঁছে যাবে। তুমি কি সেটাই চাও?'

তিসতা ভাবল, আচ্ছা, লোকটার নাম তা হলে থোন ফালান। সে লেমিয়েথনার কোনও ম্যাডামের কাছ থেকে এসেছে।

'ম্যাডামকে সাহায্য করার ইচ্ছে থাকলে আপনি আমার সঙ্গে লেমিয়েথনায় যাচ্ছেন না কেন?' অসন্তুষ্ট সুরে জানতে চাইল থোন ফালান।

'কারণ আমাকেও কারও নির্দেশ মত চলতে হয়, বুঝলে...' এরপর পাপার কণ্ঠস্বর এত নিচু হয়ে গেল যে প্রায় কিছুই শুনতে পাচ্ছে না তিসতা। শুধু ছাড়া ছাড়া ভাবে কয়েকটা শব্দ কানে এল: ...উনি যাবেন তোমার সঙ্গে... বেল্ট... ডকুমেন্ট... আগামীকাল অবশ্যই আসবেন তিনি...

তিসতার বুকটা ধকধক করছে, ভাবছে পাপা বেরিয়ে এসে এভাবে তাকে আড়ি পাততে দেখলে কী ভাববে। নাহ্, এখন সরে যাওয়া উচিত, আর কিছু শোনার দরকার নেই।

আজমল হুদা। সে কি খুশি হবে? নাকি আরও কিছু শোনেনি

বলে রাগ করবে? নাহ্! এ-সব তথ্য পেলে নিশ্চয়ই আমার চাহিদা মেটাবে সে।

পরদিন। শুক্রবার।

প্রায় পুরো একটা বেলা এয়ার কমোডর হুনান হো-র সঙ্গে ইয়াংগনের দক্ষিণে একটা বিমান ঘাঁটিতে কাটাল রানা। ওর পুরানো চিনা বন্ধু হো অনেকদিন পর দেখা। রানা আসছে জেনে হাতে কোনও জরুরি কাজ রাখেনি সে, ফলে চুটিয়ে আড্ডা মারল দুই বন্ধু। হো আসলে চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের একজন কর্মকর্তাও বটে, লিউ ফুচুঙের কলিগ।

বার্মিজ বিমানবাহিনীকে বিশেষ ট্রেনিং দিচ্ছে লালচিনের এয়ারফোর্স, সেইসূত্রে হো-র নেতৃত্বে ওদের প্রায় চারশো অফিসার, ন্যাভিগেটর, ইঞ্জিনিয়ার মাস কয়েক হলো মায়ানমারে রয়েছে। বেশিরভাগই জেট ফাইটার ও হেলিকপ্টার গানশিপের ক্রু।

কথায় কথায় বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানাল হুনান, সময় করতে পারলে জানাবি, আকাশ থেকে গোটা মায়ানমার দেখার সুযোগ করে দেব।

'কী রকম?' জানতে চাইল রানা।

'বিরাট দেশ, বিচিত্র ল্যান্ডস্কেপ, পাখির চোখ দিয়ে না দেখলে উপলব্ধি করতে পারবি না প্রকৃতি কত কী দিয়েছে বার্মিজদেরকে। তোকে পাইলট সহ একটা কপ্টার দিয়ে দেব, যে-কদিন খুশি আকাশে আকাশে ঘুরে বেড়াবি।'

'ম্যাপ বের কর,' বলল রানা। 'দেখি কোন্ দিকটা আকৃষ্ট করে আমাকে।'

অতি উৎসাহী হুনান সঙ্গে সঙ্গে একটা অর্ডন্যান্স ম্যাপ বের করে সেটার ভাঁজ খুলল। সুযোগের সদ্ব্যবহার করে লেমিয়েথনা

কোথায়, কতদূরে ইত্যাদি ভাল করে দেখে নিল রানা। বলা তো যায় না, সিতওয়ে আরাকানীর সঙ্গে আলাপ করবার পর হয়তো ম্যাডাম ইরাবতির কাছে একবার যেতে হতে পারে ওকে।

বন্ধু হুনানকে ধন্যবাদ জানাল রানা, বলল, 'তোর আমন্ত্রণ মনে থাকল, সময় করতে পারলেই যোগাযোগ করব।'

হোটেলে ফেরার পথে একটা শপিং মলে থেমে কয়েকটা দোকান থেকে কিছু কেনাকাটা করল রানা, সবই লেমিয়েথনায় যাওয়ার কথা মাথায় রেখে।

পনের মিনিট মেডিটেশন করে শাওয়ার সারল রানা। সিতওয়ে আরাকানীর সঙ্গে মিটিং আছে, কাপড় পরে দ্রুত তৈরি হয়ে নিল।

একই ছাদের তলায় একটা পার্টির দাওয়াতও পেয়েছে রানা। নিদানি থুয়ে ওকে জানিয়েছে, সেই পার্টিতে ওর জন্য অপেক্ষা করবে তার বান্ধবী তিসতা আরাকানী।

তবে নিদানিকেও ওর দরকার। তার জন্য কিছু টাকা আলাদা করে রেখেছে ও।

নয়

রাজ্যের ফুল ও আলোর মালা দিয়ে সাজানো সিতওয়ে আরাকানীর বাড়ি জোর বাদ্যযন্ত্র ও হাসির আওয়াজে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

পাকা উঠানের একধারে দাঁড়িয়ে আছেন বাড়ির মালিক, কানের পরদা ফাটানো ব্যান্ড থেকে যতটা পারা যায় দূরে, আবার এত দূরে নয় যে দেখে মনে হতে পারে পার্টিতে তিনি অংশগ্রহণ করছেন না।

চোখ-মুখে প্রশান্ত ভাব নিয়ে চুরুট ধরাচ্ছেন সিতওয়ে আরাকানী, সন্ধের পর এটা তিন নম্বর। চোখ-মুখ যাই বলুক, তাঁর মনটা ভয়ানক অশান্ত হয়ে আছে। এখনও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেনি রানা। এদিকে থোন ফালানকে তিনি কথা দিয়েছেন, কাল তাকে ইরাবতি দিদির কাছে ফিরে যেতে দেবেন।

সারাটা দিন ভালই ছিল তিসতা, কিন্তু কিছুক্ষণ আগে সেই নরকের কীট আজমল হুদার সঙ্গে বাড়ির কোথায় হারিয়ে গেছে কে জানে।

এরচেয়ে বিস্ময়কর আর কী হতে পারে! তাঁর বাড়িতে! বিসিআই-এর সিসটার কনসার্ন রানা এজেন্সির একজন এজেন্টের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে পিসিআই-এর একজন কর্মকর্তাকে! ওহ্ গড!

খবরটা শোনার পর তিসতাকে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'আমার বাড়িতে ওই লোককে আমি ঢুকতে দেব না□নো, নেভার!'

মেয়ে জবাব দিয়েছে, 'পার্টিটা আমার, পাপা। তুমি কি চাও সেটা আমি তাঁর বাড়িতে দিই?'

অর্থাৎ আবার নিজের মেয়ের কাছে হেরে গেছেন আরাকানী।

কাছাকাছি এক টিন-এজারকে দেখতে পাচ্ছেন তিনি, এরইমধ্যে মাতাল হয়ে গেছে। ওহ্ গড, অভিশপ্ত পাকিস্তানী স্পাইটাকে নিয়ে গেল কোথায় তিসতা!

বাগানে রয়েছে তিসতা, কর্নেল হুদার কানে ফিসফিস করে নিজের হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছে: 'তুমি কথা দিয়েছ! তুমি কথা

দিয়েছ! যা চেয়েছ তা তুমি পাওনি? এত তথ্য দিলাম, তাও বলছ যথেষ্ট নয়?'

কর্নেল হুদার সুদর্শন চেহারায় মিষ্টি হাসি ফুটল। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল সে। 'তুমি সফল, তিসতা। খুব ভাল করেছ। কিন্তু সত্যি যথেষ্ট নয়। এসো, খেলাটা আরও কিছু সময় খেলি আমরা, কেমন? কেউ একজন, সম্ভবত কোনও বাংলাদেশী, তোমার পাপার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। অন্তত তোমার মুখে শোনা ওদের কথা থেকে তা-ই মনে হয়েছে আমার। জানতে চেষ্টা করো, কে তিনি। চিন্তা কোরো না, আমি আমার প্রতিশ্রুতির কথা ভুলিনি। তবে রাত তো সবে মাত্র শুরু হলো। পরে দেখা যাবে, হয়তো সৈকতে...' লোহার মত শক্ত হাত তিসতার চিবুক ধরে উঁচু করল।

*

বাড়ির আরেকদিক। উঠানে বেরিয়ে আসতেই নিদানি থুয়ের পরিচিত চিৎকার শুনতে পেল রানা: 'ও লা লা! ভাবছিলাম তুমি বুঝি আর এলেই না।' ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে ওকে চুমো খাওয়ার চেষ্টা করল সে।

'এই, না!' তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এসে সাবধান করল রানা। 'দেখছ না চারদিকে কারা সব রয়েছে!'

নিদানিকে হতভম্ব দেখাল। 'মানে? কারা সব?'

'প্রায় সবাই তো দেখছি আন্ডারএইযড্।'

'রাত আর একটু বাড়তে দাও, দেখতে পাবে এককেজন বাঘের বাচ্চা□এই অল্পবয়েসীরাই কত কী করে,' হেসে উঠে বলল নিদানি। 'কী নেবে বলো,' ইঙ্গিতে একজন ওয়েটারকে ডাকল সে।

মাথা নাড়ল রানা। 'প্রথমে আমি আমার হোস্টের সঙ্গে দেখা করব। কোথায় সে?'

‘ওহ্, কী জানি। আছে কোথাও তার লেটেস্ট বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে। যেখানে খুশি থাকুক তারা, এসো এই সুযোগে আমরা কিছু ব্যবসা সেরে নিতে পারি।’

‘মানে?’

‘আমি জানি তোমার সঙ্গে সব সময় টাকা থাকে।’ হাসছে নিদানি।

রানা হাসছে না। ‘সেই টাকা আমার পকেট থেকে বের করতে হলে তথ্যটা হতে হবে নির্ভুল।’

‘বলো কী জানতে চাও।’

‘শায়লা শারমিনের কোনও খোঁজ পেলে?’ জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়ল নিদানি। ‘নিশ্চয়ই শুনেছ যে তার বাগানবাড়িতে আগুন লেগেছে?’

‘আমি শুনলাম ওটা নাকি শুধু আগুন লাগার ঘটনা নয়,’ বলল রানা। ‘পুলিশ কী বলছে?’

ফিসফিস করল নিদানি। ‘পুলিশ প্রকাশ্যে বলছে ওটা শুধুই একটা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। কিন্তু ভেতরে তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে।’

‘কী রকম?’

‘আগুন ধরা ওই বাড়ি থেকে পাঁচ-পাঁচটা লাশ পাওয়া গেছে। পোড়া হলেও, বুলেটের ক্ষত আছে ওগুলোর শরীরে। পিসিআই-এর কর্নেল হুদাকে অ্যারেস্ট করার জন্যে ওয়ারেন্ট ইস্যু করা হয়েছিল।’

‘সে কি! কেন?’

‘কারণ পুলিশ নাকি তাকে অকুস্থল থেকে চলে আসতে দেখেছে।’

‘আচ্ছা! তারপর?’

‘হেনযাদা ক্যান্ট থেকে জেনারেল উ নিমুচির টেলিফোন কল আসায় কর্নেল হুদার বিরুদ্ধে ইস্যু করা ওয়ারেন্ট প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে।’

‘জেনারেল উ নিমুচির কী স্বার্থ? তিনি কেন কর্নেল হুদাকে বাঁচাতে চাইছেন?’

‘বিজনেস পার্টনার ওঁরা। ওঁদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম মিউচুয়াল ভেঞ্চার। তা ছাড়া, জেনারেলের ভাইপো উ থুইমুই খুন হয়েছে না!’

‘কীসের ব্যবসা ওদের?’ জানতে চাইল রানা।

‘তা কেউ জানে না,’ ফিসফিস করল নিদানি। ‘সব কিছু খুব গোপনে করা হচ্ছে। খুব নাকি বড় একটা কোম্পানি হতে যাচ্ছে ওটা। শুধু সিকিউরিটি সেকশনের জন্যেই নাকি কয়েকশো লোককে চাকরি দিয়েছেন ওঁরা, বেশিরভাগই বার্মিজ মার্সেনারি, কিছু পাকিস্তানীও আছে। এমনও শোনা যাচ্ছে যে জেনারেলের ভাইঝিকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন কর্নেল হুদা।’

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে নিদানির হাতে ধরিয়ে দিল রানা। পাঁচশো মার্কিন ডলারের একটা নোট আছে তাতে। ‘ধন্যবাদ। এবার বলো, তিসতাকে না পাই, তার পাপাকেও হ্যালো বলার সুযোগ পাব না? ভদ্রলোকের সঙ্গে একসময় আমার পরিচয় ছিল, দেখলে চিনব, কিন্তু...’

সিগারেটের প্যাকেটটা হাতব্যাগে ভরবার পর খুলল নিদানি, দশ-বারোটা সিগারেটের মাঝখান থেকে পাঁচশো ডলারের নোটটা বের করে হাতব্যাগের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। একটু পর প্যাকেটটা রানাকে ফেরত দিল সে।

‘চিনবে না ছাই!’ হেসে উঠল নিদানি। ‘ওই তো ওদিকে দাঁড়িয়ে এক মহিলার সঙ্গে কথা বলছেন তিনি।’ হাত তুলে দেখাল সে।

‘ধন্যবাদ,’ বলে সিতওয়ে আরাকানীর দিকে এগোল রানা।

‘আরও কথা আছে,’ পিছন থেকে বলল নিদানি। ‘আমাকে না বলে চলে যেয়ো না।’

রানাকে এগিয়ে আসতে দেখে সঙ্গের মহিলাকে বিদায় করে দিলেন সিতওয়ে আরকানী।

হ্যান্ডশেক করল ওরা। রানা বলল, ‘আপনার মেয়ে তার পার্টিতে দাওয়াত দিয়েছে আমাকে।’

‘অথচ আপনাকে রিসিভ করার সৌজন্য দেখায়নি,’ একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বললেন সিতওয়ে আরাকানী। ‘আপনার হাত তো দেখছি খালি। বলুন কী নেবেন।’

‘ধন্যবাদ, আপাতত কিছুই না,’ বলল রানা। চারপাশটা দেখে নিয়ে গলার আওয়াজ খাদে নামিয়ে আবার বলল, ‘শুনুন আমি কী জেনেছি।’

শারমিনের বাড়িতে কী ঘটেছে ব্যাখ্যা করল রানা। তারপর পুলিশ ও জেনারেল নিমুচির তৎপরতা সম্পর্কেও বলল।

উঠানের আরেক মাথায়, ব্যান্ড-এর কাছাকাছি, চুল থেকে স্কার্ফ খুলে মাথার উপর বনবন করে ঘোরাচ্ছে নিদানি, সেই সঙ্গে ড্রাম বিট-এর তালে তালে অ্যাথলেটিক ভঙ্গিতে নিতম্ব দোলাচ্ছে। দর্শক ও ভক্ত জুটতে বেশি সময় লাগল না, তালি দিয়ে উৎসাহ দিচ্ছে তারা।

‘টেলিফোনে আপনি বললেন, বেল্টটা আনার জন্যে লেমিয়েথনায় যাবেন আপনি,’ আশপাশে কেউ নেই দেখে শুরু করলেন সিতওয়ে আরাকানী।

‘ঠিক কী ঘটেছে ওখানে, ফোনে সবটুকু আমাকে আপনি বলতে পারেননি,’ বলল রানা। ‘বাকিটুকু শুনি, তারপর সিদ্ধান্ত নেব।’

সিতওয়ে রানাকে জানালেন, মেয়েটি মারা গেছে, ধান খেতে

পুঁতে রাখা হয়েছে লাশটা। তার বাগানবাড়ি থেকে পেন ড্রাইভ উদ্ধার করেছে থোন ফালান, পৌঁছে দিয়েছে দিদির কাছে। তারপর আবার ফিরে এসেছে ইয়াংগনে।

'সত্যি যদি যান, ভাল একজন গাইড দিতে পারব আপনাকে।'

'বুলডগের মত দেখতে লোকটা। থাই?' প্রশ্ন করল রানা।

'হ্যাঁ,' বললেন আরাকানী। 'আমার দিদির বডিগার্ড। ওর নাম থোন ফালান।'

'ম্যাডাম ইরাবতি কি লেমিয়েথনায় আছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ফোন করে আমরা তাঁকে পাইনি।'

'দিদি আপাতত আমার আরেক বোনের বাড়িতে আছেন।'

'বিজ্ঞাপনটা তা হলে মায়ানমার টাইমসে ছাপতে দিল কে?'

জানালেন সিতওয়ে আরাকানী।

'আপনি তাকে বিশ্বাস করেন?'

'ও এমন একজন মানুষ, যাকে অবিশ্বাস করার প্রশ্ন ওঠে না,' দৃঢ়স্বরে বললেন আরাকানী। 'কোনও সন্দেহ নেই যে ও যা বলছে ঠিক তাই ঘটেছে।'

'ঠিক আছে, বাকিটুকু শোনা যাক।'

বললেন আরাকানী। সবশেষে জানালেন, 'থোন ফালান দিদির নিরাপত্তার কথা ভেবে অস্থির হয়ে উঠেছে, পারলে এই মুহূর্তে রওনা হয়ে যায়।'

'আর কেউ জানে, ও আপনার বাড়িতে আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

তীক্ষ্ণ হলো আরাকানীর দৃষ্টি। 'আমার নিজের লোক মাইদ দেভাই। আর তিসতা... হ্যাঁ, দু'এক সেকেন্ডের জন্যে সে-ও বোধহয় দেখেছে তাকে। তবে তার সম্পর্কে কিছুই জানে না ও।'

এই সময় ভারতীয় দূতাবাসের কমার্স সেক্রেটারি মিসেস

মেহতাকে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল, দু-পাশে রয়েছে তাঁর দুই তরুণী কন্যা।

রানার সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন আরাকানী। সৌজন্য বিনিময়ের সময় রানার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জানান দিল, কেউ ওর উপর নজর রাখছে।

ঘাড় ফেরাতেই ব্যান্ডস্ট্যান্ড-এর কাছে তিসতাকে দেখতে পেল রানা, খাটো এক ভিয়েতনামী ভদ্রলোকের সঙ্গে নাচছে। পার্টনারের দিকে খেয়ালই নেই তার, সরাসরি ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

মৃদু হেসে তার উদ্দেশে হাতের গ্লাসটা একটু উঁচু করল রানা।

'আপনার মেয়ে,' আরাকানীকে বলল রানা। 'আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন, প্লিজ? ও বোধহয় ডাকছে আমাকে।'

রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে মেয়ের দিকে তাকালেন সিতওয়ে আরাকানী। তারপর নিচু গলায় বললেন, 'তবু ভাল যে পাকিস্তানী অভিশাপটার সঙ্গে নেই ও। আমি আশা করব ''ওটার'' কাছ থেকে ওকে আপনি দূরে রাখবেন□হোক মাত্র এক ঘণ্টা বা কয়েক মিনিটের জন্যে।'

ভ্রূ জোড়া একটু উঁচু করল রানা, জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছে মেয়ের উপর তাঁর কী কোনও নিয়ন্ত্রণই নেই? তারপর কী ভেবে মুখ বন্ধ রাখল ও, ঘুরে এগোল তিসতার দিকে।

কয়েক পা এগোতে না এগোতেই বাধা। কোত্থেকে ছুটে এসে ওর পথ আগলে দাঁড়াল নিদানি। 'ও লা লা! সাহস তো দেখছি কম নয় তোমার! আমার উঠান দিয়ে আন বাড়ি যাওয়া হচ্ছে, উম্? হাত পাতল রানার সামনে। 'সেক্ষেত্রে কিছু ছাড়ো।'

'কী ছাড়ব?'

'অন্তত একটা সিগারেট।'

পকেট থেকে বের করে পুরো প্যাকেটই নিদানির হাতে গুঁজে

দিতে যাচ্ছিল রানা। তারপর মনে পড়ল, এই প্যাকেট নিদানি তার হাতব্যাগে ভরেছিল, ভরবার পর ওর চোখের আড়ালে খুলেও ছিল□ডলার বের করবার জন্য।

প্যাকেটটা খুলল রানা, ভিতরটা ভাল করে সার্চ করল। সন্দেহ করবার মত কোথাও কিছু নেই। গুণে দেখল বারোটা সিগারেট রয়েছে, তবে মনে করতে পারছে না কটা থাকবার কথা।

'কী দেখছ?' শুকনো গলায় জানতে চাইল নিদানি, মুখে আড়ষ্ট হাসি।

'ভাবছি এত ঘন ঘন ক্যান্সার স্টিক ধরানো উচিত হচ্ছে কি না,' বলে একটা সিগারেট ধরাল রানা, তারপর প্যাকেটটা ধরিয়ে দিল নিদানির হাতে।

'তোমাকে আরও একটা খবর দিই,' বলল নিদানি, চোখে-মুখে চাপা হাসি। 'সিংহকে দেখে হায়েনা পালিয়েছে।'

'বুঝলাম না।'

'তুমি যেহেতু পালাওনি, তোমাকেই আমি সিংহ ধরে নিচ্ছি,' হাসতে হাসতে বলল নিদানি।

'আর হায়েনা?'

'কর্নেল আজমল হুদা,' বলল নিদানি।

রানার দৃষ্টি কঠিন হয়ে উঠল। 'কী করে জানলে চলে গেছে সে?'

'আমি তাকে পার্কিং লটের দিকে যেতে দেখেছি।'

'কেন তোমার মনে হলো আমাকে দেখেই চলে গেল হুদা?'

'তুমি এরকম জেরা করবে জানলে বিনা পয়সায় এত তথ্য দিতে যেতাম না,' রাগের সুরে বলল নিদানি। 'পিসিআই ও বিসিআই যে সাপ ও নেউল, এটা তুমি অস্বীকার করতে পার?'

'দুঃখিত,' বলল রানা। 'এবং ধন্যবাদ।' সামনে এগোবার

চেষ্টা করল ও।

'ও লা লা, একদম ভুলে গেছি!' হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল নিদানির চেহারা। 'আরেকটা তথ্য দিই তোমাকে, পেমেন্ট পরে করলেও চলবে।'

'আমি অপেক্ষা করছি।'

'কর্নেল বেহুদা, বুঝলে।' চোখে-মুখে চিন্তার ভাব ফুটিয়ে তুলল নিদানি। 'তার পকেটে, ঠিক আছে?' তথ্যটা দিতে অকারণে দেরি করছে সে।

বিরক্ত হয়ে রানা বলল, 'তার পকেটে কী?'

'ফটো।'

'মানে?'

'কী ব্যাপার বলো তো, রানা? কর্নেল হুদার পকেটে তোমার ফটো কেন?'

'তাকেই জিজ্ঞেস করো, কিউট গার্ল,' বলল রানা। 'পথ ছাড়ো।'

'সাবধান কিন্তু,' পথ ছাড়বার আগে রানার কানের কাছে ঠোঁট তুলে ফিসফিস করল নিদানি। 'কিছুটা রেখো আমার জন্যে। তিসতার ব্যাপারটা হলো, যাকে ভাল লাগে তাকে একেবারে ছিবড়ে বানিয়ে ফেলে।'

কথাগুলো শুনছে না, এরকম একটা ভান করে তাকে পাশ কাটাল রানা।

রানাকে আসতে দেখে তিসতা ইতোমধ্যে তার ভিয়েতনামী পার্টনারকে বিদায় করে দিয়েছে। তার সামনে দাঁড়িয়ে মৃদু হাসল রানা, জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছ তুমি, তিসতা?'

'আমার সঙ্গে নাচুন, মিস্টার রানা,' কটাক্ষ হেনে বলল তিসতা। 'তাতেই পরিষ্কার হয়ে যাবে কেমন আছি আমি।'

নাচ শুরু করেই রানা উপলব্ধি করল, তিসতার ভিতর শিল্প

আছে। মেয়েটা নাচছে তো না, যেন ওকে নিয়ে বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে।

বড় একটা কামরার ভিতর চলে এল ওরা। এখানে আলো খুব বেশি উজ্জ্বল। রানা খেয়াল করল তিসতার মুখটা কী কারণে যেন অস্বাভাবিক লালচে হয়ে আছে।

নাচ থামিয়ে খানিক পরপরই হুইস্কি খেল তিসতা, অথচ এমন ভাব করল যেন না খেলেই নয় তাই চিরতার পানি খাচ্ছে।

মাঝে মাঝে, হঠাৎ করে, রানার ব্যাপারে অতি মাত্রায় আগ্রহী হয়ে উঠল সে। একসঙ্গে এক রাশ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছে□ইয়াংগনে কী কাজে এসেছে ও, পাপার সঙ্গে কী নিয়ে ব্যবসা করছে, কতদিন আছে মায়ানমারে। এরপর কোথায় যাবে ইত্যাদি।

নিজের সম্পর্কে সত্য-মিথ্যার মিশেল দিয়ে একটা গল্প বানিয়ে বলল রানা। তারপর বুঝতে চেষ্টা করল তিসতা তার বাবার এসপিওনাজ জীবন সম্পর্কে আদৌ কিছু জানে কি না, বাড়ির রহস্যময় আগন্তুক সম্পর্কেই বা তার কী ধারণা।

কিন্তু এ-সব প্রসঙ্গ কৌশলে পাশ কাটিয়ে গেল তিসতা, ঘুরেফিরে সে শুধু রানার ব্যক্তিগত বিষয়ে প্রশ্ন করছে।

কামরাটা ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে। বুঝতে অসুবিধে হলো না যে এই ধোঁয়া সাধারণ সিগারেট থেকে বেরুচ্ছে না। এক মেয়ে টেবিলে চড়ল, উঁচু একটা জায়গা থেকে তার বয়ফ্রেন্ডের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেখতে চায় কেমন মজা লাগে।

ছেলেটা প্র্যাকটিকাল, মেয়েটিকে নিরস্ত করতে না পেরে ঘুরে হাঁটা ধরল দরজার দিকে। কিন্তু ড্রাগস মেয়েটিকে কতটা বেকুব করে তুলেছে, তার কোনও ধারণা নেই।

লাফ দিয়ে সে তার পিঠের উপর পড়ল।

দুজনেই আছাড় খেল মেঝেতে। ভাগ্য ভাল বলতে হবে কেউ মারাত্মক আহত বা নিহত হলো না। কপালে ছোট সাইজের

একটা আলু নিয়ে দ্রুতপায়ে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল ছোকরা।

তিসতার সঙ্গে এখনও নাচছে রানা। 'শুনলাম বয়সে তোমার চেয়ে বেশ কিছুটা বড়, তবে স্টেডি এক বয়ফ্রেন্ড আছে তোমার,' হালকা সুরে বলল রানা। 'দীর্ঘদেহী, অ্যাথলেটিক, ঈর্ষাকাতর একটা গরিলা বিশেষ। কখন আসছে সে, আমাকে মেরে ছাতু বানাতে?'

'স্টেডি? হাউ অ্যাবসার্ড! স্টেডিনেস আমার চরিত্রেই নেই। আমার মালিক আমি নিজে, আর কেউ নয়। তা ছাড়া, তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে।'

কর্কশ, স্নায়ুবিদারক মিউজিক হঠাৎ করেই থামল। রানাকে নিয়ে একটা বার-এর সামনে চলে এল তিসতা। গ্লাসে খানিকটা হুইস্কি নিয়ে দুই ঢোকে খেয়ে ফেলল সে, তারপর রানার দিকে ফিরে বলল, 'পাপার সঙ্গে এক বাংলাদেশী ভদ্রলোক যোগাযোগ করবেন। আপনিই কি সেই ভদ্রলোক?' এরইমধ্যে খানিকটা নেশা হয়েছে তার, কথাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে।

একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রানা। তার মানে কিছু অন্তত জানে তিসতা। বিস্মিত হওয়ার ভান করল ও। 'কী ব্যাপারে?'

হাত ঝাঁকাল তিসতা। 'অত-শত জানি না। ও আমাকে বলছিল এক বাংলাদেশী ভদ্রলোক গুরুত্বপূর্ণ কোনও একটা ব্যাপারে পাপার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আপনি কি পাপার সঙ্গে কথা দেখা করতে চান?'

'তাঁর সঙ্গে তো আমার কথা হয়েছে,' তিসতার কী প্রতিক্রিয়া হয় দেখবার জন্য অপেক্ষা করল রানা, তারপর আবার বলল, 'ভাবলাম তুমি আমাদেরকে দেখেছ।'

'ওহ।' যেন দম ফুরিয়ে যাওয়ায় হাঁপিয়ে উঠল তিসতা। মুহূর্তের জন্য দিশেহারা, বিভ্রান্ত নাবালিকার মত লাগল তাকে, কী একটা ভয় যেন তাড়া করছে। গ্লাসটা বারে নামিয়ে রাখবার সময়

তার হাতটাকে সামান্য কাঁপতে দেখল রানা। আরেকটা প্রশ্ন উঠে এসেছে তার ঠোঁটে। 'তার মানে কি আপনিই...' হঠাৎ কী যেন দেখে আড়ষ্ট হয়ে গেল তিসতা, হাল ছেড়ে দিল সে। 'বাদ দিন, ভুলে যান। আসলে আমার কোনও ব্যাপার না।'

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে কামরার আরেক মাথায় তাকাল রানা। দীর্ঘদেহী এক ব্যক্তিকে দেখতে পেল ও। নিদানি থুয়ের সঙ্গে নাচছে সে, তবে সরাসরি ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। লোকটাকে চিনতে ওর কোনও অসুবিধে হলো না।

পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর কর্মকর্তা কর্নেল আজমল হুদা।

দশ

পার্কিং লট। জিপটা নীল রঙের পাজেরো। ভিতরটা অন্ধকার।

মুখে লাল আগুন, ব্যাকসিটে বসে চুরুট টানছে কর্নেল আজমল হুদা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে সে, আলো-ছায়ার ভিতর দিয়ে লাস্যময়ী নিদানি থুয়েকে হেঁটে আসতে দেখছে।

দরজা খুলে দিল সে। সোজা হেঁটে এসে তার কোলে উঠে বসল নিদানি। 'ও লা লা, কী আরামের সিট!'

তাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল হুদা, তারপর বলল, 'ওহ্ গড, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না! এত তাড়াতাড়ি... তুমি কি জাদু জানো?'

মাথা ঝাঁকিয়ে হাতব্যাগ থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে কর্নেল হুদার হাতে গুঁজে দিল নিদানি। 'বললে বিশ্বাস করবে না, একটুর জন্যে ধরা পড়িনি।'

আলো জ্বালল হুদা। প্যাকেটটা খুলল। প্রতিটি সিগারেট দু'আঙুলে ধরে তুলল সে, ওজন অনুভব করল, তারপর ছেড়ে দিল আবার। এভাবে চারটে সিগারেট পরীক্ষা করল সে।

চার নম্বর সিগারেট বের করে বাকি সিগারেট সহ প্যাকেটটা নিদানিকে ফেরত দিল হুদা, তারপর কোল থেকে সিটে নামিয়ে রাখল কোমল নারীদেহ।

সিগারেটটা ভাঙতে ভিতর থেকে লম্বা ও সরু আকৃতির একটা যান্ত্রিক ছারপোকা বেরুল, তামাকের ভিতর লুকানো ছিল। পকেট থেকে ছোট আকারের একটা রেকর্ডিং ডিভাইস বের করল হুদা, সেটার সঙ্গে তার দিয়ে খুদে স্পিকার জোড়া লাগিয়ে একটা সুইচ টিপল।

সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল সিতওয়ে ও রানার আলাপ। তাড়াতাড়ি আবার সুইচে চাপ দিল কর্নেল হুদা, ওরা কে কী বলেছে নিদানিকে শুনতে দিতে রাজি নয়।

কোটের পকেট থেকে কিয়াত-এর একটা বান্ডিল বের করে নিদানির হাতে ধরিয়ে দিল সে, কাছে টেনে আদর করবার ফাঁকে বলল, 'অসংখ্য ধন্যবাদ, নিদানি। এখন তুমি যাও, ওদের আশপাশে কোথাও অপেক্ষা করো, একটু পরেই আসছি আমি।'

অসন্তুষ্ট দেখাচ্ছে নিদানিকে। 'কিন্তু, হুদা, এরকম তো কথা ছিল না। তুমি আমাকে বললে, পার্টিতে আর ফিরতে চাও না, কারণ ফিরলেই তিসতা তোমাকে আবার পাকড়াও করবে। রানাকেও আমি জানিয়েছি যে তুমি চলে গেছ।'

'তাতে কিছু আসে যায় না।' হাসিমুখে দরজা খুলল কর্নেল হুদা, তারপর একরকম ঠেলেই পাজেরোর বাইরে বের করে দিল নিদানিকে।

ঠোঁট ফোলাল নিদানি। 'আমি ভেবেছিলাম এখান থেকে সোজা তুমি আমাকে তোমার ফ্ল্যাটে নিয়ে যাবে।'

'যাবই তো, তবে হাতের কাজগুলো শেষ করে। এখন যাও, তিসতা আর রানার ওপর নজর রাখো। তোমাকে পার্ট পেমেন্ট করা হয়েছে, ওরকম আরও বান্ডিল পাবে তুমি।'

'ঠিক আছে, যাচ্ছি। তুমি কিন্তু বেশি দেরি কোরো না।'

'খুব বেশি হলে পনের মিনিট লাগবে আমার।'

'আমরা নিরিবিলি কোথাও গেলে পারি না?' জিজ্ঞেস করল তিসতা, দুষ্টামি ভরা চোখে রানার মুখে কী যেন খুঁজছে সে। 'কেন যেন মনে হচ্ছে আলাপ করার মত অনেক বিষয় আছে আমাদের।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে, তাই চলো–কিন্তু কোথায়?' জানতে চাইল রানা, চোখের কোণ দিয়ে আরেকবার দেখে নিল কর্নেল আজমল হুদা ও নিদানিকে।

এই মুহূর্তে নাচছে না তারা। রানার মনে হলো, কী নিয়ে যেন তর্ক করছে দুজনে, শেষ মাথার একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে বাইরে।

কী মনে করে হেসে উঠল তিসতা। 'সারা দুনিয়ায় সত্যিকার নিরিবিলি জায়গা তো মাত্র একটাই, বেডরুম। আমারটায় চলুন,' প্রস্তাব দিল সে।

'না, বেডরুমে কেন?' আড়ষ্ট হয়ে উঠল রানা। 'তারচেয়ে...'

'ঠিক আছে, সেকেন্ড বেস্ট হিসেবে আমরা সৈকতকে বেছে নিতে পারি,' বলল তিসতা। 'আমার সব পার্টিই শেষ হয়

ওখানে। আজ সবার আগে আমরাই পৌঁছে যাই চলুন।'

রানা ভাবছে, এরকম অস্থিরচিত্ত একটা মেয়ের সঙ্গে অন্ধকার রাতে নির্জন সৈকতে যাওয়াটা মোটেও উচিত কাজ হবে না। কিন্তু এ-ও পরিষ্কার টের পাচ্ছে, ভয়ঙ্কর কী যেন একটা পাকিয়ে উঠছে ওর চারপাশে—যত তাড়াতাড়ি বুঝে নেয়া যায় ততই মঙ্গল। এখানকার প্রত্যেকে বিদঘুটে, সন্দেহজনক আচরণ করছে; অস্বাভাবিক, অস্বস্তিকর, গুমোট পরিবেশ। কী ঘটতে চলেছে? এখানে? নাকি সৈকতে? কখন?

'এই, চলুন না, প্লিজ!' আবদার ধরল তিসতা। 'ওখানে আমাদের ড্রেস চেঞ্জ করার বুদ আছে। সুইমিং ট্রাঙ্কও পাবেন।'

'কিন্তু সৈকত তো এখান থেকে খুব কাছে নয়,' বলল রানা। 'গাড়ি নিয়ে যেতে হবে, তাই না?'

'আমি যাচ্ছি। আপনি আমার সঙ্গে যাবেন কি যাবেন না?'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে রানা বলল, 'ঠিক আছে, যাব।'

'তা হলে আমার আগে বেরিয়ে যান। আমি চাই না সবাই আমাদের পিছু নিক,' রানার হাতে রিঙ সহ একটা চাবি গুঁজে দিল তিসতা। 'পার্কিং লটের উত্তর কোণে লাল রঙের একটা মার্সিডিজ আছে, দরজা খুলে আমার জন্যে ভেতরে অপেক্ষা করুন। কয়েক মিনিটের মধ্যে আসছি আমি।'

ভিড় ঠেলে কামরা থেকে বেরিয়ে এল রানা। উঠানেও লোকজন কম নয়, তবে তাদের মধ্যে কোথাও সিতওয়ে আরাকানীকে দেখতে পেল না। বাগানের ভিতর দিয়ে পার্কিং লটের দিকে যাওয়ার সময় আবার ষষ্ঠইন্দ্রিয় সজাগ করে দিল ওকে, আড়াল থেকে কেউ ওকে লক্ষ করছে।

ছোট একটা আলোকিত জায়গা পেরিয়ে এসে ছায়ার ভিতর দাঁড়াল রানা, তারপর সময় নিয়ে চারপাশটা ভাল করে পরীক্ষা করল। হয় ষষ্ঠইন্দ্রিয় বোকা বানিয়েছে ওকে, তা না হলে যে লক্ষ

রাখছিল গা ঢাকা দিতে সত্যি ভারি ওস্তাদ সে।

ধীরে ধীরে বাগান থেকে বেরিয়ে এসে পার্কিং লটে ঢুকল রানা। উত্তর কোণে লাল মার্সিডিজটা দূর থেকেই দেখতে পেল। ওকে অবাক করে দিয়ে একটু পরেই চলে এল তিসতা।

ড্রাইভিং সিটে সরে বসল রানা, তিসতার দেখানো পথে গাড়ি চালাচ্ছে।

বাগানে লুকিয়ে থাকা লোকটা নড়ে উঠল। ফুসফুসে তাজা বাতাস দরকার ছিল, কে কোথায় গেল না গেল তাতে তার কিছুই আসে যায় না। তার শুধু ম্যাডামকে নিয়ে চিন্তা, তিনি এখান থেকে অনেক দূরে।

কিন্তু তারপর যখন পার্টির আরেক মেহমান বাগানে ঢুকল, একটা গাছের আড়ালে থেমে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল পার্কিং লট থেকে সদ্য বেরুনো লাল মার্সিডিজের দিকে, ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করল থোন ফালান।

ছয় ফুটের উপর লম্বা এই লোকের নড়াচড়ার মধ্যে কেমন যেন অশুভ একটা ভাব আছে। বয়স একটু বেশি, তবে এখনও যেন বক্সিং রিঙে নিয়মিত প্র্যাকটিস করে। অতি মাত্রায় সজাগ, কেউ যাতে তাকে দেখতে না পায়। মার্সিডিজ চলে যেতে বাগান থেকে বেরিয়ে পার্কিং লটে ঢুকল লোকটা, তাড়াহুড়ো করে উঠে বসল একটা পাজেরোয়। সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট নিল জিপ।

থোন ফালান পরিষ্কার বুঝল, তার আশ্রয়দাতা সিতওয়ে আরাকানীর মেয়ে তিসতা এবং তাঁদের মেহমান এক বাংলাদেশী তরুণকে অনুসরণ করা হচ্ছে।

এটা অবশ্য তার কোনও বিষয় নয়। তবে মনে থাকবে থোন ফালানের। দেখামাত্র ওই বক্সার লোকটাকে চিনতে পারবে সে।

নির্জন পাহাড় ও সৈকত। অন্ধকার সাগর।

ওদের শরীরের উপর দিয়ে ছোট ছোট ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। পাথর দিয়ে ঘেরা সৈকত থেকে বেশ খানিকটা দূরে চলে এসেছে ওরা। পানির উপর মাত্র কয়েক ইঞ্চি উঁচু হয়ে রয়েছে কয়েকটা বোল্ডার, ওগুলোর দুটোর উপর নিজেদের কাঁধ ও মাথার পিছনটা তুলে দিয়ে তারা জ্বলা আকাশ দেখছে দুজন।

সাগরের পানি গরম। সৈকত থেকে চল্লিশ গজ দূরে বোল্ডারগুলো। এইটুকু সাঁতরে আসতেই বেশ হাঁপিয়ে গেছে তিসতা, তাকে দেখে মনে হচ্ছিল পানির সঙ্গে যুদ্ধ করছে সে।

'আমার দম ফুরিয়ে গেছে,' নীরবতা ভাঙল তিসতা। 'ফিরব কীভাবে?'

'চিন্তা করো না, আমি তো আছি,' আশ্বস্ত করল রানা।

পাশাপাশি ভাসছে ওরা। হঠাৎ রানার একেবারে কাছে সরে এল তিসতা। পরস্পরের গায়ে গা ঠেকল।

হঠাৎ যেন একটা শক্ খেল রানা। তিসতার পরনে কিছু নেই।

'সত্যি বলছেন, চিন্তা নেই?' তিসতার গলায় দুষ্টামির সুর। 'আমি আপনার পিঠে চড়ে আনন্দসাগর... থুড়ি, আন্দামান সাগর পার হয়ে যাব?'

'তোমার বিকিনি কোথায়?' অভিযোগের সুরে জানতে চাইল রানা।

'উফ্, কেমন পুরুষ আপনি–টের পেতে এত সময় লাগল?' হেসে উঠল তিসতা। 'কোথায় আবার, খুলে ফেলে দিয়েছি সব। আমার মনে হয় আপনারও তাই করা উচিত।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে,' বলল রানা। 'চলো, সৈকতে ফিরি।' বোল্ডারের দিকে পিছন ফিরে সাঁতার শুরু করল।

রানা রেগে গেছে বুঝতে পেরেও খুব মজা পাচ্ছে তিসতা, অন্তত তার হাসি যেন সেটাই বোঝাতে চাইল। পিছিয়ে পড়েছিল

সে, দ্রুত সাঁতার কেটে রানার পাশে পৌঁছাতে চেষ্টা করছে।

পিছনের পানিতে হাত-পা ছোঁড়ার আওয়াজ শুনে সাঁতারের গতি বাড়িয়ে দিল রানা।

কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পর হঠাৎ আর কোনও শব্দ নেই।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। স্থির হয়ে ভাসছে তিসতা, হাত দুটো অলস, শরীরে যেন কোনও শক্তি নেই। পাজি মেয়েটা অভিনয় করছে, বুঝতে পারছে ও—আশা করছে ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরবে ও।

না।

ঘাড় সিধে করে নিয়ে আবার সাঁতার শুরু করল রানা। ত্রিশ সেকেন্ড পর ঘাড় তুলে আবার তাকাল পিছনদিকে, দেখতে চায় কৌশল কাজে না লাগায় কী করছে তিসতা।

সাগর ফাঁকা। ওর পিছনে কেউ নেই।

দ্রুত ফিরে এল রানা, শেষবার যেখানে দেখেছে তিসতাকে সেখানে ডুব দিল। তিন ফুট গভীরতা... চার ফুট...পাঁচ ফুট... কোথাও নেই সে।

তল্লাশির পরিধি বাড়াতে শুরু করল রানা। ইতোমধ্যে হাঁপিয়ে উঠেছে ও। ডুব দিয়ে পানির নীচে থাকতে পারছে না বেশিক্ষণ, ফুসফুসে বাতাস ভরবার জন্য সারফেসে মাথা তুলতে হচ্ছে বার বার।

প্রতিবার মাথা তুলে চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে রানা। তিসতাকে দেখতে না পেয়ে আরও হিম হয়ে যাচ্ছে বুকের ভিতরটা। ওহ্ গড! ওর বাবাকে কীভাবে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করবে ও?

এবার পানির উপর মাথা তুলে, পাথর ঘেরা সৈকতের দিকে ফিরে চিৎকার শুরু করল রানা: 'হেলপ মি! প্লিজ, হেলপ! এখানে একটা মেয়ে ডুবে যাচ্ছে...'

কিন্তু ওর ডাকে সাড়া দিচ্ছে না কেউ। হয় আশপাশে কেউ

নেই, কিংবা থাকলেও ওর কথা শুনতে পাচ্ছে না সে।

রানা ভাবল—জোয়ার চলছে, কাজেই এসময় কেউ জ্ঞান হারিয়ে ফেললে সাগর তাকে দূরে কোথাও টেনে নিতে পারবে না।

শেষ আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে চাইছে ও।

এবার ডুব দিল সৈকতের আরও কাছাকাছি। আর পানির মাত্র দুই কি আড়াই ফুট নীচেই পেয়ে গেল নিঃসাড় তিসতাকে।

শরীরটাকে সৈকতে তুলে এনে পরীক্ষা করল রানা। মেয়েটার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। পালসও নেই।

এ কাজে দুজন লোক লাগে, কিন্তু একাই করতে হচ্ছে রানাকে। তিসতার বুকে হাতের তালু রেখে চাপ দিচ্ছে, তারপরই মুখে মুখ লাগিয়ে তার ফুসফুসটা বাতাসে ভরে দেওয়ার চেষ্টা করছে—ঘনঘন, পালা করে।

যখন মনে হলো নাহ্ কোনও আশাই নেই, ঠিক এই সময় রানার কানে যেন মধুবর্ষণ করল তিসতার খক খক করে কেশে ওঠার কর্কশ আওয়াজটা।

এগারো

দশ মিনিট পর।

তিসতা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করছে। এখনও সৈকতে রয়েছে ওরা, একের পর এক ঢেউ এসে ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে

ওদেরকে। পাশাপাশি বসে রয়েছে ওরা।

কী হয়েছিল, কীভাবে বাঁচল, নিজেই সব বুঝতে পারছে তিসতা। তেমন কোনও কথা হয়নি ওদের মধ্যে, এক সময় শুধু রানার কাঁধে মাথা ঠেকাল সে।

তারপর হঠাৎ করেই, তবে ঝোঁকের মাথায় নয়—কৃতজ্ঞচিত্তে দু'হাত বাড়িয়ে রানাকে কাছে টানল তিসতা, ঠিক যে সময় মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল চাঁদটা।

নরম হাতে তাকে বাধা দিতে চাইল রানা। তা করতে গেলেও তিসতাকে ওর ধরতে তো হবে, আর কোথায় ধরছে দেখতে হলে চোখও খোলা রাখতে হবে। এ-সব করতে গিয়েই তিসতার বাহুর উপরদিকে বিন্দু বিন্দু বাদামী দাগগুলো ধরা পড়ে গেল ওর চোখে।

'এটা আপনার প্রাপ্য,' ফিসফিস করে বলল তিসতা, বাধা পেয়ে খুব অবাক হয়েছে।

'মরা একটা মানুষকে সাগর থেকে তুলে আনলাম,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'তার কাছ থেকে আরও বেশি কিছু আশা করি আমি।'

থতমত খেয়ে গেল তিসতা। 'মানে? আরও বেশি কিছু...কী?'

'অন্তত দুটো জিনিস।'

'বলুন?'

'আমি দেখতে চাই তোমার ভেতর এখনও খানিকটা আত্মসম্মান বোধ অবশিষ্ট আছে। পাপার একজন জুনিয়র বন্ধুর সঙ্গে শালীনতা বজায় রেখে মেলামেশা করতে তোমার কোনও সমস্যা হচ্ছে না।'

একেবারে স্থির ও বোবা হয়ে গেল তিসতা।

পাহাড়ের উঁচু-নিচু একটা প্রাচীর অর্ধবৃত্ত তৈরি করে ঘিরে

রেখেছে পঞ্চাশ গজ সৈকত, সেটারই পানির কিনারায় বসে রয়েছে ওরা। বুদগুলো পাঁচিলের গা ঘেঁষে, একটা পাহাড়ী ঝরনার পাশে, যেখানে কাপড় ছেড়েছে ওরা। ঢালু সৈকতে অসংখ্য বোল্ডার রয়েছে, যেন একটু গড়িয়ে দিলেই সাগরে গিয়ে পড়বে সবগুলো।

'এভাবে পানিতে বসে থাকলে ঠাণ্ডা লাগবে,' নীরবতা ভেঙে বলল রানা। কাছাকাছি পড়ে থাকতে দেখে তিসতার বিচ গার্মেন্ট দুটো তুলে আনল ও।

'এখনই আমার ফিরতে ইচ্ছে করছে না,' ম্লান সুরে বলল তিসতা, হাত বাড়িয়ে বিকিনির অংশ দুটো নিল। 'আমার বোধহয় আপনার সাহায্য দরকার।'

'তা হলে চলো, একটা বোল্ডারের গায়ে হেলান দিয়ে বসি।' হঠাৎ করে অস্ত্র ও আড়াল, দুটোরই প্রয়োজন বোধ করছে রানা। অনেকক্ষণ হলো নির্জন সৈকতে রয়েছে ওরা।

কনুইয়ের কাছটা শক্ত করে ধরে তিসতাকে দাঁড়াতে সাহায্য করল রানা। একটু টলমল করলেও, কয়েক সেকেন্ড পর রানার সাহায্য ছাড়াই দাঁড়াতে পারল সে, বিকিনিটাও পরতে পারল। দেখা গেল ক্রমশ উঁচু বালুকাবেলা ধরে হাঁটতেও কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তার, তবে যেদিকে যাচ্ছিল সেদিক থেকে তাকে সরিয়ে আনল রানা। সৈকতের সবচেয়ে বড় আকারের বোল্ডারটার দিকে হাত তুলে বলল, 'ওটায় হেলান দিয়ে বসব আমরা।'

কথাটা বলবার কারণ হলো, পাহাড়ী পাঁচিল থেকে নেমে ঘেরা সৈকতের ভিতর ঢোকার সময় ওই বোল্ডারটার আড়ালে নিজের পিস্তলটা লুকিয়ে রেখে গেছে রানা।

চাঁদের আলোয় ঝরনার কাছাকাছি ভাঁজ করা তোয়ালেটা দেখতে পেয়ে স্বস্তি বোধ করল ও। সেটার ভাঁজ খুলে পিস্তলটা বের করল, তারপর বালির উপর বিছিয়ে তিসতাকে বলল,

‘বসো।’

তোয়ালের একধারে বসল তিসতা। রানা বসল আরেক ধারে। তিসতার চোখ ফাঁকি দিয়ে পিস্তলটা ঘন, লম্বা ঘাসের ভিতর গুঁজে রাখল।

‘কথাটা এবার আমাকে বলতে পারেন,’ খানিক পর বলল তিসতা। ‘আপনিই কি সেই বাংলাদেশী, খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজে পাপার সঙ্গে আজ যার দেখা করতে আসার কথা?’

‘হ্যাঁ। তবে গুরুত্বপূর্ণ কাজটা ব্যক্তিগত।’ এক মুহূর্ত পর জিজ্ঞেস করল রানা, ‘কেউ তোমাকে এই তথ্য সংগ্রহ করতে বলেছে?’

জবাব দিতে ইতস্তত করছে তিসতা। তারপর বলল, ‘না, আমি এমনি জানতে চাইছি।’

‘না, তিসতা। এ কি সেই লোক, যে তোমাকে ড্রাগস দেয়?’ প্রশ্নটা সরাসরি করল রানা। ‘সেজন্যেই কি বলছিলে তোমার সাহায্য দরকার?’

একদৃষ্টে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল তিসতা, তারপর বলল, ‘আপনি কি পাপার খুব ঘনিষ্ঠ মানুষ? প্রমাণ করতে পারবেন পাপা আপনাকে বিশ্বাস করে?’

শ্রাগ করল রানা। ‘তা আমি কীভাবে প্রমাণ করব?’

‘আমার জানার কথা নয়, অথচ জেনেছি, এরকম একটা শব্দ বলি আমি,’ প্রস্তাব দিল তিসতা। ‘তার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক একটা শব্দ বলুন আপনি। তা হলে পরিষ্কার হয়ে যাবে, পাপা বিশ্বাস করে আদৌ আপনাকে কিছু বলেছে কি না।’

অপেক্ষা করছে রানা।

‘আমি যদি হক মাওলা বলি, তার বদলে আপনি কী অফার করবেন?’ জানতে চাইল তিসতা।

হক মাওলা! তার মানে অনেক কিছুই জানে তিসতা। ‘আমি

বলব থোন ফালান,' বলল রানা। দেখল একটু বড় হয়ে উঠল তিসতার চোখ দুটো। 'আর আমি যদি বলি পাকিস্তানী অভিশাপ, তুমি কী অফার করবে?'

এবার প্রায় বিষম খাওয়ার অবস্থা হলো তিসতার। 'জানেন! আপনি জানেন! ওই লোকই পাপার ওপর আমাকে স্পাইগিরি করতে বলেছে! ও কথা দিয়ে...তাকে আমি ঘৃণা করি...ও আপনার সম্পর্কেও খোঁজ নিতে বলেছে আমাকে...' খুব দ্রুত বলায় কথাগুলো শেষদিকে জড়িয়ে যাচ্ছে।

তিসতার কাঁধ ধরে জোরে বার দুয়েক ঝাঁকি দিল রানা। 'ও তোমাকে ড্রাগ-এর বড়শিতে আটকেছে, এই তো? শান্ত হও, তিসতা। তারপর ধীরে ধীরে বলো আড়ি পেতে ঠিক কী শুনেছ তুমি, আর কী বলেছ কর্নেল হুদাকে।'

'ব্যাপারটা একটা মেসেজ সম্পর্কে,' বলল তিসতা। 'এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ম্যাডামের কাছে ফিরে যাবে থোন ফালান।' ভ্রূ কোঁচকাল ও। 'এই ম্যাডামটা কে, আমি ঠিক ধরতে পারিনি। ইনি পাপার দূর-সম্পর্কের কোনও বোনও হতে পারেন...'

যতই শুনছে ততই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে রানা। গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সব কথাই শুনেছে তিসতা, সেগুলো সব জানিয়েও দিয়েছে কর্নেল হুদাকে। হুদা খুশি, তবে আরও তথ্য চায় ও।

হঠাৎ একটা দমকা বাতাস দূরের নারকেল গাছগুলোর ডালপালাকে কাঁপিয়ে দিল। মাথা ঘোরাল রানা, বড় বোল্ডারটার আড়াল থেকে অন্যান্য বোল্ডারগুলোর দিকে তাকাল, তারপর চোখ বুলাল অস্পষ্ট পাহাড়-প্রাচীরের মাথায়। অন্ধকারে কেউ নড়াচড়া করছে নাকি? পাতার খসখস আওয়াজকে ছাড়িয়ে ঠুন করে উঠল একটা নুড়ি পাথর?

না বোধহয়। মনের ভুল।

'কাজের কথা তাড়াতাড়ি শেষ করে আমাদের ওঠা উচিত,

তিসতা,' বলল রানা। 'আমি চাই না কেউ এখানে আমাদেরকে দেখুক।'

মাথা নাড়ল তিসতা। 'আসার সময় বললাম না, এত দূরে ওরা কেউ আসবে না। এটা আমার নিজস্ব জগৎ। এই সৈকতের কথা কেউ জানে না, শুধু...একজন নাবিক বাদে, অনেক আগে চিনতাম তাকে।'

'কর্নেল হুদা জানে না?'

'না, ও-ও জানে না।

'এবার বলো,' জিজ্ঞেস করল রানা। 'এত কথা আমাকে বলার কারণ কী? হুদা কথা রাখেনি, সেই রাগে?'

'এই রাগটা যে আমার কী উপকার করেছে, বললে বিশ্বাস করবেন না,' বলল তিসতা, চোখ দুটোয় আশ্চর্য একটা আলো জ্বলে উঠল। 'হুদার জানার কথা নয়, আর আমিও ভুলে গিয়েছিলাম—অন্তরের গভীরে আমি আমার পাপাকে ভালবাসি।

'মিস্টার রানা, এই নরক থেকে বেরুতে হবে আমাকে। এরইমধ্যে একবার আপনি আমাকে নতুন জীবন দিয়েছেন। কিন্তু এ-ও সত্যি যে আপনার সাহায্য ছাড়া আমি...' রানার একটা হাত চেপে ধরল ও।

'আমার সাহায্য তুমি পাবে, তিসতা। তবে তার আগে সিদ্ধান্ত নাও ঠিক কী চাও তুমি,' বলল রানা। 'ড্রাগসকে তুমি লাথি মারতে চাও, সেই সঙ্গে ওই পাকিস্তানী কর্নেলকে? নাকি তাকে তোমার বাবার গোপন পরিচয়টা জানিয়ে দেবে, বলে দেবে থোন ফালানের সঙ্গে কোথায় যাচ্ছি আমি?'

হাতটা এত জোরে চেপে ধরল তিসতা যে ব্যথা লাগছে রানার। 'কী জানি...সুই পাবার আশায় কী করে বসব কে জানে,' বলল ও। 'আপনারা বরং আমাকে একটা ঘরে আটকে রাখুন, আমি যেন তার সঙ্গে আর দেখা করতে না পারি।'

'আর মাত্র একটা প্রশ্ন,' বলল রানা। 'তারপর আমরা ফিরে যাব। কর্নেল হুদা নিশ্চয়ই তার কোনও আস্তানায় নিয়ে যেত তোমাকে, সেটা কোথায়?'

হঠাৎ করেই ফাঁক হলো মেঘ, অমনি উঁকি দিয়ে ওদের দিকে তাকাল ঝলমলে চাঁদটা। ঠিক সেই মুহূর্তে উপলব্ধি করল রানা, ওরা একা নয়। ইন্সটিঙ্কট্-এর ইশারায় ওর শরীরে পিচ্ছিল বাইন মাছের ক্ষিপ্রতা চলে এল, তিসতাকে নিয়ে ছিটকে পড়ল একধারে, দুজন এমনভাবে গড়াচ্ছে যেন একটাই শরীর।

গড়ানো তখনও থামেনি, সৈকতের নীরবতা ভেঙে পর পর কয়েকটা গুলি হলো। দুটো বুলেট বেরিয়ে গেল রানার কানের পাশ দিয়ে। বিষম খাওয়ার মত শব্দ বেরুতে যাচ্ছিল তিসতার গলা থেকে, থেমে গেল মাঝপথে, ঠিক যখন তৃতীয় গুলিটা ছুটে এল পাহাড়-প্রাচীরের বেশ খানিকটা উপর থেকে।

তিসতার মুখ বিকৃত হয়ে যেতে দেখল রানা। দু'হাত দিয়ে তাকে জড়াতে গিয়ে অনুভব করল থরথর করে কাঁপছে ছোট্ট নরম শরীরটা। এই সময় কানের পরদায় আঘাত করল চতুর্থ গুলির শব্দ, পরমুহূর্তে মাথার পাশের চুল পুড়িয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট। তিসতাকে ছাড়ল না ও, টেনে-হিঁচড়ে বোল্ডারটার আরেকদিকে সরিয়ে আনল।

তিসতাকে নিয়ে গড়ান দেওয়ার সময়ই পিস্তলটা হাতে চলে এসেছিল, হাঁটুর উপর সিধে হয়ে দূরে তাকাল রানা, যেদিকে মাজল্ ফ্ল্যাশ দেখেছে।

অন্ধকারে কিছুই স্পষ্ট নয়। কোনও শব্দও হচ্ছে না।

নিস্তেজ গলায় মাঝে মধ্যে গোঙাচ্ছে তিসতা, তার গলার পাশ বেয়ে গাঢ় একটা ধারা ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে।

এবার পাহাড়-প্রাচীরের দিক থেকে অন্যরকম আওয়াজ ভেসে এল। সেটা কানে ঢোকার আগেই রানার চোখের কোণে ক্ষীণ

নড়াচড়া ধরা পড়েছে। ভাল করে তাকাতে পাহাড়-প্রাচীরের নীচের দিকে একটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেল ও, মেঘের ছায়ায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।

চাঁদ না থাকায় কালো হয়ে গেল চারদিক, শুধু পায়ের কাছে অস্পষ্ট একটা কাঠামো পড়ে থাকতে দেখছে রানা।

খুনি জানে কোথায় আছে ওরা, তাই প্রথম কাজ এখান থেকে সরে যাওয়া। উপুড় হয়ে শুলো রানা, তারপর তিসতাকে পিঠের উপর তুলে নিয়ে বালিতে হামাগুড়ি দিয়ে ছোট আকৃতির কয়েকটা বোল্ডারের দিকে এগোল।

বিশ গজ দূরে এসে একজোড়া বোল্ডারের মাঝখানে শোয়াল আবার তিসতাকে। কোনও শব্দ করছে না ও, তবে জ্ঞান হারায়নি। জানে এই মুহূর্তে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার তাকে, কিন্তু এ-ও জানে খুনির একটা ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত সেটা সম্ভব নয়।

খুনির শব্দ পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে ও। একটু পরেই শুনতে পেল, কর্কশ পাথরে কাপড়ের ঘষা।

নিচু বোল্ডারগুলোকে পিছনে রেখে ক্রল শুরু করল রানা। ওর উদ্দেশ্য খুনির পিছনে পৌঁছানো, পাহাড়-প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছোট্ট সৈকতে তাকে আটকে ফেলা।

হাতে পিস্তল রেডি, তবে গুলি করবে শুধু লাগাতে পারবে বুঝবে যখন। উঁচু পাহাড়-প্রাচীরের গোড়ায় দ্রুতই পৌঁছে গেল রানা। ঢালটা খুব খাড়াভাবে উঠে গেছে, গায়ে অসংখ্য নুড়ি পাথর। পায়ের সামান্য ঘষা লাগলেই গড়াতে শুরু করবে।

স্থির হয়ে থাকল রানা। খুনি আর কোনও শব্দ করছে না। লোকটা কোথায় জানার জন্য ছোট একটা পাথর ছুঁড়ল ও—প্রাচীরের উপর দিকে।

প্রথম চারটের চেয়ে জোরালো শব্দ করল এবারের গুলিটা,

রাতের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে ছিন্নভিন্ন করে দিল। রানার নুড়ি যেখানে পড়েছে তারচেয়ে অনেক নীচে দেখা গেল মাজল ফ্ল্যাশ। তার মানে আগের চেয়ে কাছে চলে এসেছে খুনি।

পাল্টা গুলি না হওয়ায় সাহস বেড়ে গেছে তার? রানার মতই, ও-ও হয়তো প্রতিপক্ষের পিছনে পৌঁছাতে চায়।

রানা যে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করেছে, এটা বুঝতে খুনির খুব বেশি সময় লাগবে না। ও ধরে নেবে, ঘেরা সৈকত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছে রানা।

ক্রল করে পিছাতে শুরু করল রানা। তিসতার কাছে ফেরা দরকার ওর। অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। বালির উপর থামল একবার। ও স্থির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খসখসে একটা আওয়াজও কি থেমে গেল? ওর পিছু নিয়ে আসছে খুনি? কান পেতে অপেক্ষায় থাকল রানা। কিন্তু বাতাস ও সাগরের মৃদু কল্লোল ছাড়া আর কিছু শুনতে পাচ্ছে না।

খুনি যদি নড়াচড়ার মধ্যে থাকে, ওর মত সে-ও কোনও শব্দ করছে না। অন্ধকার ভেদ করবার জন্য চোখ কোঁচকাল রানা। দৃষ্টিসীমার ভিতর কিছু নড়ছে বলে মনে হলো না। আকাশে মুখ তুলে মেঘের অবস্থা দেখে নিল—গাঢ়, গম্ভীর ও বাড়ন্ত। চাঁদের বেরিয়ে আসবার কোনও সুযোগই নেই।

অপেক্ষাও একটা কৌশল। কিন্তু রানার সমস্যা হলো, তিসতাকে বাঁচাতে হলে অপেক্ষা করা চলে না ওর।

পাঁচটা গুলি করা হয়েছে। আরও হয়তো তিনটে বুলেট আছে তার পিস্তলে। সেই সঙ্গে একটা স্পেয়ার ক্লিপ।

তিসতার নিথর শরীরটার কাছে ফিরে এল রানা। ইচ্ছে হলো স্পর্শ করে দেখে এখনও শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে কি না, কিন্তু জানে, প্রতিপক্ষের সঙ্গে একটা কিছু হেস্তনেস্ত না হওয়া পর্যন্ত সেটা করা উচিত হবে না।

আবার মুখ তুলে উপরদিকে তাকাল রানা। কালো সুতি কাপড় হয়ে আছে আকাশ।

কোনও শব্দ না পেলেও ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে, খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে খুনি। পিস্তলটা শক্ত করে ধরল রানা, তর্জনী হেয়ার-ট্রিগারে। সিদ্ধান্ত নিল বড় বোল্ডারটার কাছে ফিরে যাবে, কারণ খুনির ধারণা, ওর সঙ্গিনী আহত হওয়ার পর ওখানেই পড়ে আছে, কাজেই রানা আবার ফিরবেও ওখানে।

বড় বোল্ডারটার কাছে পৌঁছে ছোট একটা পাথরকে গড়িয়ে দিল রানা। এবার কোনও গুলির শব্দ হলো না, তার বদলে কেউ একজন বলে উঠল, 'ইয়াহ্!' প্রায় বিজয়ীর সুরে।

তারপর ইংরেজিতে যা বলল, উচ্চারণে পাঞ্জাবী টান থাকলেও সুরটা বন্ধুসুলভ ও মোলায়েম, 'এই ইডিঅটিক খেলাটা এবার বন্ধ কারো, দোস্ত। আমি জানি, তুমি আর্মড নও, কাজেই খেলাটা চালিয়ে গেলে আগে বা পরে তোমাকে আমি ঠিকই ঘায়েল করবই।'

রানা কিছু বলছে না।

'মেয়েটা আমাদের দুজনের জন্যেই বিড়ম্বনা ছিল,' আবার বলল লোকটা, গলার আওয়াজ কর্নেল আজমল হুদার বলে চিনতে পারছে রানা। 'এখন ও যেহেতু ঝামেলা করবে না আর, এসো নিজেদের তথ্য নির্ভয়ে শেয়ার করি আমরা। আসলে যুক্তিসিদ্ধ আলোচনার মাধ্যমে আমরা একটা মীমাংসায় পৌঁছাতে পারি। কথা দিচ্ছি, আড়াল থেকে বেরিয়ে এলে আমি তোমাকে গুলি করব না।'

'সেক্ষেত্রে পিস্তলটা ফেলে দাও,' বলল রানা। 'এমন ভাবে ফেলবে, শব্দ শুনে যেন আমি বুঝতে পারি, সত্যিই ওটা তুমি ফেলে দিয়েছ।'

মৃদু শব্দে হাসল কর্নেল হুদা–ব্যাটা বিশ্বাস করছে না

আমাকে! কয়েক সেকেন্ডের বিরতি। তারপর দশ গজ দূরে পাথরের উপর কিছু একটা পড়ে খটাখট আওয়াজ করল। অন্ধকারে হাতড়াচ্ছে রানা, একটা ছোট পাথর পেয়ে মুঠোয় ভরল সেটা।

হুদার গলা ভেসে এল। 'তোমার কথা রাখলাম, মাসুদ রানা। এবার বেরিয়ে এসো, দেখি তোমাকে।'

'ওটা যদি পিস্তল হয়, তা হলে তোমার হাতে ওটা কী?' গলা চড়িয়ে প্রশ্ন করল রানা, তারপর হাতের পাথর আওয়াজ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিয়েই এক লাফে বোল্ডারের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

গর্জে উঠল প্রতিপক্ষের পিস্তল, বোল্ডারের গায়ে লেগে বিঙঙ শব্দ তুলে আরেকদিকে ছুটে গেল বুলেট।

পিস্তলের মাজল-ফ্ল্যাশ মোলায়েম কণ্ঠস্বরের চেয়ে ভাল টার্গেট। পরপর দুটো গুলি করল রানা, শুনতে পেল ব্যথায় কাতরে উঠল হুদা। বালির উপর দিয়ে একটা বোল্ডার গড়ানোর আওয়াজ ভেসে এল। তারপরেও ছুটন্ত পায়ের অস্পষ্ট শব্দ শুনতে পেল ও। বোল্ডারটাকে গড়িয়ে দিয়ে নিজের পায়ের আওয়াজ চাপা দিতে চেয়েছে হুদা।

সেদিকে আরও একটা গুলি করল রানা। এবার ব্যথা পেয়ে কেউ গুঙিয়ে ওঠেনি। হুদার আরেকটা বুলেট ওর মাথার উপর দিয়ে বাতাস চিরে বেরিয়ে গেল। মাজল-ফ্ল্যাশ অনেকটা দূরে, পাহাড় চূড়ার প্রায় কাছাকাছি। খুনি পালাচ্ছে বুঝতে পেরে লাফ দিয়ে সিধে হলো রানা, পিছু নিল তার।

তবে তিসতাকে একা ফেলে রেখে বেশি দূর গেল না ও। গাঢ় অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছে না, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কান পাতল। পায়ের অস্পষ্ট আওয়াজ এখনও পাচ্ছে, তবে প্রাচীরের অনেকটা উপর থেকে ভেসে আসছে সেটা। সেদিকে আরেকটা

গুলি করল রানা।

পাল্টা কোনও গুলি হলো না।

তারপরই শোনা গেল বার্মিজ বর্ষার মিষ্টি-মধুর বোল–ঝমাঝম বৃষ্টি। এমন প্রবল বেগে এল, যেন আকাশ থেকে পানির ফোঁটা নয়, নামছে জলপ্রপাতের ধারা।

বিদ্যুচ্চমকের আলোয় বহু দূরে পলায়নরত মূর্তি লক্ষ্য করে অন্ধকারে আরও একটা গুলি করল রানা। কিন্তু হুদার পিস্তল প্রত্যুত্তর দিল না। আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল ও। তারপর শুনতে পেল।

অনেকটা দূরে স্টার্ট নিল একটা গাড়ির ইঞ্জিন।

ঘুরল রানা, তিসতার কাছে ফেরার জন্য পা চালাল দ্রুত।

বারো

ছোট একজোড়া বোল্ডারের মাঝখানে শুয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে তিসতা। তার বিকিনি পরা শরীরে প্রাণ নেই।

বুদ থেকে নিয়ে আসা কাপড়গুলো তাকে সযত্নে, ধীরে ধীরে পরিয়ে দিল রানা। মনটা খারাপ হয়ে গেছে ওর। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসছে বার বার। ভাবছে, মেয়েটা ঠিক যখন উপলব্ধি

করল যে ও তার পাপাকে ভালবাসে, ড্রাগসের অভিশাপ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য কারও সাহায্য দরকার তার, ঠিক তখনই একটা বুলেট তার প্রাণ কেড়ে নিল।

নাহ্, এ মস্ত অন্যায়!

বুলেটের ক্ষতটায় বৃষ্টির পানি লাগায় কর্নেল হুদার চওড়া বাম কাঁধটা হু-হু করে জ্বালা করছে। দাঁতে দাঁত পিষছে ও—মর শালা বাঙ্গালীর বাচ্চা, মর মর মর! ও ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি হারামীটার কাছে পিস্তল আছে! আর কী দুর্ভাগ্য, রানা গুলি করবার একটু পরেই তার নিজের পিস্তল জ্যাম হয়ে গেল!

ইচ্ছে ছিল, সারাটা রাত অন্ধকার সৈকতে রানার সঙ্গে ইঁদুর-বিড়াল খেলবে, কিন্তু প্রতিপক্ষের কাছেও পিস্তল আছে জানবার পরমুহূর্তে সিদ্ধান্তটা বাতিল করে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন ছাড়া উপায় ছিল না তার। এই লোকটা সম্পর্কে পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর আর সবার মত ওর মনেও রয়েছে অহেতুক, প্রচণ্ড ভীতি।

রানা কি তাকে এখনও অনুসরণ করছে? মনে হয় না। শেষ গুলির শব্দটা অনেকক্ষণ আগে শোনা গেছে, অন্তত মিনিট তিনেক তো হবেই।

রণকৌশলে একটা নয়, কয়েকটা ভুল করেছে ও, নিজেকে মনে করিয়ে দিল কর্নেল হুদা। সৈকতের কাছে পৌঁছানোর পর প্রথমেই উচিত ছিল তিসতার লাল মার্সিডিজটা খুঁজে বের করা, তাতে কিছু একটা কারিগরি ফলিয়ে রাখা। তা হলেই রানার পালানোর পথ বন্ধ হয়ে যেত।

আরেকটা ভুল, সঙ্গে ব্যাকআপ না রাখা।

রানাকে নিরস্ত্র মনে করাটাও ছিল স্রেফ গাধামি।

এখন আর মার্সিডিজটাকে খুঁজে বের করবার সময় নেই।

ঝুঁকিটা নিলে রানার হাতে মারা পড়বার সমূহ সম্ভাবনা আছে। শারমিনের বাগানবাড়ি থেকে যে-লোক সহজেই পালাতে পেরেছে তাকে হালকাভাবে নেওয়াটা মারাত্মক বোকামি হয়ে যাবে।

তবে নিজের বুদ্ধির খানিকটা তারিফও করল কর্নেল হুদা। আচ্ছা, তিসতার তা হলে ধারণা ছিল পাহাড়-প্রাচীর ঘেরা সৈকতের কথা তাকে বলেনি ও! অবশ্যই বলেছে, ওটা তার ছোটবেলার পুতুল খেলবার জায়গা ছিল। বড় হওয়ার পর দু'একজন পুরুষকেও ওখানে নিয়ে গেছে ও। নেশার সময় কী বলেছে মনে রাখতে না পারাটাই তো স্বাভাবিক।

এক অর্থে তিসতার চলে যাওয়াটা দুঃখজনক। ও যদি প্রথমে বাঙালীটাকে মারতে পারত, এখন হয়তো বেঁচে থাকত তিসতা। তবে ওর এত সব বেফাঁস কথা তার মাথাটা গরম করে তোলে। তার গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। তিসতাকে খুন করে বসে ও। রানাকে নয়।

হুদা প্রায় ভালই বেসে ফেলেছিল তাকে। অন্তত মেয়েটিকে নিয়ে যা যা করা যেত, সবই খুব উপভোগ করেছে ও।

তিসতা মারা গেল রানার জন্য। তাকেই গুলি করেছিল ও, সে সরে যাওয়ায় লাগল তিসতাকে।

এর মাসুল অবশ্যই দিতে হবে ওই বাঙালী বদমাশটাকে।

স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল হুদা। হাতে বেশি সময় নেই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লেমিয়েথনার উদ্দেশে রওনা হতে হবে তাকে।

তবে তার আগে প্রথমে নিজেদের ডাক্তারকে দিয়ে কাঁধের গুলিটা বের করতে হবে। তারপর রেডিও অন করে জেনারেল উ নিমুচির সঙ্গে কথা বলবে ও।

কর্নেল হুদা চাইছে জেনারেল যেন তাদের কোম্পানির গার্ডদের রোড ব্লক তৈরি করবার নির্দেশ দেন। সম্ভব হলে

একজোড়া হেলিকপ্টার নিয়ে নজর রাখতে হবে রাস্তাগুলোর উপর—কারণ রানা ও থোন ফালান কোন্ পথ ধরে লেমিয়েথনায় পৌঁছাতে চেষ্টা করবে সেটা কারও জানা নেই।

আপনমনে হাসছে কর্নেল হুদা। কয়েকটা শব্দ মুখস্থ করে রেখেছে ও : হক মাওলা... বেল্ট... থোন ফালান... ম্যাডাম ইরাবতি...

পার্টি ভেঙে গেছে। তিসতার লাশ রাখা হয়েছে দোতলায়, তার বেডরুমে।

শোকে ও হতাশায় মুষড়ে পড়েছেন দায়েম সিতওয়ে। দগ্ধ হচ্ছেন অবিশ্বাস, সন্দেহ ও ঘৃণায়। আত্মধিক্কারে জর্জরিত। তাঁর ভিতর একটা ক্রোধ জমছে, ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে প্রতিশোধ গ্রহণের জিদ।

তাঁর পাশে পাথুরে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, শুধু চোখ দুটো দেখলে বোঝা যায় সেখানে সহানুভূতির কোনও অভাব নেই। কী ঘটেছে অন্তত তিনবার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছে ও। ওদের কথার মাঝখানে না ডাকতেই হাজির হয়েছে থোন ফালান, মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেঃ বাগানের ভিতর এক লোককে দেখেছে ও, সারাক্ষণ রানার উপর নজর রাখছিল; পরে একটা নীল পাজেরো জিপে চড়ে রানা ও তিসতার পিছু নেয়।

খোঁজ নিলেন সিতওয়ে। বাড়ির গার্ডরা জানাল, পার্টিতে একটাই নীল পাজেরো এসেছিল, সেটা তিসতার এক নতুন বন্ধু কর্নেল আজমল হুদার।

আর রানা তাকে জানাল, তিসতার বাহুর উপরদিকে সুইয়ের দাগ আছে।

'এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না!' বললেন সিতওয়ে, এবার

নিয়ে বোধহয় দশবার। 'হ্যাঁ, ওয়াইল্ড হয়ে উঠেছিল, জানতাম সেটা। বাট ড্রাগস!' মাথার এলোমেলো চুলে দ্রুত আঙুল চালালেন তিনি। 'ঈশ্বর সাক্ষী, ওই পাকিস্তানী অভিশাপ সম্পর্কে ওকে আমি সাবধান করেছি। কিন্তু ড্রাগের বদলে তিসতা তাকে ইনফরমেশন সাপ্লাই দেবে, এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না। এ অসম্ভব। একেবারেই অসম্ভব!'

'দাগগুলো দেখেছেন আপনি,' শান্তকণ্ঠে বলল রানা। 'আপনার ডাক্তার বন্ধু এসে পরীক্ষা করেও ওই একই কথা বলবেন। ব্যাপারটা তিসতাই আমাকে জানিয়েছে। আমাকে ও মিথ্যে বলবে কেন... কিংবা আমিই বা কেন আপনাকে মিথ্যে বলতে যাব?'

বাতাসে হাত ছুঁড়লেন সিতওয়ে আরাকানী। 'আমার তথ্য কীভাবে ও পাচার করে? আমি খুব ভাল করে জানি আমার মেয়ে আমাকে ঘৃণা করত না।'

'তিসতা ভালবাসত আপনাকে,' বলল রানা। 'কঠিন একটা সময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল ও, অসহ্য একটা যন্ত্রণায় ভুগছিল, নিজের ওপর কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না–এগুলো আপনাকে বুঝতে হবে। নিজের অপরাধ আমার কাছে স্বীকার করতে প্রচণ্ড সাহস দরকার হয়েছে তার। আমাকে বলেছে: কারণ আপনাকে ভালবাসত ও।'

কথাটা শুনে হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছেন সিতওয়ে। তারপর কিছুটা সামলে নিয়ে বলেছেন, 'হ্যাঁ, বলেছে বটে আপনাকে, কিন্তু কী লাভ হলো তাতে? এখন ও কোথায়?' গলা চড়ল সিতওয়ের। 'না আপনি তাকে সৈকতে নিয়ে যান, না তাকে পাকিস্তানী হারামজাদার গুলি খেয়ে মরতে হয়...'

'থামুন, সিতওয়ে!' ভারী গলায় বলল রানা। 'আপনি ভাল করেই জানেন, আমি নই, তিসতাই আমাকে সৈকতে নিয়ে

গিয়েছিল। আমার সঙ্গে কথা বলার দরকার ছিল তার, যেহেতু আপনার সঙ্গে কথা বলতে বাধা অনুভব করছিল। যা ঘটেছে সেজন্যে আমি দুঃখিত। তবে আমাকে দায়ী করাটা অন্যায়। যেমন অন্যায় এই সিদ্ধান্তে আসতে চেষ্টা করা যে, তিসতা এরকম একটা মেয়ে কার দোষে হলো।'

স্থির হয়ে গেলেন সিতওয়ে। 'আপনি বলতে চাইছেন যে আমি...?'

'কী বলতে চেয়েছি ভুলে যান। এটা ঝগড়া করার সময় নয়, কারণ আমরা একটা ইমার্জেন্সির মধ্যে আছি। তিসতা মারা গেছে। কোনও কিছুই তাকে আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না।' কঠিন হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রানা। 'এসপিওনাজকে পেশা হিসেবে আপনি নিজেই বেছে নিয়েছেন, মিস্টার সিতওয়ে। এরকম ঝুঁকি প্রথম থেকেই ছিল, আপনি জানতেন।'

মাথা নত করলেন সিতওয়ে আরাকানী। 'হ্যাঁ, জানতাম।'

'কাজেই যে দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন সেটা পালন করুন,' বলল রানা। 'তথ্যগুলো নিশ্চয়ই কাজে লাগাবে কর্নেল হুদা। শারমিনের সরানো ডকুমেন্ট সম্পর্কে জেনারেল উ নিমুচিকে অবশ্যই অ্যালার্ট করবে ও। আর জেনারেল নিমুচি তাদের কোম্পানির লোকজন পাঠিয়ে বাধা দেবে, আমরা যাতে লেমিয়েথনায় না পৌঁছাতে পারি।'

'আমরা পোয়া মোয়া জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাব,' বললেন সিতওয়ে। 'ওদের মত সবুজ ইউনিফর্ম পরে, দেখতে পেলে ওরা যাতে আমাদেরকে নিজেদের লোক বলে ভুল করে।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' নরম সুরে বলল রানা। 'কিন্তু মেয়েকে ফেলে আপনি কোথাও যাবেন না।'

'আমি কোথাও যাব না...আমাকে তা হলে কী করতে বলেন?' জানতে চাইলেন সিতওয়ে। 'আমি প্রতিশোধ নিতে চাই।'

‘প্রথম কাজ, তিসতার জন্য ভাল একটা ব্যবস্থা করবেন,’ বলল রানা। ‘বলবেন কোথাও চলে গেছে ও, কিংবা আপনার যা খুশি, শুধু কেউ যেন জানতে না পারে কী হয়েছে তার–বিশেষ করে পুলিশ ও সামরিক জান্তার লোকজন। এরপর নিজের সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট...’

অ্যাকশনে সিতওয়ে আরাকানীর কী ভূমিকা হবে তা-ও ব্যাখ্যা করল রানা, ততক্ষণে বৃষ্টিস্নাত ইয়াংগনে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে।

রানার নির্দেশে বৃষ্টি মাথায় করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল থোন ফালান। ভোর হওয়ার পরপরই ফিরে এল ও, আসবার পথে হোটেল থেকে রানার কিছু দরকারী জিনিসও নিয়ে এসেছে।

এত কিছুর মধ্যেও দু'ঘণ্টা সময় বের করে ঘুমিয়ে নিল রানা। ঘুম থেকে ওঠার পর শাওয়ার সারল। তাজা ও ঝরঝরে হয়ে গেল শরীরটা।

আরও প্রায় দু'ঘণ্টা ব্যয় হলো বন্ধুবর এয়ার কমোডর হুনান হো-র সঙ্গে কথা বলতে। রেন্ট-আ-কার থেকে সাদা একটা টয়োটা ভাড়া করল রানা, তুফান বেগে ইয়াংগনের দক্ষিণে চলে এল। চিনাদের তৈরি সেই সামরিক বিমান ঘাঁটিতে ওর জন্য অপেক্ষা করছিল হো। ওকে নিয়ে সোজা কমিউনিকেশন সেকশনে চলে এল ও। সারি সারি কমপিউটার, রেডিও, ট্র্যান্সমিটার ইত্যাদি নিয়ে প্রচুর লোক কাজ করছে চারপাশে। শুধু চিনা নয়, স্থানীয় কিছু বার্মিজকেও দেখল রানা।

চার প্রস্থ কাঁচ দিয়ে ঘেরা একটা অফিসে ঢুকে রানাকে বসাল হুনান হো। ‘টেলিফোনে তো কিছুই বললি না। কী ব্যাপার বল্ তো? ওদিকে আমাদের ইন্টেলিজেন্সের ডেপুটি চিফ লিউ ফু-চুংও চিন্তায় আছেন তোর জন্যে। আমাকে বললেন...’

‘বিপদে পড়ে এসেছি, দোস্ত,’ তাকে বলল রানা। ‘দেখি

পাখির চোখ দিয়ে কী দেখাতে পারিস তুই আমাকে।'

পরিস্থিতি সম্পর্কে হো-কে একটা ধারণা দিল রানা। তারপর হো-র কাছ থেকেও স্থানীয় আইনশৃংখলা, রাজনীতি, বিশেষ কিছু এলাকা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করল।

আলাপের ফাঁকেই কয়েক জায়গায় ফোন করল হুনান হো। ধীরে ধীরে গম্ভীর হয়ে উঠল তার চেহারা, কোঁচকানো ভ্রূ নিয়ে সন্দেহভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। তার সেই দৃষ্টি খানিক পর উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস না করে পারল না রানা।

ফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে হুনান হো পাল্টা প্রশ্ন করল ওকে। 'তোর কোনও ধারণা আছে কার সঙ্গে লাগতে গেছিস?'

'মানে?'

হো রীতিমত অসন্তুষ্ট। 'আগেই আমাকে তোর জানানো উচিত ছিল, রানা।'

আকাশ থেকে পড়ছে রানা। 'কী জানানো উচিত ছিল?'

'এই যে, আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসক জেনারেল উ নিমুচির সঙ্গে তোর মারাত্মক বিরোধ দেখা দিয়েছে।'

'মানে? কী বলছিস!'

'জেনারেল তাঁর প্রাইভেট কোম্পানির লোকদের নির্দেশ দিয়েছেন লেমিয়েথনার দিকে যাবার সবগুলো পথে যেন রোডব্লক তৈরি করা হয়। চেহারার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন বাংলাদেশী নাগরিক মাসুদ রানাকে পেলে অ্যারেস্ট করতে হবে, তারপর কোমরে রশি বেঁধে নিয়ে যেতে হবে তাঁর অফিসে। ওটা হেনযাদা ক্যান্টনমেন্ট, রানা। অ্যারেস্ট করে যাকেই ওখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, হয় সে জ্যান্ত ফেরেনি, নয়তো বাকি জীবন আধমরা হয়ে বেঁচে থেকেছে। থোন ফালান কে?'

‘আমার পরিচিত এক লোক।’

‘তোর সঙ্গে তাকেও গ্রেফতার করতে বলা হয়েছে,’ জানাল হো, তারপর জিজ্ঞেস করল, ‘এ-সবের মানে কী, রানা? জেনারেল নিমুচির ভাইপো উ থুইমুইকে খুন করল কে?’

‘আমি তোকে পিসিআই কর্নেল আজমল হুদা সম্পর্কে বলেছি,’ বলল রানা। ‘এই লোকের বিজনেস পার্টনার হলো জেনারেল নিমুচি। আমার সন্দেহ এরা দুজন মিলে খুব বড় ধরনের বেআইনী কোনও কাজ করতে যাচ্ছে। হয়তো শারমিনের ডকুমেন্টটা পেলে পুরো ব্যাপারটা কী, জানা যাবে। আমার ধারণা, ওটা নিয়ে পালাবার সময় শারমিনই থুইমুইকে খুন করেছে।’

‘ও, আচ্ছা, কিছুটা অন্তত পরিষ্কার হলো,’ বলল হো। ‘তবে তোদের এই ব্যাপারটা অসম একটা প্রতিযোগিতার মত লাগছে আমার। ওদের সঙ্গে একা তুই কী করবি? জানিস না, জেনারেল উ নিমুচি সম্পর্কে বলা হয় তাঁকে ঘাঁটাবার সাহস করবে এমন লোক মায়ানমারে এখনও জন্মগ্রহণ করেনি?’ শেষদিকে তার বলার ভঙ্গিতে শ্লেষ ফুটে উঠল, ‘তারচেয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যা, অন্তত পৈত্রিক প্রাণটা তো বাঁচবে!’

পরস্পরকে খুব ভাল করে চেনে ওরা, কাজেই রানা জানে ওর সঙ্গে কৌতুক করছে হো। ‘দুঃখিত, বন্ধু, তোর সময় নষ্ট করলাম। ঠিক আছে...’ বিদায় নেওয়ার জন্য চেয়ার ছাড়ল ও।

‘থাম, ব্যাটা, চুপ করে বস্!’ ধমক লাগাল হো। তারপর নিচু গলায় বলল, ‘তুই চাস ফু-চুং আমাকে কান ধরে ওঠ-বস করাক?’ দেরাজ খুলে একটা ম্যাপ বের করল। সেটার গায়ে ছোট একটা বৃত্ত আঁকল ও, তারপর রানার হাতে ধরিয়ে দিল।

‘এই হচ্ছে তোর পিক-আপ পয়েন্ট,’ বলল ও। ‘ইয়াংগন থেকে পঁচিশ কিলোমিটার উত্তরে-পশ্চিমে। ম্যাপে নম্বর দেয়া আছে, ওগুলো ধরে খুঁজতে হবে–সাত ও আটের মাঝখানে।

ওখানে একটা গর্ত আছে, জঙ্গলের মাঝখানে ফাঁকা জায়গা–দেখতে না পাবার কোনও কারণ নেই। তা ছাড়া, কপ্টারের আওয়াজ তো শুনতে পাবিই। আমার সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও দক্ষ পাইলট চৌ চি-কে পাঠাব।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, হো।'

'একটু পরে ধন্যবাদ দে,' বলল হো। 'তার আগে, চল, তোকে এক জায়গায় নিয়ে যাই।'

রানা অবাক। মাথা নাড়ল। 'দুঃখিত, দোস্ত, আমার হাতে সময় একদম নেই। আরেকদিন...'

'আরে, গর্দভ, আগে শোন! প্রধান সামরিক প্রশাসকের পি.এস. আমার সঙ্গে প্রতিদিনই দাবা খেলতে আসেন। তাঁকে যদি কনভিন্স করতে পারিস...'

'কোথায় যেতে হবে, কতদূরে?' দ্রুত জানতে চাইল রানা।

'এই তো কাছেই তাঁর বাড়ি, এখন গেলে পাওয়া যাবে,' বলল হো। 'যাবি?'

কী ভেবে রাজি হয়ে গেল রানা। গিয়ে দেখল প্রধান সামরিক প্রশাসকের প্রাইভেট সেক্রেটারি অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির একজন মানুষ। তবে বোঝা গেল হুনান হোর সঙ্গে আসায় রানাকে খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করলেন ভদ্রলোক।

ধীরেসুস্থে সব কথা বোঝাতে চেষ্টা করল রানা। হাবভাব দেখে মনে হলো ভদ্রলোক বুঝলেনও। চোখ দুটো তাঁর বড় বড় হয়ে উঠল। বললেন, 'দেখি কী করা যায়, আমি আমার সাধ্যমত করব।'

ফেরার পথে হোকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'দোস্ত, ভদ্রলোকের দৌড় কতদূর?'

হো উত্তর দিল, 'ওঁর সঙ্গে দাবায় আমি একদিনও জিততে পারিনি। প্রধান সামরিক প্রশাসক ওঁর কথায় ওঠেন আর বসেন।

ধরে নে দেশটা আসলে তিনিই চালান।'

'তা হলে বিপদের সময় সাহায্য চাইলে পেতেও পারি, কি বলিস?'

'যদি পাস, এমনিতেই পাবি; আর চাইতে হবে না।'

এরপর অন্য প্রসঙ্গে আলাপ করল ওরা।

হো বলল, 'তুই-ই ঠিক করবি আমার পাইলট চৌ চি তোদেরকে ঠিক কোথায় পৌঁছে দেবে।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে।'

'আরেকটা ব্যাপার ভেবে দেখতে পারিস,' বলল হো। 'আমাদের দুটো কনভয় ইয়াংগন থেকে রওনা হচ্ছে, যাবে ওই উত্তরেই। একটা যাবে আমাদের এক ফিল্ড হসপিটালে–মেডিকেল সাপ্লাই, কিছু রোগী, একদল নার্স ও ডাক্তারকে পৌঁছে দেয়ার জন্যে। আরেকটা যাবে পাইলট ও ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে ম্যান্ডালে এয়ারপোর্টে। ভেবে দেখ্, দুটোর কোনওটার সঙ্গে তোরা থাকবি কি না। চিনাদের কোনও কনভয়কে দাঁড় করানোর সাহস কারও হয় না সাধারণত, চেক করা তো দূরের কথা। দুটো কনভয়ের যে-কোনটার সঙ্গে দশ কিলোমিটার পর্যন্ত থাকতে পারবি। বাকি পনের কিলো নিজেদের চেষ্টায় পার হতে হবে।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে, তা হলে তো খুবই ভাল হয়,' বলল রানা, তারপর জানতে চাইল, 'প্রথম কনভয়টা কখন রওনা হবে?'

সামরিক বিমানবাহিনীতে ফিরে আবার ফোনে কারও সঙ্গে কথা বলল হুনান হো, তারপর রানাকে জানাল, 'সাপ্লাই ও রোগী নিয়ে প্রথম কনভয় এই মুহূর্তে রওনা হচ্ছে। দ্বিতীয়টা রওনা হতে দেরি আছে, আরও তিনঘণ্টা পর।'

মাথা নাড়ল রানা। 'তিন ঘণ্টা দেরি হয়ে যায়,' বলল। 'জানি অনেক বেশি দাবি করা হয়ে যাচ্ছে, তবু বলছি–প্রথমটাকে একটু অপেক্ষা করিয়ে রাখা যায় না, আমি ইয়াংগনে না ফেরা পর্যন্ত?'

'কথা বলে দেখি,' বলল হো, আবার টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল। এবার বেশ লম্বা সময় নিল ও। রিসিভার রেখে দিয়ে হাসিমুখে রানার দিকে তাকাল। 'ওদেরকে আমি অপেক্ষা করতে বলে দিয়েছি।' হাতঘড়ির উপর চোখ রাখল ও। 'তোদেরকে এক ঘণ্টার মধ্যে থান্ট স্কয়্যার-এ পৌঁছাতে হবে। পারবি না?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। হো-র অফিস থেকেই থোন ফালানকে ফোন করে বলে দিল ও কোথায় পৌঁছাতে হবে তাকে।

চল্লিশ মিনিটের মাথায় ইয়াংগনে ফিরে রেন্ট-আ-কার কোম্পানিতে সাদা টয়োটা ফেরত দিল রানা। তারপর একটা ট্যাক্সিতে চড়ল, ড্রাইভারকে বলল, 'পুতাও স্ট্রিট, প্লিজ।'

আরও বিশ মিনিট পর অন্য আরেক ট্যাক্সি থেকে থান্ট স্কয়্যারে নামল রানা, চিনা কনভয়ের কাছে।

পুরানো একটা পিকআপ ভ্যান নিয়ে আশপাশে কোথাও অপেক্ষা করছিল থোন ফালান, রানাকে দেখতে পেয়ে সেটা থেকে নেমে ওর পাশে চলে এল ও, কাঁধে বড়সড় একটা চামড়ার ব্যাগ।

ব্যাগে কী আছে জানে রানা। ফালানকে দিয়ে ও-ই কিনিয়েছে জিনিসগুলো। রানা এজেন্সির ইয়াংগন শাখা ও নিজের হোটেল স্যুইট থেকেও কিছু জিনিস আনিয়েছে।

পিক আপ ভ্যান নিয়ে ফিরে যাচ্ছে মাইদ দেভাই, হাত নেড়ে বিদায় জানাল ওদেরকে।

কনভয়ের কমান্ডার, চিনা লেফটেন্যান্ট তিয়েন লাই, রানার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল। ইঙ্গিতে একটা ট্র্যান্সপোর্ট ট্রাকে উঠতে বলল ওদেরকে, তারপর কনভয়ের মাথার দিকে এগোল প্রথম ভেহিকেলের ড্রাইভারকে বিশেষ কিছু বলবার জন্য।

ট্রাকের দরজা খুলে উঠে পড়ল রানা, ওর পিছু নিয়ে

ফালানও।

একচল্লিশ নম্বর পুতাও স্ট্রিট।

একতলার স্টাডিরুমে রয়েছেন সিতওয়ে আরাকানী। বাগানের দিকের খোলা জানালা দিয়ে দেখতে পেলেন তাঁর জুনিয়র বন্ধুকে। কখন ফিরেছে ও, কে দরজা খুলে দিয়েছে, কিছুই তাঁর জানা নেই। তরুণ বন্ধুটি বাগানে ঢুকে বেছে বেছে সাদা কয়েকটা গোলাপ তুলছে।

বাগান থেকে সোজা দোতলায় উঠে গেল রানা। চওড়া করিডরে দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছছে বাড়ির পুরানো কাজের লোকেরা। তিসতার কামরাটা বন্ধ, তবে দরজায় তালা দেওয়া হয়নি। কবাট খুলে ভিতরে তাকাল রানা।

এটা তার নিজের বেডরুম, চাদরের তলায় শুয়ে রয়েছে তিসতা আরাকানী। জানে না খানিক পর লিমাযিনে তুলে একটা হলিডে রিসর্ট-এ নিয়ে যাওয়া হবে তাকে। ওখানে কোনও এক সময় তার বিশ্রামের জায়গাটাকে চিহ্নিত করা হতে পারে সাধারণ একটা গ্রেইভস্টোন দিয়ে। কিংবা তা না-ও করা হতে পারে। তার পাপা এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেননি।

নিঃশব্দ পায়ে কামরার ভিতরে ঢুকল রানা। ক্লান্ত পায়ে বেডের পাশে এসে দাঁড়াল, হাতের ফুলগুলো নামিয়ে রাখল লাশের পাশে চাদরের উপর। বারবার করে শুধু একটা কথাই মনে পড়ছে ওর, মেয়েটি ভাল হতে চেয়েছিল, সমস্ত ক্লেদ ধুয়ে-মুছে জীবনটা শুরু করতে চেয়েছিল নতুন করে।

তাকে রানা কথা দিয়েছিল সাহায্য করবে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরল ও, কামরা থেকে মাথা হেঁট করে বেরিয়ে আসছে ব্যর্থতার গ্লানিতে ম্রিয়মান একজন মানুষ।

থান্ট স্কয়্যার থেকে রওনা হলো চিনাদের কনভয়।

ফালানের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে রানা দেখল, পেশল হাত দুটো ঝুলছে শরীরের দু-পাশে; বারবার খুলছে ও মুঠো পাকাচ্ছে লোকটা। সন্দেহ নেই খুব ভয় পাচ্ছে ফালান। তবে ভয়টা নিজের জন্য নয়, ভাবল ও, ম্যাডাম ইরাবতির জন্য। তার মনে সংশয় আছে সময়মত তারা লেমিয়েথনায় পৌঁছাতে পারবে কি না।

কর্নেল আজমল হুদার রণকৌশল সম্পর্কে এরইমধ্যে একটা ধারণা পেয়েছে রানা। সৈকতে তিসতাকে খুন করবার পর শহরে ফিরেই বিজনেস পার্টনার জেনারেল উ নিমুচিকে পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে ও।

জেনারেলকে বোঝানো হয়েছে, কোনওভাবেই রানা যাতে লেমিয়েথনায় পৌঁছাতে না পারে। রানা তাদের জন্য বিপদ, এটা ধরে নিয়ে জেনারেলও রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড দেওয়ার নির্দেশ জারি করতে দেরি করেনি।

রানার আশঙ্কা, সবচেয়ে বড় বিপদে পড়বেন বৃদ্ধা ইরাবতি। সিতওয়ে আরাকানী ওকে জানিয়েছেন, জেনারেল নিমুচি তাঁর এই মামাতো বোনটির উপর বহুদিন ধরেই অত্যাচার করে আসছে। এবার শারমিন কোথায় আছে, তার কাছ থেকে পাওয়া ডকুমেন্টটা কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে ইত্যাদি প্রশ্ন তুলে নতুন করে শুরু হবে নির্যাতন।

আর কর্নেল হুদা? সে কী করবে? সে কি রানার আগে লেমিয়েথনায় পৌঁছাতে চেষ্টা করবে, নাকি অসমাপ্ত কাজটা শেষ করবার আশায় পিছু নেবে রানার?

বৃষ্টি ভেজা শহরতলীকে পিছনে ফেলে, হাইওয়ে ধরে ছুটে চলেছে কনভয়। চিনা পাইলট ও ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে চুপচাপ বসে আছে রানা ও ফালান।

রাজধানী ইয়াংগন। পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স পরিচালিত একটা ক্লিনিক।

বাম কাঁধ থেকে বুলেটটা বের করবার সময় পরিচিত ডাক্তার সাবধান করে দিয়ে বললেন, 'অন্তত এক হপ্তা কমপ্লিট বেড রেস্ট নেবেন। এই ক্ষত নিয়ে নড়াচড়া করলে আপনার কপালে খারাবি আছে, কর্নেল।'

তাঁর কথার জবাব না দিয়ে ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে এসে পাজেরোয় উঠল হুদা। এটা তাদের জীবনমরণ সমস্যা, যেভাবেই হোক শারমিনের সরানো ডকুমেন্টটা ফেরত পেতে হবে। তা না হলে কয়েক হাত ঘুরে ঠিকই ওটা বাংলাদেশ সরকারের কাছে পৌঁছে যাবে। ব্যস, তা হলেই সব শেষ।

ডকুমেন্টটা লেমিয়েথনায়, শারমিনের চাচী ইরাবতি ম্যাডামের কাছে আছে; এই ম্যাডামকে জেনারেল নিমুচি খুব ভালভাবে চেনেন। বাংলাদেশের তরফ থেকে ডকুমেন্টটা সংগ্রহ করবার জন্য ওই বুড়ির কাছেই যাচ্ছে রানা। পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে জেনারেল নিমুচিকে। সে তাকে আশ্বস্ত করে বলেছে, রানা কেন, একটা পিঁপড়েকেও লেমিয়েথনার ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেওয়া হবে না।

তবে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব দুর্বল। কারণ তাদের প্রাইভেট কোম্পানি মিউচুয়াল ভেঞ্চারের রেডিও কমিউনিকেশন সিস্টেম এখনও সব জায়গায় পুরোপুরি কাজ শুরু করেনি। একটা পাবলিক কোম্পানির সশস্ত্র গার্ডদের সরকারী রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা ও তল্লাশির নির্দেশ দিচ্ছেন একজন আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসক, এটা আইনের দৃষ্টিতে বেআইনী। তাই ল্যান্ড কিংবা মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে নিষেধ করে দিয়েছেন জেনারেল নিমুচি।

নিজের সঙ্গে দুজন পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্ট অপারেটরকে রেখেছে কর্নেল হুদা, বডিগার্ড ও ড্রাইভার হিসাবে।

পাজেরোর ব্যাকসিটে কাত হয়ে শুয়ে থাকল কর্নেল হুদা, মরফিন ইঞ্জেকশন নেওয়ায় আহত কাঁধটা পাথরের মত ভারী হয়ে আছে। গাড়ি ছেড়ে দিল ড্রাইভার। চোখ বুজল ও। ঠিক এই সময় কোটের পকেটে বেজে উঠল সেল ফোনটা।

এত সকালে কে তাকে ফোন করল! সেটটা বের করে নম্বরটা দেখল হুদা। চোখে-মুখে বিরক্তির ছাপ ফুটল। সেট অফ করে দিতে যাচ্ছিল, কী মনে করে অন করে কানে ঠেকাল। 'এই অসময়ে কী?' কর্কশ সুরে ধমক লাগাল হুদা।

'ও লা লা, যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর!' নিদানি থুয়ের সকৌতুক কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'আমি জরুরি একটা কাজের মধ্যে আছি, নিদানি,' গলা একটু নরম করে বলল কর্নেল হুদা। 'গুরুত্বপূর্ণ কিছু না হলে এখন রাখি, পরে কথা হবে, ঠিক আছে?'

'না, জাঁহাপনা, ঠিক নেই। আগে বলো, টাকার আরেকটা বান্ডিল আমাকে না দিয়েই পার্টি ছেড়ে পালিয়ে গেলে কী মনে করে?'

'ও, এই ব্যাপার। আবার যখন দেখা হবে পেয়ে যাবে ওটা...'

'এই, লাইন কেটো না!' তাড়াতাড়ি বলল নিদানি।

'আবার কী?' বিরক্তির সঙ্গে জানতে চাইল হুদা।

'আ-মি জা-নি!' সুর করে বলল নিদানি।

'মানে? কী জানো?'

'জা-নি ও এ-খ-ন কো-থা-য় আ-ছে।'

'উফ্! কে?' তারপরই আড়ষ্ট হয়ে গেল হুদা, নিদানি কার খবর দিতে চাইছে আন্দাজ করতে পারছে ও।

'মাসুদ রানা।'

'মানে?'

‘ঠিক এই মুহূর্তে মাসুদ রানা এখন কোথায়, আমি জানি,’ ধীরে ধীরে বলল নিদানি।

‘এটা দারুণ কোনও খবর হলো না,’ বলল হুদা। মুখে যাই বলুক, হার্টবিট বেড়ে গেছে তার, মুঠো ফোন আরও জোরে চেপে ধরল। ‘কোথায়?’

‘আড়াই হাজার মার্কিন ডলার, কর্নেল। এক কানাকড়ি কম না।’

‘পাবে,’ রুদ্ধশ্বাসে বলল হুদা। ‘তবে তথ্যটাও সেরকম গুরুত্বপূর্ণ হতে হবে।’

‘রানা এখন ইয়াংগনের দক্ষিণে, চিনাদের তৈরি একটা বিমানঘাঁটিতে, এয়ার কমোডর হুনান হোর সঙ্গে মিটিং করছে।’

‘কেন, ওখানে কী করতে গেছে ও?’

‘ওখানে আমার এক দোভাষী বার্মিজ বান্ধবী আছে, টেলিফোন অপারেটর,’ বলল নিদানি। ‘তোমার আড়াই হাজার থেকে তাকেই দেড় হাজার দিয়ে দিতে হবে।’

‘আমি কী জানতে চাইছি আর তুমি...’

‘রানা ওখানে কেন গেছে তা বিস্তারিতভাবে জানাবার জন্যে দশ মিনিট পর বিমানঘাঁটির বাইরে থেকে আবার আমাকে ফোন করবে ও,’ বলল নিদানি। ‘তবে তার কথা থেকে আভাস পেলাম ইয়াংগন থেকে চিনাদের একটা কনভয় রওনা হবার কথা ছিল, সময়টা এক ঘণ্টার জন্যে পিছিয়ে দেয়া হয়েছে...’

লেমিয়েথনা।

উত্তর-পুবদিকের খেতগুলোয় ধান কাটার কাজ কেমন এগোচ্ছে দেখতে এসেছেন ম্যাডাম ইরাবতি। এসেই মোহাম্মদ দৌলত-এর মুখে শুনলেন তার স্ত্রী লিমা ফারজানা অসুস্থ, কিন্তু ডাক্তারের কথা কানে না তুলে সকাল থেকেই ধান মাড়াইয়ের

কাজে নেমে পড়েছে ও।

খেতের অর্ধেক শ্রমিকই নারী। নারী-পুরুষ একসঙ্গে খেতে-খামারে কাজ করছে, কোথাও কোনও সমস্যা নেই।

এই মুহূর্তে সবাই যে যার নিজের কাজে ব্যস্ত। তারা জানে পালা করে সবার সঙ্গেই কথা বলবেন ম্যাডাম, ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করবেন কে কেমন আছে।

'ওকে বাড়িতে নিয়ে এসো, দৌলত,' বললেন বৃদ্ধা। 'তা না হলে বিশ্রাম নেবে না ও। এখন ওর দরকার বিশ্রাম। দেরি কোরো না, এখনই যাও। নাহিদা-কে সঙ্গে নাও, তোমার বউকে সাহায্য করবে ও।'

'কোন্ বাড়িতে, ম্যাডাম?' সবিনয়ে জানতে চাইল দৌলত। 'আপনার বাড়িতে, নাকি মায়াবতী ম্যাডামের...'

'আমি নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছি, দৌলত,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ইরাবতি। 'জেনারেল উ নিমুচি কাল রাতে টেলিফোন করে বললেন, আমাকে নিজের বাড়িতে দেখতে চান তিনি।'

কৃতজ্ঞচিত্তে মাথা নোয়াল দৌলত, তারপর দ্রুত পা চালিয়ে চলে গেল।

সবচেয়ে কনিষ্ঠ শ্রমিক দোনা ধোইনি-কে একমনে কাজ করতে দেখে হাসলেন ইরাবতি। জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছ, ধোইনি? রাতে পড়াশোনা করছিলে, চালিয়ে যাচ্ছ–?'

মাঝপথে থেমে গেলেন বৃদ্ধা। কিশোর ধোইনি মাথাটা একদিকে কাত করে দূরের কোনও শব্দ শোনার চেষ্টা করছে। শব্দটা ক্রমশ কাছে চলে আসছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে, হয়ে উঠছে পরিচিত। স্থির হয়ে গেলেন বৃদ্ধা।

তাঁর মার্সিডিজটা ফিরে আসছে আবার।

তেরো

হাইওয়ের উপর, একটা ব্রিজের কাছে, দাঁড়িয়ে পড়ল চিনাদের কনভয়। প্রায় নির্জন রাস্তা, দু'পাশে ঘন জঙ্গল, কী ব্যাপার?

ট্রাকের উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে তাকিয়ে ধনুকের মত বাঁকা সামনের রাস্তায় যানবাহনের লম্বা লাইন দেখতে পেল রানা। লাইনের মাথায় কী হচ্ছে বা কী আছে দেখা যাচ্ছে না। খোঁজ নেওয়ার জন্য স্টার্ট বন্ধ করে নেমে গেল ড্রাইভার।

নীরবে দৃষ্টি বিনিময় করল রানা ও থোন ফালান।

পাঁচ মিনিট পর ফিরে এল ড্রাইভার, বলল, 'সামনে রোডব্লক। জেনারেল উ নিমুচির সৈন্যরা হাতে ফটো নিয়ে কাকে যেন খুঁজছে। প্রতিটি গাড়ি সার্চ করছে ওরা।'

আগের চেয়ে জোরে পাম্প শুরু করল রানার হার্ট। ফটোটা আমার, ভাবল ও। কিন্তু জেনারেল নিমুচি সরকারী সৈন্যদেরকে দিয়ে এ কাজ করাবে? ড্রাইভার সম্ভবত বুঝতে ভুল করেছে।

এর কিছুক্ষণ পরেই কনভয় কমান্ডার লেফটেন্যান্ট তিয়েন লাই হাজির হলো। ট্রাকের পিছন দিয়ে উপরে উঠল ও। শান্ত কণ্ঠে, তবে চেহারায় উদ্বেগ নিয়ে, রিপোর্ট করার ভঙ্গিতে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করল সে রানাকে।

'আমাকে ধারণা দেয়া হয়েছিল রোডব্লকে একটা প্রাইভেট কোম্পানির গার্ডরা থাকবে, সরকারী সৈন্য থাকবে না,' বলল সে। 'কিন্তু লাইনের মাথায় দেখে এলাম দু'দলই গাড়ি থেকে নামিয়ে

লোকজনকে সার্চ করছে, একটা ফটোর সঙ্গে কারও চেহারা মেলে কি না পরীক্ষা করে দেখছে। এগিয়ে গিয়ে উঁকি দিতে দেখি ওটা আপনার ফটো। দু'তিনজন বিদেশি সিভিলিয়ানকে দেখলাম, মনে হলো, গোটা ব্যাপারটা তারাই যেন তদারক করছে।

মনে মনে প্রমাদ গুণল রানা। ভাবল, রোডব্লকে কি পিসিআই এজেন্টদেরও রাখা হয়েছে? 'বিদেশি সিভিলিয়ান? কোন্ দেশের লোক তারা, বোঝা যাচ্ছে না?'

'ভারতীয় কিংবা পাকিস্তানী বলে মনে হলো।'

সন্দেহ নেই, ভাবল রানা, কোথাও থেকে খবরটা লিক হয়ে গেছে : ওরা দুজন চিনা কনভয়ে থাকবে। নিদানি থুয়ের চেহারাটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। সে-ই হয়তো খবরটা সংগ্রহ করে কর্নেল হুদাকে জানিয়ে দিয়েছে। অমনি আর দেরি করেনি পাঞ্জাবি খুনিটা, রোডব্লকে পাঠিয়ে দিয়েছে নিজের লোকদের।

তিয়েন লাইয়ের দিকে তাকাল রানা। 'এমন কি মনে হলো যে ওরা আপনাদের গাড়িও সার্চ করবে?'

'করার তো কথা নয়, কিন্তু হাব-ভাব দেখে মনে হচ্ছে করবে,' বলল লেফটেন্যান্ট লাই। 'কারণ গাড়িগুলোকে এক লাইনের দাঁড় করানো হয়েছে দেখে আমি ওদের ক্যাপটেনকে বললাম, সে অনুমতি দিলে কনভয় নিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারি আমরা। উত্তরে সে বলল—সবাইকে নিয়ম ধরে, এক লাইনে আসতে হবে।'

চিন্তায় পড়ে গেল রানা। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরে থোন ফালানও গম্ভীর।

লেফটেন্যান্ট তিয়েন লাইয়ের ভাব দেখে মনে হলো রানা কী বলে শোনার জন্য অপেক্ষা করছে সে।

রানা জানতে চাইল, 'ওরা যদি সার্চ করার জন্যে গাড়ি থেকে আপনাদের সবাইকে নামতে বলে, কী করবেন আপনি?'

শ্রাগ করল লাই। 'প্রতিবাদ করব আমরা। তবে ইনসিস্ট করলে বাধ্য হব নামতে। পরে কর্মকর্তাদের রিপোর্ট করব।'

নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল রানা। 'সেক্ষেত্রে আমাদের সামনে একটা পথই খোলা আছে। সার্চ এখনও শুরু হয়নি, এই সুযোগে ট্রাক থেকে নেমে জঙ্গলে ঢুকে পড়ি আমরা। বাকি পথ হেঁটে যাব।'

মাথা নাড়ল লেফটেন্যান্ট। 'আমার ওপর নির্দেশ আছে, নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দিতে হবে, মাঝপথে কোথাও নামিয়ে দিতে পারব না। মাত্র অর্ধেক পথ পার হয়েছি, এখনও পাঁচ কিলো বাকি।'

'নির্দেশ পালন করতে গিয়ে আপনি আমাদেরকে বিপদে ফেলে দেবেন?'

বিষণ্ন হাসি ফুটল লেফটেন্যান্টের মুখে। 'পেচ্ছাব করার জন্যে কনভয় থেকে আমার কয়েকজন লোক জঙ্গলে ঢুকেছিল, ফিরে এসে বলল সশস্ত্র গার্ডরা টহল দিচ্ছে রাস্তার দু'পাশে। তার মানে এই কনভয় ছেড়ে কোথাও আপনারা যেতে পারছেন না।'

রানা ও ফালান আবার দৃষ্টি বিনিময় করল।

'তা হলে? কী করার কথা ভাবছেন আপনি?' জানতে চাইল রানা।

'ওরা আপনাদেরকে গাড়ি থেকে নীচে নামতে বলতে পারবে না, এমন ব্যবস্থা করতে চাই,' বলল লাই।

'রোগী, স্ট্রেচারে শুয়ে আছি?' আন্দাজ করল রানা।

'শুধু রোগী না, চিনা রোগী,' বলল লেফটেন্যান্ট। 'মেকআপ ব্যবহার করে আপনাকে যতটা সম্ভব চিনা বানিয়ে দেবে আমাদের নার্সরা।'

রানার অতীত অভিজ্ঞতা হলো, মেকআপম্যানরা ওকে চিনা বানাতে হিমশিম খেয়ে যায়, কারণ ওর নাক নাকি অতিরিক্ত

খাড়া। 'কী রকম রোগী হতে চাই আমি বলে দিচ্ছি।'

রানার কথা বলবার ধরন লক্ষ করে হেসে ফেলল লেফটেন্যান্ট লাই। 'বলুন, কী রকম রোগী হতে পারলে আপনি খুশি হন।'

'আমার শরীর ও মুখে লালচে-হলুদ রঙের পুরু প্রলেপ লাগাতে হবে,' বলল রানা। 'এমন রঙ হতে হবে, তাড়াতাড়ি যাতে শুকিয়ে যায়। কোথায় পাবেন?'

'পাব না,' মাথা নাড়ল লেফটেন্যান্ট। 'তবে সাদা, লাল ও সবুজ টুথপেস্ট আছে। ওগুলো মেশালে যে রঙটা পাওয়া যাবে...'

'চলবে, তাতেও চলবে,' বলল রানা। 'শুধু দেখে যাতে মনে হয় শুকিয়ে যাওয়া ক্ষত থেকে নরম, ভেজা ভেজা চামড়া উঠছে। ওই প্রলেপের ওপর আমার হাত, পা, মুখ ও মাথায় ব্যান্ডেজ জড়াতে হবে। ব্যাপারটা যদি এত দূর গড়ায় যে আমার ব্যান্ডেজ খুলে পরীক্ষা করতে চাইল ওরা; একটা করে প্যাঁচ খুলবে, আমিও গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু করব, যেন ব্যথা সহ্য করতে না পেরে তক্ষুনি মারা যাচ্ছি। ব্যান্ডেজের সঙ্গে অদ্ভুত রঙের পেস্ট উঠে আসছে দেখে নিশ্চয়ই ওদের ধারণা হবে আমি জেনুইন রোগী...'

'আইডিয়াটা ভালই মনে হচ্ছে।' খুশি হয়ে মাথা ঝাঁকাল তিয়েন লাই।

'বাকিটুকুর গুরুত্বও কম নয়,' বলল রানা। 'আগুনে পোড়া রোগী, কাজেই আপনাদের একটা অ্যামবুলেন্সে থাকব আমি। আমার সঙ্গে ওখানে থাকবেন একজন নার্স ও ডাক্তার। রোগীর অবস্থা সিরিয়াস বোঝানোর জন্যে তারা দুজনেই যে যার ইউনিফর্ম, হেডড্রেস ও মাস্ক পরে থাকবেন, অন্যান্য ডাক্তারি সরঞ্জামও যেন হাতের কাছে রাখা হয়। সম্ভব?'

'খুবই সম্ভব।' বলল লেফটেন্যান্ট। 'আর কিছু?'

'ওরা আমার নাম জিজ্ঞেস করতে পারে। আমার একটা নাম

দিন,' বলল রানা।

'দিচ্ছি। আর কিছু?'

'আপাতত মনে পড়ছে না,' বলল রানা। 'এবার বলুন, আমার সঙ্গী থোন ফালানের কী হবে।'

'মিস্টার থোন ফালানকে চিনা বানিয়ে নেয়া পানির মত সহজ, দেখে কেউ চিনতেই পারবে না যে তিনি থাই। আমাদের সঙ্গে মিশে থাকবেন, তাঁকে রোগী বানাবার দরকার নেই।'

'ফালান?' তার মতামত জানতে চাইল রানা।

'লেফটেন্যান্ট লাই ঠিক বলেছেন, সার,' বলল ফালান। 'আমি চিনা ভাষাও এক-আধটু জানি।'

আধ মিনিট পর চুপিচুপি ট্রাক থেকে নেমে একটা অ্যামবুলেন্সে গিয়ে উঠল রানা। তল্লাশির কাজ খুব ধীরগতিতে এগোচ্ছে, এতক্ষণে মাত্র দশ গজের মত এগিয়েছে কনভয়।

লাগবে হয়তো তিন কি চারটে, তবে এক ডজেনরও বেশি টুথপেস্ট সংগ্রহ করে পাঠানো হলো অ্যামবুলেন্সে। ব্যান্ডেজের উপরকণ, অন্যান্য ডাক্তারি সরঞ্জামও পৌঁছে দেওয়া হলো। তবে সবার আগে পৌঁছেছে সুন্দরী এক চিনা নার্স ও সুদর্শন এক তরুণ ডাক্তার। দুজনের চোখই কালো।

নার্সের নাম সুজি ওয়াং। ডাক্তারের নাম চোচিন চো।

স্রেফ কৌতূহলবশত খোঁজ নিল রানা, ওরা কি প্রেমিক প্রেমিকা? লজ্জা পেয়ে দুজনেই দ্রুত মাথা নেড়ে জানাল—না, ঠিক তা নয়, তবে পরস্পরকে অনেকদিন হলো চেনে তারা। রানা তাদেরকে মিনিট দুয়েক অভিনয়ের তালিম দিল, বলল, প্রয়োজনের সময় তারা দুজন যদি একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে একটা ডাইভারশন তৈরি করে তা হলে হয়তো বিপদটা কাটিয়ে উঠতে পারবে ও।

এত সব করা হচ্ছে ঠিকই, তবে তিয়েন লাইয়ের মত রানারও

ধারণা তল্লাশি না করেই চিনা কনভয়কে চলে যেতে দেবে জেনারেল উ নিমুচির সৈন্যরা। পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স এজেন্টরা বাড়াবাড়ি করে যদি বলে তারা কনভয়ের গাড়িগুলো সার্চ করতে চায়, ওই সৈন্যরাই তাদেরকে বাধা দেবে।

দেখা যাক।

উল্লাসে অধীর হয়ে কনভয়ের সামনে পায়চারি করছে পিসিআই কর্মকর্তা আজমল হুদা। আনন্দময় প্রত্যাশাটা এত বিরাট, কাঁধের ব্যথাটা ফিরে এলেও সেটাকে তুচ্ছ মনে হচ্ছে তার কাছে।

সুনির্দিষ্ট খবর পেয়েছে হুদা, চিনাদের এই কনভয়ে চড়েই উত্তরদিকে রওনা হয়েছে মাসুদ রানা। ও লা লা-কে পাকিস্তানী সালাম! নিদানিকে সে বলেছে, আরও দু'হাজার ডলার বোনাস দেওয়া হবে পুরস্কার হিসাবে।

হুদার ইচ্ছে ছিল লাইনে দাঁড়ানো বাকি সব গাড়িকে ছেড়ে দেওয়া হবে, সার্চ করা হবে শুধু কনভয়ের গাড়িগুলোকে।

কিন্তু জেনারেল উ নিমুচির অনুমতি পাওয়া যায়নি। কারণ হলো, চিনা বিমানঘাঁটির কমউনিকেশন সেকশন থেকে যে টেলিফোন অপারেটর নিদানিকে তথ্যটা বিক্রি করেছে সেই মেয়েটি আসলে নিমুচিরই রোপণ করা। কাজেই এমন কোনও আচরণ করা চলবে না যাতে কারও মনে সন্দেহ জাগে যে গোপন কোনও খবরের ভিত্তিতে কনভয়কে সার্চ করবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে ইনফরমার হিসাবে মেয়েটির অস্তিত্ব বিপণ্ন হতে পারে।

ভেবেছ চিনা বন্ধুরা তোমাকে লুকিয়ে রাখবে? মনে মনে রানাকে প্রশ্ন করছে আর আপনমনে মাথা নাড়ছে কর্নেল হুদা। কেন, হে, তোমার তো জানার কথা যে, চিন বাংলাদেশের চেয়ে অনেক বড় বন্ধু পাকিস্তানের। বন্ধুত্বের দোহাইয়েও যদি কাজ না

হয়, জেনারেল উ নিমুচির নির্দেশে তো হবে? তখন? ওই প্রাণের দুশমনের খোঁজে প্রয়োজনে প্রতিটি গাড়ির প্রতিটি ইঞ্চি সার্চ করব আমরা।

তারপর কোমরে দড়ি পরিয়ে হেনযাদা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হবে শালা হিন্দুর বাচ্চাটাকে। ওখানে তাকে ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড় করানোর চেষ্টা করব আমরা। তা সম্ভব না হলে ওখান থেকে পালাতে গিয়ে সৈন্যদের গুলি খেয়ে মারা যাবে কাফের বাঙ্গাল।

ধরা পড়বার মুহূর্তে বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে মাসুদ রানা। হয়তো গুলি চালিয়ে পালাবার পথ খুঁজবে। হাসল হুদা। যে-কোনও পরিস্থিতির জন্য সম্পূর্ণ তৈরি আছে তারা।

রোডব্লকের সামনে পৌঁছাতে কনভয়ের সময় লাগল এক ঘণ্টারও কিছু বেশি।

অ্যামবুলেন্সটা কনভয়ের তিন নম্বর গাড়ি। জানালা খোলা থাকায় ব্যান্ডেজে মোড়া রানা স্ট্রেচারে শুয়ে ওদের সব কথাই শুনতে পাচ্ছে।

লেফটেন্যান্ট তিয়েন লাইয়ের সঙ্গে কথা বলছে জেনারেল উ নিমুচির পাঠানো একজন বার্মিজ ক্যাপটেন, লিয়াম উমে।

প্রথমে আনুষ্ঠানিক ভাবে নিজেদের পরিচয় বিনিময় করল তারা।

অ্যামবুলেন্সের ভিতর রানার বুকের রক্ত ছলকে উঠল। কর্নেল হুদা? শুনতে ভুল হয়নি তো? না। ওহ্, গড! খুনিটা নিজে চলে এসেছে! তার মানে নির্ঘাত এয়ার কমোডর হুনান হোর ওখান থেকে লিক হয়ে গেছে ইনফরমেশন। সর্বনাশ, এখন কী হবে!

কুশলাদি বিনিময়ের পর ক্যাপটেন উমে বলল, 'লেফটেন্যান্ট লাই, আমরা এখানে পাকিস্তান দূতাবাসের অনুরোধে এবং জেনারেল উ নিমুচির নির্দেশে রাস্তাটা ব্লক করেছি। মাসুদ রানা

নামে একজন বাংলাদেশীকে খুঁজছি আমরা। তাকে সনাক্ত করার জন্যে এখানে পাকিস্তানে ট্রেড ডেলিগেশনের রেসিডেনশিয়াল প্রতিনিধিরাও উপস্থিত আছেন।'

'বুঝলাম।' তিয়েন লাই ভাব যেন কিছুই বোঝেনি সে। 'কিন্তু কাকে খুঁজছেন না খুঁজছেন তার সঙ্গে আমাদের কনভয়কে দাঁড় করানোর কী সম্পর্ক, সেটা বুঝলাম না।'

'তার বিরুদ্ধে গুরুতর কয়েকটা অভিযোগ রয়েছে,' এমন সুরে বলে চলেছে ক্যাপটেন উমে, যেন লেফটেন্যান্টের কথা শুনতে পায়নি। 'পাঁচজন পাকিস্তানী ট্রেড ডেলিগেটকে গুলি করে মেরেছে সে, তারপর বাড়িটায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তারই প্ররোচনায় জেনারেল নিমুচির ভাইপো উ থুইমুইকে খুন করেছে শারমিন নামে এক বাংলাদেশী স্পাই। এমনকী বিশিষ্ট বার্মিজ ব্যবসায়ী দায়েম সিতওয়ের একমাত্র মেয়ে তিসতাকেও খুন করে লাশটা গুম করে ফেলেছে সে। যার বিরুদ্ধে এতগুলো গুরুতর অভিযোগ, নিশ্চয় আপনিও চাইবেন সেই খুনি ধরা পড়ুক?'

'হ্যাঁ, চাইব; কিন্তু আমরা তো পুলিশ নই,' বলল লাই।

'পুলিশ না হলেও আপনারা সাহায্য করতে পারেন,' বলল বার্মিজ ক্যাপটেন। 'কীভাবে? আমার এই প্রশ্নের জবাব দিয়ে: আপনার কনভয়ে কোনও বাংলাদেশী আছে কি না।'

'জী-না,' বলল লাই। 'আমরা সবাই চিনা।'

'যদি বলি আপনার অজ্ঞাতে কোনও বাংলাদেশী–মানে, ওই মাসুদ রানা–আপনার কনভয়ে উঠে লুকিয়ে আছে?'

'বিশ্বাস করব না।'

'সত্যি মিথ্যে যাচাই করার জন্যে আপনার কনভয় আমরা সার্চ করব,' বলল ক্যাপটেন উমে।

'সে অধিকার বা ক্ষমতা আপনার নেই।'

'এখানে আমি জেনারেল উ নিমুচির অধিকার ও ক্ষমতা

প্রয়োগ করছি,' কঠিন সুরে জবাব দিল বার্মিজ ক্যাপটেন। 'এ-ব্যাপারে যদি সন্দেহ থাকে, রেডিওর অপরপ্রান্তে জেনারেলকে পাওয়া যাবে, সরাসরি তাঁর সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারেন। তবে আগেই সাবধান করে দিচ্ছি, ভাইপোকে হারিয়ে মাথার ঠিক নেই তাঁর, কথাবার্তা একটু বুঝেশুনে বলবেন।' এক মুহূর্তের বিরতি, তারপর আবার বলল সে, 'কর্নেল হুদা, রেডিওটা অন করে লেফটেন্যান্টের হাতে ধরিয়ে দিন, প্লিজ।'

রেডিওতে অতি নম্র ভাষায়, যথাসাধ্য বিনয়ের সঙ্গে জেনারেল উ নিমুচিকে যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করল লেফটেন্যান্ট লাই। বন্ধু হিসাবে মায়ানমারের উপকার করতে এসেছে তারা, কী কারণে একজন অচেনা ও বিদেশি খুনিকে লুকিয়ে রাখতে যাবে? এভাবে অপমান করা হলে বন্ধুত্ব টিকবে কি না সেটা জেনারেল ভেবে দেখতে পারেন।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। জেনারেল নিমুচি সহাস্যে বললেন, 'মাসুদ রানাকে আপনার কনভয়ে পাওয়া না গেলে আপনাদের দূতাবাসে ফোন করে ক্ষমা চেয়ে নেব আমরা। ব্যস, অপমানের ঘা তো মিলিয়ে যাবেই, বন্ধুত্ব আরও টেকসই হয়ে উঠবে।'

অগত্যা খাকি ইউনিফর্ম পরা বার্মিজ সৈন্যদেরকে পথ ছেড়ে দিতে হলো। কনভয়ের প্রথম গাড়ি থেকে আরোহীদেরকে নামবার নির্দেশ দিল তারা।

লেফটেন্যান্ট লাইয়ের নির্দেশে অসন্তুষ্ট চিনারা গোমড়া মুখে নীচে নামল। প্রথমে দেখা হলো তাদের মধ্যে মাসুদ রানা আছে কি না। তারপর গাড়িটায় উঠে সার্চ করা হলো। সরকারী সৈন্যদের সঙ্গে তল্লাশিতে অংশ নিল সশস্ত্র বেসরকারী গার্ডরাও, সবাই তারা বার্মিজ নয়, কিছু পাকিস্তানীও আছে। তাদের সবার পরনে সবুজ রঙের ইউনিফর্ম।

প্রথম তিনটে গাড়ি সার্চ করতে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগল না। এরপর একটা অ্যামবুলেন্স।

'এটা কি খালি?' জিজ্ঞেস করল ক্যাপটেন উমে, বন্ধ জানালার রঙিন কাঁচে থ্যাবড়া নাক ঠেকিয়ে ভিতরটা দেখবার বৃথা চেষ্টা করছে।

'না,' জানাল লেফটেন্যান্ট লাই। 'একজন ডাক্তার ও নার্স আছেন। সিরিয়াস এক রোগীর চিকিৎসা করছেন তাঁরা।'

'সিরিয়াস রোগী?' চোখে সন্দেহ, ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করল কর্নেল আজমল হুদা–তবে লেফটেন্যান্ট লাইকে নয়, ক্যাপটেন উমেকে।

'একটু ব্যাখ্যা করবেন, প্লিজ?' লাইকে অনুরোধ করল উমে।

'এর মধ্যে ব্যাখ্যা করবার কী আছে!' বলল লাই। 'আমাদের এক রোগীকে আমরা ফিল্ড হসপিটালের বার্ন ইউনিটে পাঠাচ্ছি।'

'নাম কি রোগীর?' জিজ্ঞেস করল কর্নেল হুদা।

'ইয়াং ফু।'

'ইয়াং ফু, নাকি মাসুদ রানা? এই রোগীটাকে দেখব আমরা,' নির্দেশের সুরে ক্যাপটেন উমেকে বলল কর্নেল হুদা। উত্তেজনায় তার মুখের গাঢ় তামাটে রঙ কালচে হয়ে উঠেছে। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে, রানাকে সে পেয়ে গেছে।

'আমরা তাকে দেখতে চাই,' লাইকে বলল উমে।

লাইকে দেখে বোঝার উপায় নেই তার ভিতরে কেয়ামত হয়ে যাচ্ছে, সম্পূর্ণ শান্ত সে। 'ঠিক আছে, তবে ডাক্তারের অনুমতি লাগবে।'

'অনুমতি না পেলেও দেখব আমরা,' এবার উমেকে নয়, সরাসরি লাইকে বলল হুদা। 'কারণ আমাদের সন্দেহ হচ্ছে আসল রোগীকে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় শুয়ে আছে খুনি–মাসুদ রানা।'

মনে মনে প্রমাদ গুণল লেফটেন্যান্ট, হায় হায়, এবার কী

হবে! আইডিয়াটা দেখা যাচ্ছে খুবই কাঁচা ছিল, তা না হলে এত সহজে ওরা ধরে ফেলল কীভাবে! আড়ষ্ট ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সে। কথা না বলে সরে দাঁড়াল এক পাশে। ভয় হচ্ছে কথা বলতে চেষ্টা করলে গলা দিয়ে হয়তো কোনও আওয়াজই বেরুবে না।

সৈন্য ও গার্ডদের ঠেলে সামনে এগোল কর্নেল হুদা, তার ঠিক পিছনেই থাকল সশস্ত্র একজন পাকিস্তানী বডিগার্ড। হাতল ধরে টান দিল সে, অ্যামবুলেন্সের দরজা সাবলীলভাবে সরে গেল একপাশে।

অ্যামবুলেন্সের ভিতর এমন একটা দৃশ্য, চোখ তুলেই হকচকিয়ে গেল সবাই। সাদা অ্যাপ্রন, হেডড্রেস ও মাস্ক পরা সুন্দরী নার্সকে জড়িয়ে ধরেছে ডাক্তার। মেয়েটিকে চুমো খাওয়ার জন্য খালি হাতটা দিয়ে নিজের মাস্ক খোলার চেষ্টা করছে সে। খুলেও ফেলল মাস্কটা, চুমো খাচ্ছে ডাক্তার। মেয়েটিকে ছটফট করতে দেখে হুদাই বাধা দিল।

'স্টপ ইট, প্লিজ!' ভারী গলায় বলল সে।

চমকে উঠে নার্সকে ছেড়ে দিল ডাক্তার। দুজনেই লজ্জা পেয়েছে—হেডড্রেস ও মাস্ক ঠিকঠাক করে নেওয়ার সময় কারও দিকে তাকাচ্ছে না।

হাতে পিস্তল বেরিয়ে এসেছে, লাফ দিয়ে অ্যামবুলেন্সের ভিতর চড়ল হুদা। কাঁধে টান পড়ায় মুখ বিকৃত করল। তার পিছু নিয়ে ভিতরে ঢুকল তার বডিগার্ড ও ক্যাপটেন উমে। সবার পিছনে থাকল লেফটেন্যান্ট লাই, তবে জায়গা না হওয়ায় অ্যামবুলেন্সের নীচে দাঁড়িয়ে আছে সে—যেন হৃৎপিণ্ডটা হাতে নিয়ে।

রোগীর সারা শরীরে ব্যান্ডেজ দেখে আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল কর্নেল হুদা। তার চোখ বন্ধ দেখে মনে মনে হাসল সে,

ভাবল—তুমি জেগে আছ, দোস্ত! ব্লাডপ্রেশার উঠে গেছে দুশো চল্লিশের ঘরে! 'নার্স, পেশেন্টের ঘুম ভাঙাও,' হুকুমের সুরে ইংরেজিতে বলল সে। 'রোগীর চোখ দেখব আমরা।'

ডাক্তারের দিকে তাকাল নার্স। ডাক্তার তার চোখ ঘুরিয়ে তাকাল অ্যামবুলেন্সের নীচে দাঁড়ানো লেফটেন্যান্টের দিকে।

কথা না বলে লেফটেন্যান্ট শুধু ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল।

অনুমতি পেয়ে রোগীর দিকে ঝুঁকল ডাক্তার, পাতলা মাস্কের ভিতর দিয়ে মৃদুকণ্ঠে চিনা ভাষায় বলল, 'মিস্টার ইয়াং ফু, চোখ দুটো একবার খুলবেন, প্লিজ?'

বলতে না বলতে চোখ খুলল রোগী।

তার চোখ দুটো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল কর্নেল হুদা। রানার চোখ কালো, এরও তাই। কিন্তু রানার চোখ এরকম সরু হয় কী করে! চিনাদের মত তো হতেই পারে না। এই লোকের চোখ সরু, একদম চিনাম্যানদের মত। তবে টেপ বা আঠা ব্যবহার করে যে-কোনও চোখ সরু করা অসম্ভব না-ও হতে পারে।

'আমরা এই রোগীর পুরো মুখ দেখতে চাই,' ডাক্তারকে বলল হুদা, ইংরেজিতে। অন্তত নাকটা দেখা চাই-ই।

তার কথার জবাব না দিয়ে লেফটেন্যান্ট লাইয়ের দিকে তাকাল ডাক্তার। 'এদের সবকটাকে আপনি গাড়ি থেকে নেমে যেতে বলুন, লেফটেন্যান্ট লাই,' চিনা ভাষায় কথা বলছে সে। 'একান্তই যদি অ্যামবুলেন্সে উঠতে হয়, সবাইকে মাস্ক পরে আসতে হবে।'

'রাখেন আপনার মাস্ক!' এবার ডাক্তারের ভাষাতেই হুঙ্কার ছাড়ল হুদা। 'এখানে সার্চ করতে আমাদেরকে জেনারেল উ নিমুচি পাঠিয়েছেন, তা জানেন? আমরা একজন বিদেশি খুনিকে খুঁজতে এসেছি! তাড়াতাড়ি এই লোকের মুখের ব্যান্ডেজ খুলে দেখতে দিন, তা না হলে...'

‘সম্ভব নয়,’ বলল ডাক্তার। ‘আমার এই রোগীর সারা শরীর পুড়ে গেছে, ব্যান্ডেজ খুললে ইনফেকশন ঠেকানো যাবে না। আপনারা শিক্ষিত মানুষ, অথচ মাস্ক না পরে কীভাবে এখানে চলে এলেন, আমি বুঝতে অক্ষম।’

‘না, সত্যি সম্ভব নয়,’ তাকে সমর্থন করল লেফটেন্যান্ট লাই।

‘প্রসঙ্গ থেকে কিন্তু সরে যাচ্ছেন আপনারা,’ কঠিন সুরে লেফটেন্যান্টকে বলল কর্নেল হুদা। ‘আমরা সন্দেহ করছি, এই রোগীই সেই খুনি। এক কথায় জবাব দিন, এর মুখের ব্যান্ডেজ খুলবেন কি খুলবেন না।’

‘আগে বলুন কী দেখে আমাদের স্বদেশী এই রোগীকে বিদেশি একজন খুনি বলে সন্দেহ করছেন?’ জানতে চাইল লাই।

‘কিছু দেখেই সন্দেহ হচ্ছে না,’ বলল হুদা। ‘সেটাই সন্দেহের কারণ।’

‘এরকম উদ্ভট যুক্তি আগে কখনও শুনিনি আমি।’

‘তার মানে আপনারা সহযোগিতা করতে চাইছেন না,’ বলল হুদা। ‘ঠিক আছে।’ পকেট থেকে রেডিও বের করে জেনারেল উ নিমুচির সঙ্গে যোগাযোগ করল সে।

মাত্র দুমিনিট কথা বলল তারা। জেনারেল কী পরামর্শ দিল কে জানে, নতুন উৎসাহ ও আগ্রহে উৎফুল্ল হয়ে উঠতে দেখা গেল হুদাকে।

‘ঠিক আছে,’ বলল সে, প্যাঁচে ফেলার নতুন কৌশল পেয়ে গেছে। ‘জেনারেল খোঁজ নিয়ে জেনেছেন কনভয়ে কী কী আছে এবং কার কার থাকার কথা তার একটা তালিকা আছে। কোথায় সেটা?’

‘আমার পকেটে,’ কিছু না ভেবেই জবাব দিয়ে ফেলল লেফটেন্যান্ট লাই, পকেটে হাতও ভরে ফেলল।

‘ওটা চাইছেন জেনারেল নিমুচি,’ বলল হুদা, লেফটেন্যান্টের

সামনে হাত পাতল। ‘আমাকে দিন, আমি ওটা তাঁকে পড়ে শোনাই।’

এতক্ষণে উপলব্ধি করল লাই, কী মারাত্মক ভুলই না করে বসেছে সে। তালিকায় ইয়াং ফু নামে একজন পাইলট থাকলেও, তাকে রোগী হিসাবে উল্লেখ করা হয়নি। কনভয়ে আসলে কোনও রোগীই নেই। ঘামতে শুরু করল সে।

এখন আর ভুলটা শুধরে নেওয়ারও কোনও উপায় নেই, কারণ এরইমধ্যে পকেট থেকে তালিকাটা বের করে ফেলেছে লাই।

কাগজটা তার হাত থেকে ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিল হুদা। বেশ বড় একটা তালিকা, চোখ বুলাতে সময় নিল সে। অবশেষে কঠিন চোখ তুলে লেফটেন্যান্টের দিকে তাকাল সে। ‘তালিকায় মেডিকেল ইকুইপমেন্ট, নার্স, ডাক্তার এই সব যাবার কথা লেখা হয়েছে। কোনও রোগীর প্রসঙ্গে কিছুই লেখা হয়নি।’

‘খুঁটিনাটি সব কী আর লেখা সম্ভব...’

‘বেশ। কিন্তু প্রেসক্রিপশন, সেটা তো থাকবে?’ এবার ডাক্তারের দিকে ফিরে হাত পাতল কর্নেল। ‘প্রেসক্রিপসন, প্লিজ।’

আঞ্চলিক চিনা ভাষায় তুমুল ঝড় তুলল ডাক্তার, কার সাধ্য বোঝে কী বলছে, সিট ছেড়ে দাঁড়াল, তারপর কর্নেলকে একরকম ধাক্কা দিয়ে স্ট্রেচারের মাথার কাছে এসে হাঁটু মুড়ে বসল। ‘নিন, পেশেন্টের মুখ দেখে কলজে ঠাণ্ডা করুন,’ বলে সতর্ক হাতে রোগীর মাথা ও মুখের ব্যান্ডেজ খুলতে শুরু করল। ‘তবে জেনে রাখবেন, আমরা চিন সরকারের কাছে রিপোর্ট করব আপনাদের এই জোর-জুলুমের ব্যাপারে। এই রোগী ইনফেকশনে মারা গেলে জবাবদিহি করতে হবে আপনাদের জেনারেলকেও।’

বিস্ময়ে পাথরের মূর্তি হয়ে গেল লেফটেন্যান্ট তিয়েন লাই।

অ্যামবুলেন্সের বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সৃষ্টিকর্তাকে ডাকছে সে, তার শরীর যেন জমে বরফ হয়ে গেছে। আড়চোখে লক্ষ করল, খাকি ও সবুজ ইউনিফর্ম পরা সশস্ত্র লোকজন ঘিরে রেখেছে তাকে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডাক্তারের হাতের কাজ দেখছে কর্নেল হুদা। ব্যান্ডেজ যত পাতলা হয়ে আসছে ডাক্তর ততই সাবধানে, ধীরে ধীরে ওটার প্যাঁচ খুলছে। ব্যান্ডেজে এবার মলমের মত কিছু একটার দাগ লাগছে।

তারপর একসময় পাতলা ব্যান্ডেজ প্রায় স্বচ্ছ হয়ে এল। রোগীর মাথা, কপাল, চোয়াল ও বোঁচা নাকের ব্রিজে লেগে থাকা অদ্ভুত রঙের প্রলেপ দেখতে পাচ্ছে সে।

হুদার ধারণা হলো, ওগুলো আসলে দগদগে ঘা থেকে উঠে আসা ওষুধ, চামড়া, দূষিত পদার্থ ইত্যাদির মিশ্রণ। ব্যান্ডেজের আরও একটা প্যাঁচ খুলতে রোগীর চেহারা প্রায় স্পষ্ট হয়ে গেল। এতক্ষণ যা ভাবছিল সে, সেটাই সত্যি। কোনও সন্দেহ নেই।

এই রোগী মাসুদ রানা নয়! নাক-বোঁচা এক চিনাম্যান।

অ্যামবুলেন্স থেকে নেমে এল হুদা। ক্লান্ত, বিরক্ত ও অপমানিত দেখাচ্ছে তাকে। দাঁড়া হারামজাদি, মনে মনে নিদানিকে গালি দিচ্ছে সে। এত দুঃসাহস, তুই শালী ভুল ইনফরমেশন দিয়ে মশকরা করিস আমার সঙ্গে! তারপরই তার মনে পড়ল, চিনাদের আরেকটা কনভয় আসবে। রানার কি তা হলে সেটায় থাকবার কথা? ভুলটা কি সে-ই করেছে?

অসম্ভব নয়।

‘দুঃখিত,’ হাঁ হয়ে থাকা লেফটেন্যান্টকে বলল হুদা, গট গট করে ফিরে যাচ্ছে রোডব্লকের দিকে। তার পিছু নিল ক্যাপটেন লিয়াম উমে, সশস্ত্র সৈন্য ও গার্ডরা।

সাহস ফিরে এসেছে লেফটেন্যান্টের। পিছন থেকে বলল,

‘ক্ষমা প্রার্থনার চিঠিটা কি আমার হাতেই দেবেন, নাকি পাঠাবেন হেড অফিসে?’

জবাব দিল না কর্নেল হুদা, শুধু ঘাড় ফিরিয়ে আপাদমস্তক দেখল একবার লেফটেন্যান্টকে। সবার সামনে চরম অপমান করা হয়েছে তাকে—একজন কর্নেলকে।

উমের প্রশ্নের জবাবে কর্নেল হুদা বলল, ‘না, প্রত্যেকটি গাড়ি চেক করুন। চেক না করে একটা গাড়িও ছাড়া যাবে না। তবে অ্যামবুলেন্সে খুনি লোকটা নেই।’

খুব দ্রুতই কনভয়ের বাকি অংশ চেক করা হয়ে গেল।

রিপোর্ট পাওয়ার পর হাতের রেডিওটা অন করল কর্নেল হুদা। ‘জেনারেল উ নিমুচি, কর্নেল... রিপোর্ট ভাল নয়... চিনাদের প্রথম কনভয়ে সে নেই... ঠিক বলতে পারছি না... হয়তো দ্বিতীয় কনভয়ে আছে। ...না, আমি দুটোর ওপরই নজর রাখতে চাই... শুনুন, আমাদের কোম্পানির একটা রেকনিসেন্স প্লেন থাকা দরকার আকাশে... হ্যাঁ, নজর রাখতে হবে... একটা পরিবহন হেলিকপ্টারও লাগবে, সে কোথায় আছে জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গার্ডরা সামনে চলে গিয়ে অ্যামবুশ পাতবে... হ্যাঁ, হ্যাঁ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।’

চোদ্দো

দশ মিনিট হলো রোডব্লক পিছনে ফেলে এসেছে কনভয়।

অ্যামবুলেন্সের ভিতর গাদাগাদি করে বসেছে ওরা সবাই–লেফটেন্যান্ট তিয়েন লাই, ডাক্তার চোচিন চো, নার্স সুজি ওয়াং, মাসুদ রানা ও থোন ফালান।

'দুঃখিত, সত্যি আমি দুঃখিত,' সুন্দরী নার্স সুজি ওয়াংকে বলল রানা। 'আমি জড়িয়ে ধরে চুমো খাওয়ার চেষ্টা করায় এত লোকের সামনে আপনাকে লজ্জায় পড়তে হলো, আমি সেজন্যে দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী। শুধু পাকিস্তানী ওই শয়তানটাকে বোকা বানাবার জন্যে একটা ডাইভারশন ক্রিয়েট করতে হয়েছিল।'

টকটকে লাল হয়ে উঠেছে সুন্দরী নার্সের চেহারা। 'আপনি বিনয় করছেন। আর তা করতে গিয়ে আমার চরিত্রে খানিকটা কলঙ্কও লেপন করছেন। আপনি আসলে ও-সব কিছুই করেননি, করার ভান করছিলেন মাত্র।'

হাতের কাজটা শেষ করে হাসল রানা। 'ও, আচ্ছা, তাই? সেক্ষেত্রেও আমি দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী; এমন একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও সদ্ব্যবহার না করার জন্যে।'

একযোগে হেসে উঠল সবাই। সুজিও।

লেফটেন্যান্ট লাই রানাকে বলল, 'ভালয় ভালয় ঝামেলাটা কাটানো গেছে, এতেই আমি মহা খুশি। কিন্তু কীভাবে কী হলো বলুন তো? ডাক্তার চোচিন চো-র জায়গায় মিস্টার রানা বসে আছেন, চোখের সামনে দেখেও ব্যাপারটা ধরতে পারিনি আমি।'

'আমার মাথা হেডড্রেসে ও মুখ মাস্কে ঢাকা ছিল, তাই ধরতে পারেননি,' বলল রানা। 'সাইকোলজিকাল একটা ব্যাপারও ছিল। আপনি জানতেন, মুখে-মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে স্ট্রেচারে শুয়ে থাকব আমি, আমার পাশে মাথা ও মুখ ঢাকা অবস্থায় থাকবেন ডাক্তার। খুব বড় ধরনের অসঙ্গতি না থাকায় বিশ্বাসও করেছেন তাই। ছোটখাট অসঙ্গতিগুলো চোখ এড়িয়ে গেছে।'

'আর কর্নেল হুদা? ক্যাপটেন উমে? তারা কেন ধরতে পারল

না?’

‘কর্নেল হুদা আর ক্যাপটেন উমের ব্যাপারটা হলো, তাদের সমস্ত সন্দেহ গিয়ে পড়েছিল রোগীর ওপর। অ্যামবুলেন্সে ঢুকে কী দেখল? প্রাথমিক চমকটার পর দেখল, রোগীর মুখ ও মাথা সাদা ব্যান্ডেজে মোড়া। সঙ্গে সঙ্গে তারা ধরে নিল চেহারা গোপন করার জন্যেই এই ব্যান্ডেজ। কাজেই ডাক্তারকে খুঁটিয়ে দেখার কথা একবারও ভাবেনি তারা। খুঁটিয়ে দেখলেও সহজে চিনতে পারত না, আমার মুখ ও মাথা তো ঢাকাই ছিল।’

‘আমি মনে করি আপনার অভিনয়েরও বিরাট একটা অবদান আছে,’ বলল তরুণ ডাক্তার চোচিন চো। ‘কর্নেলকে ধাক্কা দেয়ায়, স্বেচ্ছায় ব্যান্ডেজ খুলতে শুরু করায় কর্নেল আপনাকে লুকিয়ে থাকা ইঁদুর বলে ভাবতে পারেনি...’

‘আপনার মাথায় ব্যাপারটা এল কখন, স্ট্রেচারে ডাক্তারকে শুইয়ে তাঁর জায়গায় আপনি বসবেন?’ ডাক্তার থামতেই জানতে চাইল লেফটেন্যান্ট।

‘জানালা দিয়ে আপনাদের তর্ক শুনতে পাচ্ছিলাম,’ বলল রানা। ‘ওদের সঙ্গে পাকিস্তানী কর্নেল হুদা আছে শুনে মরিয়া হয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম, বাঁচার শেষ একটা চেষ্টা করতে হবে। কী করব বললাম ডাক্তার চো আর মিস ওয়াংকে; সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন ওঁরা। ব্যস, পেস্ট মাখিয়ে স্ট্রেচারে শুইয়ে দিলাম ডাক্তার চোকে; তাঁর ড্রেস পরে, গলায় স্টেথস্কোপ ঝুলিয়ে ডাক্তার হয়ে গেলাম নিজে। ওঁদের দুজনের কাছে ঋণী হয়ে থাকলাম আমি।’

হইহই করে উঠল ওরা দুজন। ‘কী যে বলেন...’

‘সবার জন্য চিনা হুইস্কি আসছে,’ ঘোষণা করল লেফটেন্যান্ট লাই।

চল্লিশ মিনিট পর কনভয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হাইওয়ে ছাড়ল

একটা ট্রাক, ডানপাশের জঙ্গলে ঢুকে আঁকাবাঁকা একটা পথ ধরল। ওটা ছাড়া বাকি সব গাড়ি নিজেদের গন্তব্যে ছুটে চলেছে।

নতুন রাস্তাটা পাকা হলেও, মাঝখানে ছোটবড় প্রচুর গর্ত, বৃষ্টির পানিতে ভরাট হয়ে আছে। ট্রাকের পিছনে একটা বেঞ্চের উপর পাশাপাশি বসে রয়েছে রানা ও ফালান। ওদের ডানদিকের আকাশে ঝাপসা সূর্য কখনও দেখা গেল কখনও গেল না। বৃষ্টি ছেড়ে গেলেও, মেঘ কাটেনি। ভ্যাপসা ভাবটাও দূর হয়নি।

থোন ফালান গম্ভীর, চুপচাপ।

আধ ঘণ্টা পর থামল ট্রাক। চারপাশে বাঁশবাগান দেখা যাচ্ছে। ট্রাকের পিছন থেকে লাফিয়ে নীচে নামল রানা ও ফালান, দুজনের কাঁধে ঝুলছে দুটো চামড়ার ব্যাগ। ওদের সঙ্গে লেফটেন্যান্ট লাইও নামল। হ্যান্ডশেক করবার সময় রানাকে বলল সে, 'এখানেই আপনাদেরকে পৌঁছে দেয়ার কথা। বুঝতে পারছেন কোথায় এসেছেন, কোন্‌দিকে যেতে হবে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'উত্তর-পশ্চিমে যাব আমরা। অসংখ্য ধন্যবাদ, লেফটেন্যান্ট।'

'ইউ আর ওয়েলকাম, সার। শুভেচ্ছা রইল।' ট্রাকে উঠে পড়ল লাই, ইউ টার্ন নিয়ে ফিরে যাচ্ছে ড্রাইভার।

ট্রাক চলে যাওয়ার পর ইঞ্জিনের যান্ত্রিক গুঞ্জন দূরে মিলিয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু রেশটা কেন যেন থেকে যাচ্ছে। কান পাতল রানা। ফালানও।

মনে হলো কেমন যেন অন্য রকম সুর। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে। হ্যাঁ। একটু পর দেখা গেল শব্দটাকে আলাদাভাবে চিনতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।

ছোট কোনও এয়ারক্রাফট। সম্ভবত বার্মিজ রেকনেসন্স প্লেন, ভাবল রানা, স্পাইং করতে পাঠানো হয়েছে। কাছাকাছি এসে আবার দূরে সরে যাচ্ছে।

আওয়াজটা ঠিক চিনতে পারছে না ফালান। 'প্লেন, না কপ্টার, মিস্টার রানা?'

'স্কাউটিং প্লেন।'

'আর আমি ভাবছিলাম আমাদেরকে যে কপ্টারটা নিতে আসার কথা, পৌঁছাতে দেরি হচ্ছে দেখে চক্কর দিচ্ছে...'

'পিকআপ পয়েন্ট এখান থেকে অনেক দূরে,' বলল রানা। 'তা ছাড়া, আমাদেরকে খুঁজবে না পাইলট, তার দায়িত্ব নির্দিষ্ট জায়গা থেকে আমাদেরকে তুলে নেয়া।'

'রেকনেসন্স প্লেন কি উ নিমুচি পাঠিয়েছে, কর্নেল হুদার অনুরোধে?' জিজ্ঞেস করল ফালান।

'হতে পারে। ওরা সম্ভবত দূর থেকে ট্রাকটার ওপর নজর রাখছিল,' বলল রানা, চিন্তিত। 'আমাদেরকে কোথায় নামিয়ে দেয়া হয়েছে জানার পর ফিরে যাচ্ছে।'

'পাইলট এই মুহূর্তে রিপোর্ট করছে কর্নেল হুদাকে,' মন্তব্য করল ফালান। ইতোমধ্যে মেঠো পথ ধরে উত্তর-পশ্চিমে রওনা হয়েছে ওরা। দুজনেই খেয়াল করল আওয়াজটা ক্রমশ দূরে সরে যেতে যেতে এক সময় মিলিয়ে গেল।

'হয়তো,' বলল রানা। 'সাবধানে এগোতে হবে, ফালান। ওরা বোধহয় সামনেই কোথাও ফাঁদ পাতবে।'

গাছপালার নীচে ভ্যাপসা গরম, দিনের আলো এত কম যে প্রায়ই দৃষ্টিবিভ্রমের শিকার হতে হচ্ছে। কিছুক্ষণ হলো চুপচাপ হাঁটছে রানা, ছায়ার ভিতর অভ্যস্ত হয়ে নিচ্ছে, চোখ বুলাচ্ছে চারদিকে। ওর ঠিক তিন গজ পিছনে রয়েছে ফালান।

প্রথম দশ মিনিট এগোতে কোনও সমস্যা হলো না। তারপর ধীরে ধীরে ঝোপগুলো সবটুকু রাস্তা দখল করে নিল। এদিকের গাছগুলো পরস্পরের খুব কাছাকাছি, ফলে আঁকাবাঁকা পথ তৈরি করে এগোতে হচ্ছে।

হাঁটার গতি মন্থর হয়ে আসায় রক্তপিপাসু মশার দল ছেঁকে ধরল দুজনকে। ঝোপগুলো কোথাও কোথাও এত ঘন যে ম্যাচেটি দিয়ে কেটে তারপর এগোতে হচ্ছে।

দু'ঘণ্টা পর একটা গাছের তলায় থামল রানা। গাছটা যেমন মোটা, তেমনি লম্বা, অর্ধেকটাই ঘন ঝোপ ও আগাছায় ঢাকা, ম্যাচেটি দিয়ে না কাটলে এগোনো যাবে না।

বুলডগের মত মুখটা গম্ভীর করে হাত তুলে আরেকটা দিক দেখাল ফালান। মাত্র কয়েক গজ দূরে ফাঁকা একটা জায়গা রয়েছে, বাধাটা অনায়াসে পার হয়ে যেতে পারে ওরা।

মাথা নাড়ল রানা, চুপ করে থাকার ভঙ্গিতে একটা আঙুল খাড়া করল ঠোঁটের সামনে। কান পেতে আছে ও।

শুধু মশারা শব্দ করছে। দূরে কোথাও, জঙ্গলের ভিতর থেকে অস্পষ্ট একটা আওয়াজ ভেসে আসছে। ওদের কাছ থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছে সেটা। রানা ভাবল, কাছাকাছি কোনও রাস্তা আছে?

তারপর আর কিছুই শোনা গেল না, শুধু ঝাঁক ঝাঁক মশা একটানা গান গাইছে। ওদের সঙ্গীত আগের চেয়ে যেন জোরাল হয়েছে...না তো! এক মুহূর্ত পরেই ভুলটা ভাঙল। ওটা পানির শব্দ, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে কলকল করে একটা ঝরনা বয়ে যাচ্ছে।

ওদের চারপাশের ঘন ঝোপগুলোর উপর দ্রুত চোখ বুলাল রানা, ভাবছে এক্স-রে চোখ থাকলে ভাল হত। মশা, মাছি, ফড়িং, প্রজাপতি ও পাখি ছাড়া আর কিছু নড়ছে না। সঙ্গীর দিকে ফিরে একটু হাসল। 'ঠিক আছে, ফালান,' বলল ও, গলা খাদে নামানো। 'এবার আমাদের তৈরি হতে হয়।'

মাথা ঝাঁকাল ফালান। 'ইয়েস, মিস্টার রানা।'

চামড়ার ব্যাগটা খুলল রানা।

দামী জুতো ও সুটের বদলে মিলিটারি বুট ও সবুজ ইউনিফর্ম পরল রানা। এ-সব সেকেন্ড-হ্যান্ড মার্কেট থেকে কেনা, নতুন নয়। মিউচুয়াল ভেঞ্চার কোম্পানির গার্ডরা প্রায় এ-ধরনের উর্দিই পরে।

'এত ভাল কাপড়চোপড় সব এখানে ফেলে যেতে হবে,' একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে মন্তব্য করল ফালান, ঘাসের চাপড়া সরিয়ে এরই মধ্যে একটা গর্ত খুঁড়তে শুরু করেছে সে।

কাজটা শেষ করে ফালানও মিলিটারি বুট ও সবুজ ইউনিফর্ম পরল। নিজেদের পরিত্যক্ত পরিচ্ছদগুলো গর্তে ফেলে মাটি চাপা দিল ওরা, তারপর ঘাসের চাপড়া দিয়ে ঢেকে দিল।

কোমরে চওড়া একটা বেল্ট জড়িয়েছে রানা—বেল্ট তো নয়, যেন একটা মিনি অস্ত্রাগার। কার্ট্রিজ পাউচ ছাড়াও খুদে একটা ফার্স্ট-এইড কিট আছে ওটায়, তাতে ওষুধ-পত্র ছাড়াও পাওয়া যাবে তিনটে হ্যান্ড গ্রেনেড, পিস্তল, স্পেয়ার ম্যাগাজিন, ম্যাচেটি ও টর্চ।

'তুমি কখনও গ্রেনেড ব্যবহার করেছ?' জানতে চাইল রানা।

'জী, মিস্টার রানা,' ফালানও নিচু গলায় কথা বলছে। 'তবে অনেক বছর আগে। আমি থাই সেনাবাহিনীতে লেফটেন্যান্ট ছিলাম।'

ব্যাগ থেকে একটা কমপাস বের করল রানা, নেড়েচেড়ে দেখে আবার সেটা ব্যাগেই রেখে দিল। 'এটা আমাদের লাগবে বলে মনে হয় না।'

রানার বাড়ানো হাত থেকে ছোট একটা বান্ডিল নিল ফালান, তাতে স্লিপিং ব্যাগ, চাদর ও ভাঁজ করা এক প্রস্থ চৌকো ওয়াটারপ্রুফ কাপড়, কিছু শুকনো খাবার ইত্যাদি রয়েছে। বান্ডিলটা নিজের ব্যাগে রেখে দিল সে।

রানার ব্যাগেও এ-সব জিনিস আছে। আরও আছে মিনি ক্যামেরা, স্যাটেলাইট কানেকশন সহ পামটপ কমপিউটার।

চোখগুলোকে গাছের ডালপালা ও ঝোপের কাঁটা থেকে রক্ষার জন্য দুজনেই ওরা নিজেদের কপালে কাপড়ের পুরু পট্টি বেঁধে নিল।

সবশেষে একটা ম্যাপ বের করে ভাঁজ খুলল রানা। 'এই যে বৃত্তটা দেখছ,' আঙুল তাক করে ফালানকে বলল, 'এখান থেকে আমাদেরকে তুলে নেবে পাইলট চৌ চি। আর এখন আমরা রয়েছি এই জায়গায়, পিক-আপ পয়েন্ট থেকে পনের কিলোমিটার দক্ষিণে।'

'আর এই দ্বিতীয় বৃত্তটা?' ম্যাপের দিকে আঙুল তাক করল ফালান।

'ওখানে আমাদেরকে ড্রপ করা হবে,' বলল রানা। 'তারপর নিজেদের চেষ্টায় লেমিয়েথনায় পৌঁছাব আমরা। ম্যাপে কিছুটা আভাস পাচ্ছি, তবু তোমার মুখ থেকে শুনি এলাকাটা কেমন।'

'জঙ্গল আর ছোট-বড় পাহাড়,' সংক্ষেপে জানাল ফালান। 'ফাঁকা এলাকা, অল্প কিছু মানুষ বসবাস করে, প্রায় সবাই মুসলমান। তবে তারা নিমুচি বাহিনীর অত্যাচারে খুব বিপদের মধ্যেই আছে—তাদের কাছ থেকে কোনও রকম সাহায্য পাবার আশা করা যায় না।'

শুনছে রানা, কোনও মন্তব্য করছে না।

'ম্যাডাম ইরাবতির খামারবাড়ির সামনের দিকটা কয়েক কিলোমিটার সমতল; কিছু জঙ্গল ও মাঝে মধ্যে দু'একটা উঁচু টিলা আছে শুধু। আমরা যদি গা ঢাকা দিয়ে এগোতে চাই, কেউ আমাদেরকে দেখতে পাবে না। তারপর পাহাড় শুরু হয়েছে ঠিক খামারবাড়ির পেছন থেকে।'

'গুড, পরিষ্কার একটা ছবি পাওয়া গেল।'

'আচ্ছা, মিস্টার রানা,' জানতে চাইল ফালান। 'পথে ঠিক কী ধরনের বিপদে পড়তে পারি আমরা?'

‘সেটা বলা মুশকিল, ফালান। স্নাইপার থাকতে পারে। ফাঁদ, এমনকী অ্যামবুশও থাকতে পারে। তবে ভয় পেলে চলবে না, আমাদেরকে শুধু চোখ-কান খোলা রেখে সাবধানে চলতে হবে।’

‘জী, মিস্টার রানা।’

‘ঠিক আছে, চলো, এবার আমরা রওনা দিই,’ বলে ম্যাপটা নিয়ে সিধে হলো রানা, ওটা ভাঁজ করে কপালে বাঁধা পট্টির ভিতর গুঁজে রাখল।

খানা-খন্দে ভরা রাস্তায় প্রতি মুহূর্তে ঝাঁকি খাচ্ছে নীল পাজেরো, ওটার ব্যাকসিটে কম্বলের একটা স্তূপে শুয়ে জ্বরে কাঁপছে কর্নেল হুদা। প্রতিটি ঝাঁকিতে বাম কাঁধের ক্ষত অসহ্য ব্যথা করছে, উহ্-আহ্ শব্দ বেরুচ্ছে গলা থেকে।

এত কষ্ট পেলেও, একটা কথা ভেবে খুশি হুদা। খুব দ্রুত এগোচ্ছে তারা। তার ড্রাইভার অত্যন্ত দক্ষ। শুধু দক্ষ নয়, এই এলাকার নাড়ি-নক্ষত্র সবই তার জানা। বনভূমির ভিতর দিয়ে চলে যাওয়া আধ পাকা রাস্তাটার কথা সে-ই তাকে জানিয়েছে—শর্টকাট, হাইওয়ে ধরে গেলে যতটকু সময় লাগবে তারচেয়ে অনেক আগে লেমিয়েথনায় পৌঁছে যাবে তারা।

*

জেনারেল উ নিমুচির নির্দেশ পালন করছে বার্মিজ সেনাবাহিনীর পাইলট। রেকনেসন্স প্লেনটাকে চল্লিশ হাজার ফুট উপরে তুলে এনেছে সে।

কো-পাইলটের চোখে বিনকিউলার। মেঘের ফাঁক-ফোকর দিয়ে নীচের কনভয়টাকে দেখতে পাচ্ছে সে। একসময় কনভয়ের একটা ট্রাক হাইওয়ে ছেড়ে ডানপাশের আঁকাবাঁকা একটা পথ ধরল।

আধ ঘণ্টা পর থামল ট্রাক। সেটা থেকে নামল তিনজন

লোক, তিনজনই বিদেশি। পকেট থেকে দুটো ফটো বের করল কো-পাইলট, বিনকিউলার অ্যাডজাস্ট করে চেহারাগুলো মেলাবার চেষ্টা করছে। এই ফটো জেনারেল উ নিমুচির অফিস থেকে পাঠানো হয়েছে তাদেরকে।

মাসুদ রানা ও থোন ফালানের সঙ্গে হুবহু মিলে গেল ট্রাক থেকে নামা দুজন লোকের চেহারা। তাদেরকে বলা হয়েছে, এদের একজন বাংলাদেশী, নাম মাসুদ রানা, প্রফেশনাল ক্রিমিনাল; আরেকজন থাই, নাম থোন ফালান, রাষ্ট্রবিরোধী কাজে জড়িত এক বৃদ্ধার বডিগার্ড।

তৃতীয় লোকটা চিনা। ট্রাকের ক্যাবে আবার উঠে পড়ল সে। ইউ টার্ন নিয়ে হাইওয়েতে ফিরে এল ট্রাকটা, কনভয়ের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য ফুলস্পিডে ছুটছে।

রেকনেসন্স প্লেন ঘুরিয়ে নিয়ে জেনারেল উ নিমুচিকে রিপোর্ট করল পাইলট। নিমুচি সেল ফোনে যোগাযোগ করল কর্নেল হুদার সঙ্গে।

'ইয়েস, জেনারেল?' পাজেরোর ব্যাকসিটে স্তূপ করা কম্বলে হেলান দিল কর্নেল হুদা।

'আপনাকে বোকা বানিয়েছে ওরা,' বলল নিমুচি। 'চিনাদের প্রথম কনভয়েই ছিল মাসুদ রানা। ওই কনভয়ের একটা ট্রাক ওদের দুজনকে খানিক আগে একটা জঙ্গলে পৌঁছে দিয়ে গেছে।'

'জঙ্গলে? কোন্ জঙ্গলে?' জানতে চাইল হুদা।

'বললে বিশ্বাস করবেন না। এই মুহূর্তে আপনারা দুজন একই জঙ্গলে রয়েছেন—পোয়া মোয়া বনে।'

ঝট করে সিধে হয়ে বসল হুদা। কাঁধের ব্যথায় চোখে সরষে ফুল দেখবার কথা, অথচ গ্রাহ্য করছে না। 'কোথায় শালা হিন্দুর বাচ্চাটা! ওকে আমি নিজের হাতে খুন করব, ঠাণ্ডা আর গরম দাওয়াই দিয়ে।'

ভারী গলায় হেসে উঠল জেনারেল উ। 'আপনার ওয়াটার ট্রিটমেন্টের কথাটা জানি। কিন্তু ঠাণ্ডা ও গরম দাওয়াই কী জিনিস?'

'এও ওয়াটার ট্রিটমেন্টই,' বলল হুদা। 'ঠাণ্ডাটা হলো বরফ, গলা দিয়ে নামানো হবে; আর গরমটা হলো ফুটন্ত পানি, শাওয়ার থেকে গায়ে ঢালা হবে–ফলে ভেতরে ও বাইরে দু'রকম অনুভূতি হবে তার।'

'আমার তাতে কোনও আপত্তি নেই,' চাপা হাসির সঙ্গে, অনুমোদনের সুরে বলল নিমুচি।

'বললেন একই জঙ্গলে রয়েছি, পোয়া মোয়া বনে। সে ঠিক কোথায় জানা গেছে?'

'পোয়া মোয়া বনভূমির দুটো রাস্তায় রয়েছেন আপনারা,' বলল জেনারেল। 'রাস্তা দুটো সমান্তরাল রেখা ধরে এগিয়েছে, তবে মাঝখানে পাঁচ কিলোমিটার দূরত্ব।'

হতাশ হলো হুদা। 'ও, আগে বলবেন তো।' একটু থেমে হিসহিস করে উঠল সে, 'শালা ভেবেছে আমার আগে পৌঁছে বুড়ির কাছ থেকে পেন ড্রাইভ নিয়ে কেটে পড়বে।' নিদানির প্ল্যান্ট করা মাইক্রোফোনের সাহায্যে রানা আর দায়েম সিতওয়ের কথাবার্তা সবই তারা শুনেছে, পেন ড্রাইভ ও শারমিনের মৃত্যুর কথা জানে।

'তা আর বলতে।'

'প্রচুর ফায়ার পাওয়ার সহ বেশ কিছু লোকজন দরকার আমার, জেনারেল,' বলল হুদা।

'এরইমধ্যে দুটো ট্র্যান্সপোর্ট কপ্টার রওনা হয়ে গেছে, ডিয়ার ফ্রেন্ড,' বলল জেনারেল উ। 'এদিক থেকেও যথাসাধ্য চেষ্টা করা হচ্ছে কুখ্যাত স্পাইটা যাতে লেমিয়েথনায় পৌঁছাতে না পারে। দুটো কপ্টারেই প্রচুর গোলাবারুদ সহ আমাদের কোম্পানির

ত্রিশজন করে গার্ড আছে।'

'দুটো কপ্টার, জেনারেল?' অবাক হলো কর্নেল হুদা। 'এত লোক? ষাটজন?'

'একটা যাচ্ছে পোয়া মোয়া বনে। ওখানে ক্যাম্প ফেলার পর কয়েক ভাগে ভাগ হয়ে অ্যাকশনে যাবে গার্ডরা, উদ্দেশ্য মাসুদ রানাকে জঙ্গল থেকে কোনও অবস্থাতেই বেরুতে না দেয়া।'

'ওয়ান্ডারফুল!' কর্নেল হুদা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

'আরেকটা কপ্টার যাচ্ছে লেমিয়েথনার কাছাকাছি,' বলল জেনারেল। 'ওখানেও ক্যাম্প ফেলবে গার্ডরা।'

'এত কিছুর পরও রানা যদি ওখানে পৌঁছাতে পারে, এ-কথা ভেবে?' জানতে চাইল হুদা।

'হ্যাঁ।'

'ভেরি গুড। থ্যাঙ্ক ইউ, জেনারেল।'

'আপনার থোন ফালান এখনও তা হলে ফেরেনি, ম্যাডাম?' জিজ্ঞেস করলেন জেনারেল উ নিমুচি, মুখে সহানুভূতির হাসি।

'না,' বললেন বৃদ্ধা ইরাবতি। 'ঠিক বুঝতে পারছি বা কী কারণে তার এত দেরি হচ্ছে।'

'তার সার্ভিস না পাওয়ায় আপনার যে কী সমস্যা হচ্ছে, আমি সেটা ভালই বুঝি। তিন-চারদিন হয়ে গেল, তাই না?'

'হ্যাঁ,' বললেন ইরাবতি, জেনারেলের সার্বক্ষণিক হাসিটা তাঁকে নার্ভাস করে তুলছে।

'আপনার আরও বেশি অসুবিধে হচ্ছে এই জন্যে যে তাকে আপনি খুব বিশ্বাস করেন। কিন্তু কেন সে হেনযাদায় গেল, এটা আপনার খামারের অন্য কোনও লোক জানে না কেন বলুন তো?' ধীরে ধীরে হাসিটা আরও নরম হচ্ছে নিমুচির। 'ওদেরকে আমি জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারছে না।'

‘তাদের জানার কথা নয়, তাই জানে না,’ ঠাণ্ডা সুরে বললেন ইরাবতি। ‘তা ছাড়া, আপনার মত অহেতুক অন্যায় কৌতূহল নেই তাদের।’

‘আসল কথায় আসুন, ম্যাডাম,’ সহাস্যে বলল জেনারেল। ‘ফালানকে কী কাজে, কোথায় যেন পাঠিয়েছেন?’

‘একই প্রশ্নের জবাব বারবার দিই না আমি,’ বললেন ইরাবতি। ‘আমার বরং একটা ব্যাপারে সন্দেহ হচ্ছে।’

‘মানে? কী সন্দেহ?’

‘আপনি বোধহয় জানেন কেন ফিরতে দেরি হচ্ছে ফালানের,’ বললেন ইরাবতি। ‘এরকম সন্দেহ হবার কারণ হলো, আপনার সৈন্যরা প্রথমে গুলি করে, তারপর জিনিস-পত্র ছিনিয়ে নেয়। এই এলাকায় এমন কোনও রাস্তা-ঘাট, বন-বাদাড়, গ্রাম-গঞ্জ নেই যেখানে তারা ওত পেতে নেই। তার যদি কিছু হয়...আল্লাহ যেন আপনাকে রক্ষা করেন।’

‘আপনার আল্লাহকে আমার দরকার নেই, ম্যাডাম,’ বলল জেনারেল। ‘আমি নাস্তিক। তবে আপনার দরকার আছে।’ মুখের হাসি এতক্ষণে ম্লান হতে শুরু করেছে, হলদেটে ও মাংসল মুখটা ধীরে ধীরে রঙ বদলে গোলাপি হয়ে উঠছে। ‘শুনুন, ইরাবতি। অভিনয় বন্ধ করার সময় হয়েছে। নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, এবার আমি সঙ্গে করে সৈন্যদের একটা ছোট ডিটাচমেন্ট নিয়ে এসেছি। এই মুহূর্তে খেত-খামারের বিভিন্ন পয়েন্টে পাহারা দিচ্ছে তারা। এখন আপনি যদি প্রকৃত তথ্যগুলো আমাকে না দেন, জেনে রাখুন, এক সঙ্গে অনেক কিছু শুরু হয়ে যাবে।’

‘আপনার যা স্বভাব, নিরীহ এক বৃদ্ধাকে আবার হুমকি দিচ্ছেন,’ শান্ত সুরে বললেন ইরাবতি, যদিও তাঁর হার্টবিট ক্রমশ বাড়ছে। পাকা ভ্রূ জোড়া কোঁচকালেন তিনি। ‘তথ্য? কী তথ্য?’

‘আগে বলি কী কী হবে।’ গা জ্বালানো হাসিটা আবার ফিরে

এল উ নিমুচির মুখে। 'প্রথমে আপনাকে সামান্য ব্যথা দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে—এই জন্যে যে এখানে আপনার বিশ্বস্ত ও প্রিয় লোকজন যারা আছে তারা কী রকম কষ্ট পেতে যাচ্ছে সেটা যাতে আপনি উপলব্ধি করতে পারেন।'

একটা ঢোক গিললেন ইরাবতি।

সেটা লক্ষ করে হাসিটা সারা মুখে ছড়িয়ে দিল জেনারেল। 'নাপিত আপনাকে ন্যাড়া করে দেবে, চকচকে মাথায় ঢালা হবে ফুটন্ত, গরম ঘি। হাত ও পায়ের নখ তুলে নিয়ে ব্যান্ডেজ করা হবে, তবে ক্ষতগুলোয় লবণ দেয়ার পর। এনি কমেন্ট, ম্যাডাম?'

ভয়ে অন্তরাত্মা পর্যন্ত কাঁপছে বৃদ্ধার, তবে একা শুধু নিজের জন্য নয়। লিমা, নাহিদা ও দৌলতের কথাও ভাবছেন তিনি—এরকম অকথ্য অত্যাচার কীভাবে তারা সহ্য করবে!

'আল্লাহই জানেন কে আপনাকে জেনারেল বানিয়েছে,' বললেন ইরাবতি, ক্ষোভ ও হতাশায় অসুস্থ দেখাচ্ছে তাঁকে। 'একজন অসহায় বৃদ্ধাকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে আপনার লজ্জা লাগছে না? হুমকির পর হুমকি দিয়ে চলেছেন, অথচ আমি জানিই না, কী চাইছেন আপনি আমার কাছে।' নিজের অজান্তেই তাঁর হাতটা কোমরে জড়ানো বেল্টটার দিকে উঠে যাচ্ছে। তবে একেবারে শেষ মুহূর্তে, কী করতে যাচ্ছেন বুঝতে পেরে, থেমে গেল সেটা—পরনের গাউন টেনে-টুনে ঠিক করলেন। 'আবার বলছি, আপনার কাছে গোপন করার মত কিছু নেই আমার।'

'সত্যি কথাই বলছেন আপনি। আমার কাছে এমনকী এই ব্যাপারটাও গোপন নেই, ম্যাডাম,' বলল উ নিমুচি, মিটিমিটি হাসছে। 'কয়েক রাত আগের কথা—যে রাত নিয়ে আগেও আপনার সঙ্গে আলাপ করেছি আমি—বৃষ্টির মধ্যে লাঙল দেয়া জমিতে কিছু তৎপরতা দেখা গেছে। দূর থেকে দেখে মনে হয়েছে, কিছু যেন মাটিতে পোঁতা হলো। খবরটা আজই

পেলাম...'

মনে মনে ইরাবতি বলছেন, না, খোদা, না!

'সেই থেকে ভাবছি, কী পোঁতা হয়েছে সেদিন? কী, না, কাকে?' ভ্রূ নাচালেন জেনারেল। 'তাই ভাবলাম যাই, ম্যাডাম ইরাবতিকে জিজ্ঞেস করি, তিনি নিশ্চয়ই বলতে পারবেন।'

'এ-সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা নেই,' বললেন ইরাবতি।

'বেশ। আজ আমি চলে যাচ্ছি, কাল আবার এসে জিজ্ঞেস করব। তবে এখানে আমার কিছু সৈন্যকে রেখে যাচ্ছি, তারা আপনার বাড়ি ও খেত-খামার সার্চ করবে, আপনার লোকজনদের জেরা করবে। ওদের কাজটা শেষ হলে আবার আমরা দুজন মিটিঙে বসব, কেমন?'

'যত ইচ্ছে সার্চ করুন, কেউ আপনাকে মানা করছে না,' বললেন বৃদ্ধা, কৃত্রিম সাহস দেখাতে গিয়ে ক্লান্ত বোধ করছেন তিনি। 'বেওয়ারিশ কুকুরের কিছু হাড়গোড় ছাড়া আর কিছু পাবেন বলে মনে হয় না।'

'আপনি ভুল করছেন, ম্যাডাম। কেন ভাবছেন, এখানে যারা কাজ করে তারা সবাই আপনার প্রতি বিশ্বস্ত? আপনাকে আশ্বস্ত করছি আমি, আমার খবরটা মিথ্যে নয়। তবে দুঃখের বিষয় যে সেটা অসম্পূর্ণ। আমি সেটা সম্পূর্ণ করব।' বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে ইরাবতির সামনে মাথা নোয়াল জেনারেল নিমুচি।

'অবাঞ্ছিত আগন্তুক বিদায় হলে মানুষ খুশি হয়, আমিও হই,' বললেন ইরাবতি। 'নিজেই দরজা খুলে বেরিয়ে যান, নাহিদা অন্য কাজে ব্যস্ত। আর আমি অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করছি।'

খুক খুক করে দুবার কেশে দরজার দিকে এগোল নিমুচি। তার ভারী পায়ের শব্দ ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। কর্কশ, কঠিন সুরে কাকে যেন একটা নির্দেশ দিল। একটু পর শোনা গেল মার্সিডিজের দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ।

চিন্তার ভারে ইরাবতির মাথাটা নুয়ে আসছে।

পনেরো

বনভূমির নিস্তব্ধতা এতটাই গভীর ও অটুট যে তা-ও প্রায় একটা আওয়াজের মত বাজছে কানে। ওরা যখন থামছে, স্নায়ুতে আঘাত করছে নীরবতা। যখন এগোচ্ছে, যেন একটা হাতির পাল শব্দ করছে। অথচ খুব কমই আওয়াজ করছে ওরা।

এতটা সাবধান হওয়ার কারণ হলো রানার একটা সহজ হিসাব, দুইয়ে দুইয়ে চারের মত। ওরা চিনা কনভয়ে থাকতে পারে, ওদের প্রতিপক্ষ এই খবর যদি জেনে থাকে তা হলে এটাও জেনেছে যে ওদেরকে ঠিক কোন্ জায়গা থেকে পিক করবে চাইনিজ কপ্টার।

যে রাস্তা ধরে ওদের এগোবার কথা সেটাকে এড়িয়ে থেকেছে ওরা, কিন্তু এটুকুই যথেষ্ট নয়। তাই একসময় ঘুরপথ ধরেছে রানা। বন্ধুবর হুয়ান হো যে নিচু ও ফাঁকা জায়গাটার কথা বলেছে ওকে, প্রথমে অন্তত তিনশো গজ দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে সেটার সামনে চলে যাবে, তারপর পৌঁছাবে সম্পূর্ণ উল্টোদিক থেকে।

ঘুরপথ ধরার উপকারটা একটু পরেই টের পেল ওরা। গাছের সব পাখি চুপ করে যাচ্ছে বুঝতে পেরে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, ওর দেখাদেখি ফালানও। কান পেতে থাকল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর কথাবার্তার অস্পষ্ট আওয়াজ শুনে বুঝতে পারল একদল লোক খুব

সাবধানে ওদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

সেটা প্রায় এক ঘণ্টা আগের কথা।

এই মুহূর্তে সামনে রয়েছে রানা, খুঁজে বের করছে ঝোপ-ঝাড়ের কোথায় ফাঁক আছে, লক্ষ রাখছে শুকনো ডালে যাতে পা না পড়ে, ঝুলে থাকা ডালপালাকে এড়িয়ে যাচ্ছে কায়দা করে। ওর এই দক্ষতা ও নৈপুণ্য দেখে কেউ বলবে না একাধারে সফিসটিকেশন ও পাপ-পঙ্কিলতায় ভরপুর শহরের বাসিন্দা ও, বরং সারাটা জীবনই যেন বনে-বাদাড়েই কাটিয়েছে।

রানার পিছনে ছায়ার মত সেঁটে আছে থোন ফালান, ওর মতই দক্ষ ও অক্লান্ত, চেহারায় কোনও ভাব নেই। তবে এখন যদি তাকে দেখতে পেতেন ম্যাডাম ইরাবতি, নিষ্প্রভ চোখ দুটোয় একটা ভাব ধরা পড়ত তাঁর দৃষ্টিতে—বাংলাদেশী মানুষটার প্রতি নিখাদ সমীহ; এরকম একটা সংকটের মধ্যে এত দ্রুত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভঙ্গিতে কীভাবে কেউ এগোতে পারে!

তারপর হঠাৎ আবার সেই অস্বাভাবিক নীরবতা ফিরে এল ওদের চারপাশে। এমনকী মশারাও যেন দিবানিদ্রায় অচেতন হয়ে আছে।

ধীর হলো রানার হাঁটা। ওর হাতে পিস্তল বেরিয়ে এল। নিজেরটা আগেই বের করেছে ফালান।

ছায়ার ভিতর সামনে একটা উজ্জ্বলতা দেখা যাচ্ছে। এক রাশ কচুগাছের পাতা ও ঝোপ-ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছে আলোর আভাটা, যেন আর একটু এগোলেই পরিষ্কার একটা জায়গা দেখতে পাবে ওরা।

কপালের পট্টি থেকে ম্যাপটা বের করে খুলল রানা। ওরা বোধহয় রাস্তা ও নদী, দুটোরই কাছাকাছি চলে এসেছে।

রানার পিছন থেকে ফিসফিস করল ফালান, 'ফাঁকা জমিন। ছোট একটা গর্ত। এখানেই।'

‘ঠিক আছে। খুব ধীরে,’ সাবধান করল রানা। ম্যাপটা আগের জায়গায় গুঁজে রেখে আবার এগোল।

হাত দিয়ে ঝোপের ডালপালা ও মাকড়সার জাল সরিয়ে আরও বিশ গজ এগোল ওরা। হঠাৎ করে উজ্জ্বল রোদ দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল, ছোট একটা বিস্তৃতির দিকে তাকিয়ে আছে, যদিও জায়গাটা ঠিক ফাঁকা নয়।

কাঠের গোলাকার কাঠামো জড়ানো কাঁটাতার ও ব্যারিকেড সৃষ্টির নানারকম সব লোহা ও কাঠের সাজ-সরঞ্জাম ছড়িয়ে রয়েছে চারদিকে। রানা আন্দাজ করল সম্ভবত কোনও হেলিকপ্টার থেকে নামানো হয়েছে এ-সব। ভেজা মাটিতে ল্যান্ডিং স্কিড-এর দাগ দেখে বুঝতে পারল ওর ধারণা মিথ্যে নয়।

ফাঁকা জায়গাটার একধারে পাঁচটা তাঁবু ফেলেছে মিউচুয়াল ভেঞ্চারের সশস্ত্র গার্ডরা। সবুজ ইউনিফর্ম দেখে চেনা যাচ্ছে তাদেরকে। পনেরো-বিশজন লোককে খুব ব্যস্ত দেখছে রানা, কাঁটাতার ও বাকি সব জিনিস কিছু গড়িয়ে কিছু টেনে-হিঁচড়ে বাম দিকে কোথাও নিয়ে যাচ্ছে তারা। তবে বেশিরভাগই রয়ে গেল।

রাস্তাটা নিশ্চয় ওদিকে, আন্দাজ করল রানা, সেখানে ব্যারিকেড তৈরির আয়োজন চলছে। খুব কাছে নয় সেটা, কারণ লোকগুলোর কথাবার্তার আওয়াজ মিলিয়ে যেতে বেশ কয়েক মিনিট সময় লাগল।

ক্যাম্প এখন প্রায় খালি, পাহারায় রয়েছে মাত্র দুজন গার্ড। রানা লক্ষ করল, দুজনের কাঁধেই টেলিস্কোপ লাগানো বোল্ট-অ্যাকশন রাইফেল ঝুলছে। মাঝে-মধ্যেই মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাচ্ছে তাদের একজন।

আকাশে এখন মেঘ না থাকারই মত, তবে নদীর দিক থেকে হু-হু করে সাদা কুয়াশা ভেসে আসছে। রানা আশঙ্কা করল চারদিক না ঢাকা পড়ে যায়।

দুটো খালি কাঠের বাক্সের উপর বসে আছে গার্ডরা। ফ্লাস্ক থেকে চা বা কফি ঢেলে খাচ্ছে। নিচু গলায় কথা বলছে তারা।

ফালানকে ইঙ্গিত করল রানা, তারপর দুই পা পিছিয়ে এসে নিঃশব্দে এগোল তাঁবুগুলোর দিকে। ওর পিছু নিল ফালান, আন্দাজ করতে পারছে কী করতে চাইছে রানা।

পা টিপে টিপে ত্রিশ গজ ঘুরে এল ওরা, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে কাঠের বাক্সে বসা গার্ডদের ঠিক পিছনে। ফালানের ধারণাই ঠিক, লোকগুলো কী বলছে শুনতে চায় রানা।

ওদের মধ্যে মোটা লোকটা বলল, 'কী ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছ? মাত্র একজন লোকের বিরুদ্ধে এত তোড়জোর?'

রোগা লোকটা জবাব দিল, 'এত বোঝাবুঝির মধ্যে আমি থাকি না।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। গার্ডদের একজন মুখ তুলে আকাশে জরিপ চালাল। তারপর আবার মুখ খুলল তারা।

মোটা লোকটা বলল, 'এত বোঝাবুঝির মধ্যে যদি না-ই থাকো, তা হলে ঘন ঘন আকাশে তাকাবার কী দরকার?'

একহারা লোকটা জবাব দিল, 'কীভাবে জান বাঁচাতে হয় সেটা খুব ভালই বুঝি। জেনারেল খবর পাঠিয়েছেন, মাসুদ রানাকে পিক করার জন্যে চিনাদের একটা কপ্টার আসতে পারে।'

কাপে চুমুক দিল মোটা লোকটা, তারপর বলল, 'কপ্টার যে আসবে সে তো আমিও জানি। কিন্তু তারপর কী হবে?'

তার সঙ্গী বলল, 'কী হবে মানে? আমাদের কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর জেনারেল হুকুম দিয়েছেন, ওটাকে আমরা গুলি করে ফেলে দেব!'

কঠিন হয়ে উঠল রানার চোখ দুটো।

যা জানার জানা হয়ে গেছে ওদের, এখন আর গার্ডদের এত কাছাকাছি থাকা ঠিক হচ্ছে না। ফাঁকা বিস্তৃতির কিনারা থেকে পিছিয়ে আগের জায়গায় ফিরে এল ওরা।

দুটো তাঁবুর মাঝখানে বড়সড় চুলো বানানো হয়েছে, বড় আকারের পাতিলে রান্নাও চড়ানো হয়েছে তাতে। বাতাস সামান্য দিক পরিবর্তন করতে খিচুড়ির গন্ধ পেল রানা।

লম্বা খুন্তি দিয়ে পাতিলের চাল-ডাল নেড়ে দিয়ে এল গার্ডদের একজন।

চিন্তা করছে রানা। কী হয় ওরা যদি পাইলট চৌ চি-র জন্য অপেক্ষা না করে? মিউচুয়াল ভেঞ্চারের সশস্ত্র গার্ডদের ক্যাম্পটাকে পাশ কাটিয়ে অনায়াসে এগিয়ে যেতে পারে ওরা।

'বিপদের জায়গায় অপেক্ষা করাটা কি ঠিক হচ্ছে, মিস্টার রানা?' নিচু গলায় জানতে চাইল ফালান, যেন বুঝতে পারছে কী ভাবছে রানা।

'না, ঠিক হচ্ছে না,' বলল রানা, গম্ভীর। 'কিন্তু পাইলট চৌ চির কথা ভাবছি আমি। এসে আমাদেরকে না পেলে আকাশে চক্কর দেবে সে, তাই না? আর সেই সুযোগে এরা তাকে পাখি শিকারের মত সহজেই ফেলে দেবে আকাশ থেকে।'

'রাইফেলের গুলিতে সেটা কি সম্ভব, মিস্টার রানা?' বলল ফালান।

'দেখছ কীভাবে কুয়াশা আসছে? আমাদেরকে দেখতে পাবার জন্যে অনেকটা নীচে নামতে বাধ্য হবে পাইলট। আর, রাইফেল নয়, ফালান– মেশিনগান। ডানদিকের তাঁবুর ভেতর তাকাও, ছায়ার মধ্যে।'

চোখ কুঁচকে তাকাল ফালান। ফ্ল্যাপ তোলা থাকায় নির্দিষ্ট তাঁবুর ভিতরটা অস্পষ্ট হলেও দেখা যাচ্ছে। একটা কাঠের বাক্সের পিছনে তেপায়ার ওপর ফিট করা রয়েছে মেশিনগানটা।

প্রবেশমুখের কাছে।

'তাই তো!' চাপা স্বরে বলল ফালান, রানার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন অস্বাভাবিক লম্বা ও অচেনা একজন মানুষকে দেখছে সে। 'না, পাইলট ভদ্রলোক বিপদে পড়বেন জানার পর আমরা পালাতে পারি না।' তার চোখে-মুখে সঙ্কল্প ও দৃঢ়তা ফুটে উঠল। 'অবশ্যই আমাদের একটা নীতি থাকা দরকার।'

বিষণ্ন একটু হাসি দেখা দিল রানার ঠোঁটে। 'ও হে, ফালান, এখন আমরা চাইলেও পালাতে পারব না!'

'কে—?' জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল ফালান, যান্ত্রিক গুঞ্জনটা শুনতে পেয়ে কারণটা নিজেই বুঝে নিল। 'ওহ্ আল্লাহ!' রুদ্ধশ্বাসে বলল সে। 'আমাদেরকে নিতে আসছে চি!'

এখন আরও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে রোটর ব্লেডের একঘেয়ে আওয়াজটা।

সেই সঙ্গে শুরু হয়ে গেল গার্ডদের ছুটোছুটি আর হাঁক-ডাক। শুনতে পাক বা না পাক, ব্যারিকেড দিতে যাওয়া সঙ্গীদের ডাকছে তারা।

ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানে এখনও কিছু কাঁটাতার ও কাঠের পোল রয়ে গেছে। রানা ধারণা করল পাইলট বুদ্ধিমান হলে ল্যান্ড করবার চেষ্টাই করবে না, ওগুলোর মাঝখানে রশির একটা মই ঝুলিয়ে দেবে। তবে তার আগে তাকে জানাতে হবে যে ওরা এখানে তার জন্য অপেক্ষা করছে।

'ছুটে ওগুলোর মাঝখানে ঢুকব আমরা,' ফিসফিস করল রানা, হাত তুলে জিনিসগুলো দেখাল। 'পাইলট যাতে দেখতে পায় আমাদেরকে। রশির মই নেমে এলে তুমিই আগে উঠবে। ওঠার সময়ও হাতের অস্ত্র তৈরি থাকে যেন। পারবে তো?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল ফালান, তার সরু চোখ ফাঁকা জায়গাটা

দেখছে। 'আসছে ওটা,' নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলল সে।

আকাশে নয়, ফ্ল্যাপ তোলা তাঁবুটার ভিতর তাকিয়ে রয়েছে রানা। মেশিনগানে কী যেন একটা ত্রুটি দেখা দিয়েছে, ওটার মাজল কোনমতেই আকাশের দিকে তুলতে পারছে না গার্ডরা।

কপ্টারের আওয়াজ উপর থেকে নীচে নেমে এল। তারপর সেটাকে দেখতে পেল ফালান। ঠিক যেন বড় আকারের হলুদ ফড়িং ওদের মাথার উপর দিয়ে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে উড়ে যাচ্ছে, ফাঁকা জায়গাটার উপর একটা বৃত্ত তৈরি করছে।

মেশিনগান ঠিক করতে না পেরে গার্ডদের একজন লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল তাঁবুর বাইরে, রাইফেলের বাঁট ঠেকাল কাঁধে, কপ্টারকে লক্ষ্য করে গুলি করতে যাচ্ছে। এই সময় কড়াৎ করে গর্জে উঠল রানার পিস্তল।

ঝাঁকি খেল শরীরটা। গার্ডের বুকের ঠিক মাঝখানে লেগেছে গুলিটা। শিরদাঁড়া বাঁকা হয়ে গেল, স্লো মোশনে পিছন দিকে ঢলে পড়ল সে।

ফালানের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল রানা। জঙ্গলের কিনারা থেকে বেরিয়ে এল ওরা, চারদিকে ছড়িয়ে থাকা কাঁটাতার ও অন্যান্য সরঞ্জামের মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটল। ওগুলোর মাঝখানে ফাঁকা যে জায়গাটায় থামল ওরা, কোনও রকমে দুজন দাঁড়ানো যায়। ফাঁক-ফোকর দিয়ে ফ্ল্যাপ খোলা তাঁবুর দিকে তাকাল রানা, ভিতরটা ছায়ায় ঢাকা, অস্পষ্ট দেখা গেল এখনও মেশিনগানের তেপায়া ধরে ট্যানা-হ্যাঁচড়া করছে অবশিষ্ট গার্ড। হঠাৎ স্থির হয়ে গেল সে, তারপর মেশিনগানের নলটা আকাশের দিকে তুলল।

সময় নিয়ে লক্ষ্যস্থির করেছে, তারপর পিস্তলের ট্রিগার টিপে দিল রানা। লোকটাকে ঝাঁকি খেতে দেখল ও। তাঁবুর ভিতর মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে, গুলিটা নিশ্চয়ই তার বুকের বাম পাশে

লেগেছে, তা না হলে ওখানে হাত চেপে ধরবে কেন।

মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল রানা, দেখল কয়েক গজ উপরে ঝুলছে হলুদ যান্ত্রিক ফড়িং, ওদের সিগনাল পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে পাইলট। মাত্র কয়েক গজ, তাও অনেক উঁচু। ওর হাত প্রথমে একটা V তৈরি করল, তারপর X, এভাবে V ও X বারবার।

কপ্টার ইঞ্জিনের গর্জন ও রোটরের বাতাস বেড়ে গেল। আরও নীচে নামছে পাইলট। গোঁফ-দাড়িতে ঢাকা ও উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত মুখটা উঁকি দিল জানালা থেকে। পরমুহূর্তে ঝপ করে নীচে নেমে এল মইটা, ওদের মাথার উপল দোল খাচ্ছে।

আবার হাত নাড়ল রানা, এই সংকেতের অর্থ–বিপদ। হাসি উবে গিয়ে সতর্কতা ফুটে উঠল চিনে-চ্যাপ্টা চেহারায়। হাত দিয়ে রাস্তার দিকটা ইঙ্গিত করল রানা, যদিও এই মুহূর্তে কোথাও কোনও নড়াচড়া বা শব্দ নেই।

'ফালান!' বেল্টে হাত দিল রানা।

প্রকাণ্ড একটা প্যান্থারের মত সাবলীল ভঙ্গিতে লাফ দিল ফালান। মই বেয়ে ওঠার সময়ও এক হাতে রেডি রেখেছে অস্ত্রটা।

ঝুলন্ত মইটা ধরল রানা, ওটার সঙ্গে সংযুক্ত বাড়তি এক প্রস্থ রশি জড়িয়ে নিল কবজি ও হাতে, অনুভব করল হ্যাঁচকা টান দিয়ে শূন্যে তুলে নেওয়া হলো ওকে, ঠিক যেন সুতোর ডগায় ঝুলছে একটা পুতুল।

কানের পরদা ফাটানোর মত আওয়াজ হলো, রানার মাথার পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল রাইফেলের দুটো বুলেট। মাজল ফ্ল্যাশ দেখতে পেল রানা, তাঁবুর উল্টোদিকে। রাস্তা থেকে ফিরে আসছে বাকি গার্ডরা।

এক সেকেন্ড পরে আরও দুটো গুলি হলো। প্রথম বুলেট

পুরোপুরি টার্গেট মিস করেনি, মইয়ের একটা অংশ ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল। দ্বিতীয় বুলেট ফুয়েল ট্যাঙ্কে লেগে টং করে আওয়াজ করল। ট্যাঙ্কটা ফুটো হওয়ারই কথা, তবে সত্যি হয়েছে কি না বুঝতে পারছে না রানা।

পর পর দুটো গুলি করে জবাব দিল ফালান। পরমুহূর্তে পিন খুলে হাতের গ্রেনেডটা জঙ্গলের কিনারা লক্ষ্য করে ছুঁড়ল রানা।

একসঙ্গে অন্তত বারোটা রাইফেলের টার্গেট হতে যাচ্ছিল রানা ও ফালান, এই সময় ফিরে আসা গার্ডদের মাঝখানে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড। নীচে ধুলো ও ধোঁয়ার মেঘ দেখতে পাচ্ছে রানা। জঙ্গলের খানিকটা উড়ে যাওয়ায় বীভৎস গর্ত তৈরি হয়েছে। অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল সেই গর্তে এলোমেলো, বিদঘুটে ভঙ্গিতে গাদা হয়ে আছে রক্তাক্ত মানুষের কিছু ভাঙাচোরা আকৃতি।

আরও খানিক পিছন দিক থেকে দু'একটা রাইফেল আবার গর্জে উঠল। তবে তার আগেই ফালান ও রানাকে নিয়ে জঙ্গলের মাথা থেকে বেশ কিছুটা উপরে উঠে এসেছে মইটা।

উত্তরদিকে ছুটল ওদের কপ্টার। ফালান ও রানাকে নিয়ে ধীরে ধীরে ওটার ভিতর ঢুকল মইটা।

'বাইরে অতক্ষণ ঝুলিয়ে রাখার জন্যে দুঃখিত,' বলল পাইলট, হাত দিয়ে পিছনদিকের সরু সিটটা দেখাল। 'আরাম করে বসুন। ছোট্ট জায়গা, ফ্যাসিলিটির অভাব।' তারপর সরু চোখ দুটো একটু বড় করল। 'পাল্টা গুলি করছেন দেখে খুশি হয়েছি। আমার তো কিছুই করার ছিল না। আপনারা কেউ আহত হননি তো?'

'না, আমরা ঠিক আছি,' বলল রানা, অবাক হয়ে ভাবছে গোলাগুলির ব্যাপারটাকে এরকম স্বাভাবিক ভাবে নেওয়ার কারণ কী?

'ওরা জেনারেল উ নিমুচির লোক, তাই না, মিস্টার রানা?'

জিজ্ঞেস করল পাইলট।

'আপনি জানলেন কীভাবে?'

'কমরেড হুনান হোর রেডিও মেসেজ থেকে। একটু আগে সাবধান করে দিলেন আমাকে, বললেন গোলাগুলিও হতে পারে।'

'আপনার সাহস ও দক্ষতার প্রশংসা করতে হয়,' বলল রানা। 'অসংখ্য ধন্যবাদ, মিস্টার চৌ চি। আমার নাম তো জানেনই, আর এ হলো থোন ফালান।'

'ওয়েলকাম।' ঘাড় ফেরাল সে, কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখল দুজনকে। 'জানতে পারি, ওদিকের পাহাড় ও জঙ্গলে কী এমন আছে যে এত বিপদ ঠেলে যেতে হচ্ছে আপনাদেরকে?'

'দুঃখিত, বলা যাবে না,' বলল রানা, পা দুটো লম্বা করবার জায়গা খুঁজছে। 'বললেও আপনি বিশ্বাস করবেন না।'

'বুঝেছি,' হেসে উঠল চি। 'সিক্রেট ব্যাপার-স্যাপার।'

'হ্যাঁ, টপ সিক্রেট,' বলল রানা। 'এতই টপ যে আমাদের অস্তিত্ব আছে কি না তাও আপনি জানেন না।'

'ঠিক আছে, জানি না।' চিন্তিত দেখাল চৌ চিকে, শ্রাগ করল। 'যেখানে ড্রপ করব, ওই জায়গা সম্পর্কে আপনাদের ধারণা আছে তো?'

'খুব ভাল ধারণা আছে,' রানা নয়, জবাব দিল ফালান।

'তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতি সম্পর্কে নয়,' বলল চি।

কপ্টারের স্পিড বেড়ে যাওয়ায় ওদের মনে হলো নীচের সবুজ বনভূমি সবেগে পিছিয়ে যাচ্ছে। দ্রুত কথা বলে চলেছে পাইলট, ড্রপ জোন থেকে লেমিয়েথনার দিকে যাওয়ার পথে কী দেখতে পাবে সে-সম্পর্কে সম্ভাব্য একটা ধারণা দিচ্ছে ওদেরকে। দু'একটা প্রশ্ন করে কিছু তথ্য জেনে নিচ্ছে রানা।

পাইলটের লেকচার ফালানও শুনছে, মাঝে মধ্যে মাথা নাড়ছে বা ঝাঁকাচ্ছে সে, তবে কোনও মন্তব্য করছে না।

পাইলট চি জানাল, লেমিয়েথনায় যাওয়ার পথে মিউচুয়াল ভেঞ্চারের গার্ডরা সব মিলিয়ে ক্যাম্প ফেলেছে তিনটে। একটা থেকে খানিক আগে পালিয়ে এসেছে রানা ও ফালান। দ্বিতীয়টা এখান থেকে বেশ খানিক দূরে, জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের মাথায়। আর তিন নম্বর ক্যাম্পের দেখা মিলবে হাইওয়েতে।

সবশেষে চৌ চি বলল, 'এ-সব কথা কমরেড হুনান হো-ই আপনাকে জানাতে বলেছেন।'

রানা আর জিজ্ঞেস করল না এত সব তথ্য হুনান হো জানল কীভাবে। যেখানেই থাকুক, তথ্য সংগ্রহের অনেক উৎস থাকে একজন এসপিওনাজ কর্মকর্তার। 'আমার জন্যে কমরেড এয়ার কমোডর কোনও মেসেজ পাঠাননি?' জানতে চাইল ও।

মৃদু শব্দে হাসল পাইলট। 'হ্যাঁ, একটা মেসেজ আছে।'

'বলুন।'

'রাস্তায় একা শুধু আপনাকে বাধা দেয়া হচ্ছে না,' বলল চি। 'আপনার প্রতিপক্ষকেও দেরি করিয়ে দেয়ার চেষ্টা চলছে।'

ভ্রূ কোঁচকাল রানা। 'সেটা কীভাবে?'

'টপ সিক্রেট,' বলে হাসল চৌ চি। 'না, এমনি ঠাট্টা করছিলাম। আপনার এজেন্সিকে দিয়ে কাজটা করানো হচ্ছে, পরিবহন সুবিধা ও সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করছেন কমরেড হো।'

নীচের সবুজ শামিয়ানা ওঠা-নামা করছে। কারণ, জঙ্গলটা কখনও চড়াই ধরে পাহাড়ে উঠেছে, কখনও উতরাই ধরে নেমে গেছে উপত্যকায়। যত দূর দেখতে পাচ্ছে রানা, বনভূমির সবুজ চাদর প্রায় অবিচ্ছিন্ন। মাঝে মধ্যে দু'একটা ফাঁকা জায়গা ও সরু ট্রেইল চোখে পড়ল বটে, তবে সেগুলো এত ছোট যে কোনও ক্যাম্প ফেলা সম্ভব নয়, সম্ভব নয় কপ্টার ল্যান্ড করানো।

তবে সামনে ওদের জন্য কোথাও একটা ল্যান্ডিং পয়েন্ট আছে। এয়ার কমোডর হুনান, চৌ চি ও ফালানের অন্তত তাতে

কোনও সন্দেহ নেই। তবে সেটা গত কয়েক দিনের বৃষ্টিতে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়লে আলাদা কথা।

*

পাজেরোর ব্যাকসিটে ঘুম ভাঙার পর শরীরটা আগের চেয়ে সুস্থ লাগছে কর্নেল হুদার। জ্বর বোধহয় এখন আর নেই, বাম কাঁধের ব্যথাটাও কমেছে।

তার বডিগার্ড ভোজনের আয়োজন করে রেখেছে, একটা ট্রেতে সাজিয়ে পরিবেশন করল সে। ভরপেট খাওয়াদাওয়ার পর একটা চুরুট ধরাল হুদা। তারপর বডিগার্ডের হাত থেকে লম্বাটে একটা গ্লাস নিল, তাতে উদার হস্তে ঢালা হয়েছে ব্র্যান্ডি।

খানিক পর গাড়ি থামাল ড্রাইভার। প্যাসেঞ্জার সিটে বসতে না বসতেই ঘুমিয়ে পড়ল সে, রীতিমত নাক ডাকছে। তার বদলে ড্রাইভিং সিটে রয়েছে এখন বডিগার্ড।

খুব জোরে ছুটছে পাজেরো, নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে কিছু আগেই লেমিয়েথনায় পৌঁছে যাবে বলে আশা করছে তারা। সর্বশেষ রিপোর্টে জানা গেছে, রানা এখনও ধরা পড়েনি। তবে তাদের হিসাব বলছে, ওর চেয়ে এগিয়ে আছে পাজেরো।

হঠাৎ বিকট শব্দ করল পাজেরোর টায়ার। ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি। দ্রুত গিয়ার বদল হলো, রাস্তাটাকে মনে হলো উল্টোদিকে ছুটছে।

'এই, কী করছ তুমি?' হুঙ্কার ছাড়ল হুদা।

'ফিরে যাচ্ছি, কর্নেল, সার,' বডিগার্ড জবাব দিল।

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি, হারামখোর কাঁহিকে! কিন্তু কেন?'

'সামনে একটা চাইনিজ ট্রাক দেখলাম, সার। আড়াআড়িভাবে দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার মাঝখানে। তবে লোকগুলোকে দেখে চিনা মনে হলো না, খুব সম্ভব বাঙ্গালী। ওরা ভান করছে যান্ত্রিক গোলযোগ, মেরামত করার চেষ্টা চলছে...'

‘ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে অন্য রাস্তা না ধরে উপায় নেই,’ বলল হুদা। পকেট থেকে ম্যাপ ও মিনি রেডিওটা বের করল সে। চিনাদের শয়তানি সম্পর্কে রিপোর্ট করবে জেনারেল উ নিমুচিকে।

কিন্তু তা আর হলো না, কারণ একটু পরেই বাঁক নিয়ে খানা-খন্দে ভরা সরু কাঁচা রাস্তায় পড়ল পাজেরো। সারাক্ষণ ঝাঁকি খাচ্ছে গাড়ি, দু’পাশের ডালপালা ভাঙতে ভাঙতে হেলেদুলে এগোচ্ছে। উহ্-আহ্ করে কাতরাচ্ছে হুদা, কাঁধের কাঁচা ক্ষতটায় আবার নতুন করে ব্যথা শুরু হয়েছে।

রেগেমেগে বডিগার্ডকে বলল হুদা, ‘এভাবে নষ্ট করার মত সময় নেই হাতে। এরপর কোনও বাধা দেখলে গুলি করে পথ করে নেব আমরা।’

আয়নার ভিতর দিয়ে হুদার দিকে তাকাল বডিগার্ড। ‘সার, সময় নিয়ে চিন্তা করবেন না। এই পথে কিছুটা কষ্ট হলেও, এটা শর্টকাট, সময় বরং বাঁচবে আমাদের।’

‘সেক্ষেত্রে প্রথমে এই পথটাই ধরা উচিত ছিল,’ বলল হুদা, তবে কম্বলের স্তূপে হেলান দিয়ে চোখ বুজল সে, খানিকটা সন্তুষ্ট বোধ করছে। তার সহকারীরা নিজেদের কাজ বোঝে।

লেমিয়েথনা।

খামারবাড়ির প্রাসাদতুল্য বিশাল অট্টালিকার ভিতর এরইমধ্যে সব কিছু তছনছ ও ভেঙেচুরে একাকার করে ফেলেছে সৈন্যরা। দরজাগুলো খোলবার জন্য চাবি দিতে চাইলেন ইরাবতি, কিন্তু শুনতে না পাওয়ার ভান করে এক এক করে ভাঙা হলো সেগুলো।

এই মুহূর্তে তারা তাঁর সাধের বাগানটা ধ্বংস করছে, প্রতিটি চারাগাছ এমনভাবে টেনে উপড়ে ফেলছে যেন ওগুলোর প্রতিটার নীচে একটা করে লাশ লুকানো আছে।

বৃদ্ধা ইরাবতি ধীর পায়ে ওদের সঙ্গে হাঁটছেন, বয়সের ভারে একটু কুঁজো হয়ে আছে শরীরটা। বাড়িটার কথা ভেবে রীতিমত শোক অনুভব করছেন তিনি, কারণ প্রতিটি কামরা তাঁর মরহুম স্বামী নিজের পছন্দ মত করে সাজিয়েছিলেন—তাঁর সমস্ত স্মৃতি আজ নষ্ট হয়ে গেল।

তবে শোক নয়, তাঁকে অসুস্থ করে তুলছে নানারকম ভয়। তাঁর খামারবাড়িতে কয়েক শো কৃষি-শ্রমিক কাজ করে, তাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে উদ্বেগ বোধ করছেন তিনি। শয়তান জেনারেল হুমকি দিয়ে বলেছে, শারমিনের বাগানবাড়ি থেকে নিয়ে আসা পেন ড্রাইভটা তার হাতে তুলে না দিলে তাঁর সামনে ওদেরকে টরচার করা হবে।

এরা সবাই ইরাবতির পুরানো লোক, বছরের পর বছর ধরে কাজ করছে তাঁর কাছে। তাদের ভাল-মন্দ সব তাঁকেই দেখতে হয়। এখন যদি তাদের কারও একমাত্র ছেলেকে মাটিতে আছাড় মেরে খুন করতে চায় সৈন্যরা, কী করবেন তিনি? কীভাবে ঠেকাবেন?

একদল সৈন্য আগেই ফসলের খেতে চলে গেছে। তার

লোকজনকে অকারণে মারধর করছে তারা, লাশের কথা জিজ্ঞেস করছে, যেখানে সন্দেহ হচ্ছে সেখানেই কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে দেখছে নীচে কিছু পাওয়া যায় কি না।

তবে এখন পর্যন্ত তাঁর গায়ে হাত তোলেনি ওরা কেউ। বাড়ির ভিতর তাঁর যে-সব লোকজন কাজ করছে তাদেরকেও মারধর করেনি।

বৃষ্টিভেজা একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়ালেন ইরাবতি। খুব বেশি হাঁটেননি, তাতেই হাঁপিয়ে উঠেছেন। থোন ফালানের কথা ভাবলেন তিনি। সে-ই তাঁর একমাত্র ভরসা। হে আল্লাহ, সে যেন কোনও না কোনও সাহায্য নিয়ে ফিরতে পারে!

পোয়া মোয়া বনভূমির উপর দিয়ে উড়ে চলেছে হলুদ যান্ত্রিক ফড়িংটা।

কপ্টারের ভিতর ওদের আলাপ থেমে গেছে। যুদ্ধে যাওয়ার কিংবা বিদ্রোহে প্ররোচনা দেওয়ার উদাত্ত আহ্বান আছে, চিনা ভাষায় এরকম একটা গান গাইছে চৌ চি। না দেখলে রানা বিশ্বাস করত না, অদৃশ্য শত্রুকে শাসাবার সময় এমনভাবে চোখ রাঙাচ্ছে সে, যেন তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে তারা। সকৌতুকে ভাবল ও, না থাকাতেই এই অবস্থা, থাকলে না জানি কী করত!

নীচের দিকে তাকাল রানা। কখনও কাঠুরেদের দু'একটা কুঁড়ে চোখে পড়ছে। গাছপালা কেটে চাষাবাদের উপযোগী করা হয়েছে কিছু উপত্যকা। তবে বনভূমির বেশিরভাগটাই এত নিবিড় যে ঠিকমত রোদও বোধহয় ছুঁতে পারে না মাটি।

এই কেস সম্পর্কে কী জানে স্মরণ করছে রানা। থোন ফালান ওকে জানিয়েছে শায়লা শারমিন কীভাবে তার চাচীর খামারবাড়িতে পৌঁছায়। সেই মুহূর্তের বিশদ বর্ণনা ম্যাডাম ইরাবতির কাছ থেকে পেয়েছে ফালান।

চাচীর বাড়িতে পৌঁছে টলছিল শারমিন, হড়হড় করে রক্তবমি করছিল।

কাকের মত কর্কশ ছিল শারমিনের কণ্ঠস্বর : 'চা-চী...আ-মা-কে লু-কি-য়ে রা-খো...উ নিমুচি...আ-জ-ম-ল হু-দা...বা-ং-লা-দে-শ...পু-রা-নো জ-রি-প...অরক্ষিত জলসীমা...'

কীসের জরিপ, কবে কারা করেছিল, কোন্ দেশের অরক্ষিত জলসীমা? কিছুই পরিষ্কার নয়। তবে ওর বেল্টের ভিতর লুকানো পেন ড্রাইভটা পেলে জানা যাবে সব।

ম্যাডাম ইরাবতির ধান খেতে কবর দেওয়া হয়েছে শারমিনকে। ওর কালো বেল্টটা এখন ওই বৃদ্ধার কাছেই থাকার কথা।

একা শুধু ইনফরমার নিদানি নয়, ওর স্পাই বন্ধু হুনান হো-ও রানাকে জেনারেল উ নিমুচি সম্পর্কে একটা ধারণা দিয়েছে। স্যাডিস্ট ও প্রচণ্ড লোভী, কর্নেল হুদার বিজনেস পার্টনার।

এখন প্রশ্ন হলো, এই বিপদসঙ্কুল যাত্রার শেষে ওর জন্য ঠিক কী অপেক্ষা করছে? পেন ড্রাইভটা দখল করবার একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। কিন্তু রানার জানবার কোনও উপায় নেই ওর প্রতিদ্বন্দ্বী কর্নেল হুদা এখন কোথায়। তারই আসলে এগিয়ে থাকবার কথা, কারণ ওর আগে রওনা হয়েছে সে। ওর মত হুদাও কপ্টার ব্যবহার করছে কি না কে জানে।

তবে আরও বড় একটা সুবিধে পাচ্ছে হুদা, তার প্রসারিত একটা বাহু এরইমধ্যে হয়তো পৌঁছে গেছে লেমিয়েথনায়: জেনারেল উ নিমুচি।

স্যাডিস্ট লোকটা নির্যাতন চালাচ্ছে বৃদ্ধা ইরাবতির উপর?

রানার মনে অন্য একটা প্রশ্ন জাগল: 'আচ্ছা, ফালান,' শান্ত ভাবে জানতে চাইল ও, 'এরকম অজ পাড়াগাঁয়ে কী কারণে পড়ে আছেন তোমার ম্যাডাম?'

চিন্তার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এল ফালান, মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল। 'চাল,' সংক্ষেপে জানাল সে।

'কী?'

'চাল। কিছু চা, অল্পস্বল্প রাবারও। কারণ এগুলো ফলানোর সঙ্গে আমার মনিব, অর্থাৎ তাঁর স্বামীর স্মৃতি জড়িয়ে আছে।' তারপরও রানা তাকিয়ে আছে দেখে আরেকটু ব্যাখ্যা করল সে। 'স্বামীর প্রতি এখনও এত ভালবাসা ম্যাডামের, তাঁর আমলের সব কামলাকে নিজের খামারে থাকা-খাওয়ার স্থায়ী ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কাজের সন্ধানে বাংলাদেশ থেকে কেউ এলে আমার মনিব যেহেতু তাকে ফেরাতেন না, তাই আজ পর্যন্ত ম্যাডামও ফেরাননি।'

'তাতে তাঁর সমস্যা হয় না?' জানতে চাইল রানা।

'হয় বইকি। এরকম আরও অনেক সমস্যা আছে তাঁর। সব তিনি সমাধান করেন জেনারেল নিমুচিকে কমবেশি হাজার মণ ধান ঘুষ দিয়ে।'

এরপর দুজনেই চুপ করে থাকল। যতই উত্তরে যাচ্ছে ওরা ততই দৃষ্টিসীমা ছোট হয়ে আসছে। সাদাটে কুয়াশায় ঘূর্ণি তুলে ছুটে চলেছে ওদের কপ্টার। এক সময় গান থামাল চৌ চি। বৃষ্টি শুরু হওয়ায় ওদের মাথার উপর প্লাস্টিকের বদ্বুদ ঝাপসা হয়ে গেল।

চোখ বুজে পেশিগুলোকে শিথিল করে দিল রানা। তন্দ্রা মত চলে এল, স্বপ্নে দেখছে নির্জন বৃষ্টিভেজা সৈকতে একা মরে পড়ে আছে তিসতা।

'সর্বনাশ!' চিনা উচ্চারণে ইংরেজিতে বলল চি, তাকিয়ে আছে ফুয়েল গজ-এর দিকে। 'ফুয়েল ট্যাঙ্ক ফুটো হয়ে গেছে!'

'ওহ্ গড!' ঝট করে চোখ মেলল রানা। 'এখন উপায়?'

'আপনাদেরকে এখানেই কোথাও নামিয়ে দিয়ে ফিরতি পথ

ধরতে হবে আমাকে,' বলল পাইলট। 'ফুয়েল পড়ছে ধীরগতিতে, আধ ঘণ্টার মধ্যে রওনা হলে নিরাপদে ঘাঁটিতে ফিরে যাবার একটা চান্স আছে।'

'ঠিক আছে, তাই করুন,' বলল রানা। 'বাকি পথ আমরা হেঁটে যাব।'

'বৃষ্টি,' হঠাৎ বলল পাইলট। 'তার ওপর কুয়াশা। আপনাদেরকে লাফ দিতে হবে অন্ধকারে।'

রানা দেখল আগের চেয়ে আরও ঘন হয়েছে কুয়াশা, ওদের চারপাশে টগবগ করে ফুটছে যেন।

ঘাড় ফিরিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে চৌ চি, চোখে-মুখে উদ্বেগ। 'আর আধ ঘণ্টার মধ্যে কুয়াশা যদি না সরে, কী করব আমি জানি না,' বলল সে। 'নীচের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আল্লাহই জানে কীসের মধ্যে আপনাদেরকে ড্রপ করতে যাচ্ছি।'

বাইরে তাকিয়ে কুয়াশার সাদা চাদর ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না রানা। 'আর একটু নীচে নামতে পারি না আমরা?'

'সম্ভব নয়। মগডালের ঠিক ওপরে রয়েছি, আর মাত্র কয়েক ফুট নামলেই অ্যাক্সিডেন্ট করব। তা ছাড়া, কুয়াশা হয়তো জঙ্গলের জমিনকেও ছুঁয়ে আছে...' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল চি।

ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছে রানা, মনে মনে তিক্ত একটা মন্তব্য করল যারা আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে তাদের সম্পর্কে। 'ঠিক আছে। যতটা পারা যায় কম ঝুঁকি নিন আপনি। ভাল একটা স্পট পেলেই নামিয়ে দিন আমাদেরকে। নীচে কিছু যদি দেখা না-ও যায়, তবু।।'

'তা হলে আর বাঁচতে হবে না...'

মাথা নাড়ল রানা, বলল, 'বরং মরতে হবে না, শুধু যদি স্পিড একটু কমিয়ে রাখেন আপনি। তবে আপনার জন্যে বেশ খানিকটা

ঝুঁকি আছে এর মধ্যে...'

'আরে!' চি বিস্মিত, কণ্ঠস্বরে সামান্য তিরস্কারের সুর। 'সে তো আমি জানিই। প্রয়োজনে আমাকে মৃত্যুর ঝুঁকি পর্যন্ত নিতে বলেছেন কমরেড এয়ার কমোডর হো। আপনি আমাকে যেমন অর্ডার করবেন আমি তেমনি সার্ভিস দেব। আমার কী হলো না হলো তা আমি গ্রাহ্য করি না।'

'কথার লাগাম একটু টেনে ধরুন, চি,' হালকা সুরে বলল রানা। 'আপনি গ্রাহ্য না করলেও, আমি করি। এবার মন দিয়ে শুনুন ঠিক কী করতে চাই আমি।'

শান্তভাবে প্ল্যানটা বলে গেল রানা। শুনে কোনও মন্তব্য না করে চি শুধু মাথা ঝাঁকাল।

দশ মিনিট পর। চি জানাল, আর পাঁচ কিলোমিটার দূরে ওদেরকে ড্রপ করবে সে। একটা হিসাবও দিল সে, ড্রপ জোন থেকে লেমিয়েথনার দূরত্ব সত্তর কিলোমিটার।

এদিকে বৃষ্টি ও কুয়াশা দুটোই আগের চেয়ে বেড়েছে। যেন বাতাস নয়, সুপের ভিতর ধীরে ধীরে ঘুরছে রোটর ব্লেড।

'এদিকটা বেশ নিচু,' বলল চি। 'বন বলতে যা বোঝায় তেমন নয় আর কী, বড় বড় গাছপালার বদলে ঝোপ-ঝাড় ও লতাপাতাই বেশি। এখনও অবশ্য দেখতে পাচ্ছি না, তবে আমি জানি ওরকমই হবে। আপনারা রেডি?'

'রেডি।'

যেন ফুলের উপর একটা মৌমাছি, শূন্যে দাঁড়িয়ে পড়ল কপ্টার।

'ওকে। বেরিয়ে পড়ুন।'

সাপের মত এঁকেবেঁকে নামল, তারপর কুয়াশার মধ্যে হারিয়ে গেল রশির মইটা। ওটা ধরে ঝুলে পড়ল রানা। কয়েক ধাপ পিছনে থেকে ওকে অনুসরণ করছে ফালান।

রানা জানে সূর্য এখনও দিগন্তরেখার উপরে কোথাও আছে, কারণ কুয়াশার পুরু চাদরের ভিতর থেকে ধূসর আলো বেরিয়ে আসতে দেখছে ও। তবে আলোর ওই ম্লান আভাটুকুই, তার বেশি কিছু নয়।

ভিজে বাতাসে অলস একট ভঙ্গিতে দোল খাচ্ছে রানা। এই সময় ওর নীচে প্রায় গোলাকার, অস্পষ্ট আকৃতি দেখতে পেল। ঝোপ!

তারপর আর কোনও আকৃতি চোখে পড়ল না। পায়ের নীচে শূন্যতা, যতটা না দেখতে পাচ্ছে তারচেয়ে বেশি অনুভব করছে রানা। এখানেই! ফালানের ট্রাউজারের কিনারা ধরে মৃদু টান দিল ওর হাত, আর ঠিক তখনই...

শব্দটা শুনে রানার মনে হলো যেন কোনও কাঠের সেতু ভেঙে পড়ছে, প্রচণ্ড চাপে কুয়াশার ভিতর বিস্ফোরিত হচ্ছে তক্তা ও পিলারগুলো। কিছু একটা আঘাত করল মইয়ে, রশির খানিকটা ছিঁড়ে যাওয়ায় ঝাঁকি খেল ওর শরীর। শুধু ছুঁয়ে গেছে একটা তপ্ত বুলেট, তা-তেই বাম হাতের আঙুল এমন জ্বালা করছে, যেন আগুনের শিখায় ঠেকিয়েছে ওগুলো।

পরমুহূর্তে ওর গোটা জগৎ ভরে উঠল একটানা গা রিরি করা কর্কশ শব্দে, সেই সঙ্গে মইটা এত ঘন ঘন ঝাঁকি খাচ্ছে; মনে হলো ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে শরীরটা।

লেমিয়েথনা, খামারবাড়ি। বাড়ির টেরেসে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছে।

'ম্যাডাম ইরাবতি, সত্যি আমি ভীষণ দুঃখিত,' চেহারায় বিব্রত ভাব, ক্ষমা-প্রার্থনার সুরে বলল জেনারেল উ নিমুচি। 'তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিছুই আমরা পাইনি। আপনাকে অযথা কষ্ট দিলাম। দেখা যাচ্ছে ভুল তথ্য দেয়া হয়েছিল আমাকে।'

মুখে যাই বলুক, মনে মনে নিমুচি ভাল করেই জানে, কেউ

তাকে কোনও ভুল তথ্য দেয়নি। তার ভাইপো থুইমুইকে খুন করবার পর চাচী ইরাবতির খামারবাড়ি ছাড়া যাওয়ার মত আর কোনও জায়গা ছিল না শায়লা শারমিনের।

তা ছাড়া, এই খামারবাড়ির কাছাকাছি থাকে, এমন এক লোক তাকে তথ্য দিয়েছে, বৃষ্টি মাথায় করে বস্তা বা লাশের মত কিছু একটা বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে খামারবাড়ির ওয়াইন সেলার থেকে। বের করে কোন্‌দিকে নিয়ে গেছে? ধান খেতের দিকে।

মুশকিল হলো ধান খেত বলতে বোঝায় কয়েক বর্গ মাইল জুড়ে বিশাল একটা এলাকা। লাশটাকে কোথায় মাটিচাপা দিয়ে রাখা হয়েছে কে জানে।

তবে সূত্র পাওয়ার জন্য, লাশটা আদৌ ওয়াইন সেলারে রাখা হয়েছিল কি না জানার জন্য, ওখানে একবার যাওয়া দরকার।

'আমি ধরে নিয়েছি আপনি নির্দোষ, লাশ লুকিয়ে রাখার মত কোনও ক্রাইমের সঙ্গে জড়িত নন,' নরম সুরে বলল নিমুচি। 'আমার এই বিশ্বাসকে আপনি আরও দৃঢ় করতে পারেন কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে। আলাপটা নিরিবিলি কোথাও হওয়া দরকার, তাই বলছি চলুন ওয়াইন সেলারে গিয়ে বসি।'

'ওয়াইন সেলারে!' দরজা আগলে দাঁড়িয়ে থাকা এইড, তারপর জেনারেলের দিকে দ্রুত একবার করে তাকালেন ম্যাডাম ইরাবতি। ভাবলেন, নিমুচি একা হলে জিদ ধরে হোক বা অন্য কোনওভাবে সময় পাওয়ার চেষ্টা করা যেত, যতক্ষণ না ইয়াংগন থেকে সাহায্য এসে পৌঁছায়। 'আপনার যদি রিফ্রেশমেন্ট দরকার থাকে তো বলুন, জেনারেল, এখানেই সব আনিয়ে দিচ্ছি। সেলার জায়গাটা ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে ও অন্ধকার, ওখানে কোন্‌ দুঃখে আলাপ করতে যাব?'

হেসে উঠল জেনারেল। 'এটা তো আমার নিজের বাড়ির

মতই, তাই না? যদি কিছু লাগে নিজেই নিতে পারি। কিন্তু না, রিফ্রেশমেন্ট নয়, আমার দরকার প্রাইভেসি। আপনি এখন বুদ্ধিমতীর মত আমাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন, ম্যাডাম ইরাবতি। সার্জেন্ট!' এইড অ্যাটেনশন হলো। 'আমাদের সঙ্গে এসো।'

'জেনারেল নিমুচি।' নিজের জায়গা ছেড়ে একচুল নড়ছেন না ইরাবতি, অবিচল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তার চোখে। 'আপনি নিজেই স্বীকার করেছেন, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগটা সত্যি নয়। এখন ওয়াইন সেলারে যাবার জন্যে এই অহেতুক জিদটা দয়া করে বাদ দিন। আলাপটাই বা কীসের? যে জিনিসের অস্তিত্বই নেই...'

'ওহ্, অস্তিত্ব আছে, ম্যাডাম। অবশ্যই আছে।'

'শুধু আপনার বিকৃত মস্তিষ্কে, জেনারেল নিমুচি,' দাঁতে দাঁত চেপে বললেন ইরাবতি।

নিমুচির চোখ দুটো অশুভ আলোর একজোড়া উৎস হয়ে উঠল। তার ঠোঁট কাঁপছে।

'জেনারেল, সার!' দুই গোড়ালি ক্লিক করল এইড। তার পাশে এখন আরেক লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে, উত্তেজনায় বড় ও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে চোখ দুটো। 'কথার মাঝখানে বাধা দেয়ার জন্যে মাফ করবেন, সার,' বলল এইড। 'কিন্তু করপোরাল বলছে রিপোর্টটা জরুরি।'

'কী রিপোর্ট?' খেঁকিয়ে উঠল জেনারেল। 'এই, কীসের রিপোর্ট?'

নতুন আসা সৈনিক একজন আদিবাসী, নিজের ভাষায় হড়বড় করে কথা বলতে শুরু করল। ইরাবতির হৃৎপিণ্ড যেন উল্টে গেল, তারপর ডাঙায় তোলা মাছের মত লাফাতে শুরু করল।

করপোরাল থামতে ইরাবতির দিকে ফিরল জেনারেল। তার

মাংসল মুখের দুদিকে সামান্য লালচে ভাব ফুটেছে। 'অবশেষে, ম্যাডাম। প্রমাণ হলো অস্তিত্ব আছে। এবং না, শুধু আমার বিকৃত মস্তিষ্কে নয়। একটা লাশ সত্যি পাওয়া গেছে!' আচমকা হাত চালাল সে, পটকা ফাটার আওয়াজ তুলে চড় কষাল বৃদ্ধার লোলচর্মসর্বস্ব গালে।

একটা পাক খেয়ে টেরেসের উপর পড়ে গেলেন ইরাবতি।

বুড়ো হাড়ে এই আঘাত তাঁর সহ্য না হওয়ারই কথা। আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্য চেহারাটা বিকৃত করছেন না ইরাবতি। ধীরে ধীরে, সার্জেন্ট ও জেনারেলের দিকে একবারও না তাকিয়ে, টেরেসের মেঝেতে নিজের পায়ে দাঁড়ালেন তিনি। মাত্র এক হাত দূর থেকে সকৌতুকে তাঁকে দেখছে উ নিমুচি।

একটা হাত কোমরে রাখলেন ইরাবতি, যেন ভারসাম্য রক্ষা করলেন। পরমুহূর্তে পটকা নয়, বোমা ফাটার আওয়াজ শুনতে পেল এইড। চমকে উঠল জেনারেল, একটা হাত গালে উঠে গেল। জায়গাটা হু-হু করে জ্বালা করছে।

জ্বলজ্বল করে জ্বলছে বৃদ্ধার দুই চোখও।

বুলেটগুলোকে এড়াবার জন্য ভাঁজ করা পা দুটো বুকের কাছে তুলে আনল রানা। অস্থির হেলিকপ্টারের নীচে রশির ছেঁড়া মই উন্মত্ত ভঙ্গিতে দোল খাচ্ছে। উপর থেকে দুর্বোধ্য একটা শব্দ শুনতে পেল ও, ফালানের গলা থেকে বেরিয়েছে। কার পুণ্যে কে জানে, গা রিরি করা কর্কশ শব্দের বুলেট বৃষ্টি মুহূর্তের জন্য থামল। আরেকটু উঁচু হলো মেশিন গানের মাজল, টার্গেট বদলে কপ্টারের দিকে গুলি করছে গানার। পরবর্তী পশলাটা বিস্ফোরিত হলো ফাঁকা আকাশে।

মাথার উপর রোটরের বাহুগুলো দ্রুতবেগে ঘুরছে, ওদের ছোট্ট বাহনটাকে আঁকাবাঁকা পথ ধরে উত্তরদিকে ছুটিয়ে নিয়ে

চলেছে চৌ চি। রানা অনুভব করল ওর হাত বেয়ে উষ্ণ ও ভেজা ভেজা কী যেন গড়িয়ে নীচে নামছে। পানি যে নয়, জানে ও।

'তুমি জখম হওনি তো, ফালান?' তীব্র বাতাস শব্দগুলোকে যেন মুখ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। তবে শুনতে পেল ফালান, জবাবও দিল। তার কথাগুলো রানার কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল।

'ভাল আছি, মিস্টার রানা। তবে এরকম ওড়াউড়ি পাখিদেরই ভাল মানায়।'

নিজেদের ভাগ্যকে ওদের এই কারণে ধন্যবাদ দিতে হয় যে এরকম পরিস্থিতি কীভাবে সামলাতে হয় সেটা খুব ভাল জানা আছে চৌ চির। তার দক্ষ হাত যান্ত্রিক কোলাহলের উৎসটাকে আঁকাবাঁকা পথ ধরে গাইড করে নিয়ে যাচ্ছে মগডালের যথেষ্ট উপর দিয়ে, আবার এত উপর দিয়ে নয় যে কোনও রকম সুযোগ থাকলে তার ঝুলন্ত আরোহীরা দেখতে পাবে না।

পনের মিনিট রুদ্ধশ্বাসে ঝুলে থাকবার পর রানা উপলব্ধি করল সুযোগ একটা তৈরি হচ্ছে। কমতে কমতে একেবারে থেমে গেল বৃষ্টি। কুয়াশার চাদরের ভিতর পাটে বসা সূর্যকে প্রচণ্ড শক্তিতে জ্বলতে দেখল ও, রোদের তাপে বিস্তৃত চাদরটা যেন মোমের মত গলে যাচ্ছে।

ওদের নীচে কুয়াশার চাদর অলস ভঙ্গিতে বাতাসে মিলিয়ে যেতে শুরু করল, ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হয়ে পড়ল খাটো গাছ দিয়ে ঘেরা ফাঁকা একটা জায়গা।

'এখানেই!' চেঁচিয়ে উঠল রানা।

মৃদু ঝাঁকি খেল কপ্টার, দ্রুত দিক বদলে ফাঁকা জায়গাটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। দুই চক্কর দেওয়ার পর ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল। নীচের আগাছা, ঘাস ও কচুপাতার দিকে নয়, বরং যেন গাছগুলোর দিকে। তারপর শূন্যে থেমে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

গাছগুলোকে লক্ষ্য করে লাফ দিল রানা। ওর বাড়ানো হাত জড়িয়ে ধরল মোটা, ভেজা একটা কাণ্ড। তারপরেই মাথা ঘুরিয়ে দেখতে চেষ্টা করল ফালান কী করছে।

হালকা ভঙ্গিতে লাফ দিল ফালান, লতাপাতায় ঢাকা মাটিতে নামল, পরমুহূর্তে শরীরের নীচে কিছু না পেয়ে তলিয়ে যেতে শুরু করল। আঁতকে উঠল সে। 'বাঁচান!'

গাছের কাণ্ড থেকে তার দিকে লাফ দিল রানা, নরম কচুপাতা ও আগাছায় নামল, দেখল মাটির তলায় দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ফালান। তাকে ধরবার জন্য বিদ্যুৎবেগে হাত দুটো বাড়াল ও, একটা কাঁধ ও হাতের কবজি ধরে ফেলল, শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে টানছে। বড়সড় দেহটা ধীরে ধীরে উপরে, ওর দিকে উঠে আসছে। বিস্ময়ে ও ব্যথায় আরও মোচড় খেয়ে আছে ফালানের বুলডগ মুখ, মাথার কুলি হ্যাট খুলির পিছন দিকে ঘুরে গেছে।

'ডেভিল'স ট্র্যাপ!' হাঁপাচ্ছে ফালান, আংশিক দৃশ্যমান গর্ত থেকে তুলে আনছে পেশল নিতম্ব। শেষ আরেকটা টান দিল রানা, ওর পাশে উঠে এল সে, রাগে গজ গজ করছে।

তার বাম গোড়ালির খানিক উপরে এবড়োখেবড়ো অগভীর ক্ষত দেখল রানা, এই মাত্র রক্ত বেরুতে শুরু করেছে। অল্পের উপর দিয়ে গেছে ভেবে স্বস্তি বোধ করল ও, ফাঁদটার নীচে পড়লে না-ও বাঁচতে পারত ফালান।

খক খক করে কেশে উঠল কপ্টারের ইঞ্জিন। মুখ তুলে উপরে তাকাল রানা, দেখল উদ্বিগ্ন চেহারা নিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে চৌ চি।

প্রথমে আশ্বস্ত করে, তারপর ধন্যবাদ জানিয়ে হাত নাড়ল রানা। হাসি ও আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল দাড়ি-গোঁফে ঢাকা চৌ চির চেহারা, সে-ও হাত নাড়ল ওদের উদ্দেশে। একটু কাত হলো কপ্টার, তারপর উপরে উঠল, দ্রুত দিক বদলে চলে গেল

দক্ষিণে—যেদিক থেকে এসেছে। কুয়াশার ভিতর হারিয়ে গেল ওটা।

হাত তুলে বিদায় জানাল ফালান।

তারপর নিজেদের অজান্তেই প্রথমে ওরা দেখতে চাইল কোথায় পড়তে যাচ্ছিল। মাত্র অল্প একটু জায়গা দৃশ্যমান, তবে তাতেই ওদের কাছে পুরো ছবিটা পরিষ্কার ধরা পড়ল।

বিশাল পোয়া মোয়া বনভূমির কয়েক মাইলের মধ্যে এটাই একমাত্র ফাঁকা জায়গা, কপ্টার থেকে নামবার জন্য যে জায়গাটাকে আদর্শ বলে মনে করা হতে পারে। অন্তত ওরা এখানে নামতে চেষ্টা করতে পারে ভেবেই ফাঁদটা তৈরি করা হয়েছে।

ফাঁক ফাঁক করে ফেলা সরু ডাল দিয়ে তৈরি একটা মাচার উপর ছড়িয়ে রাখা হয়েছে কাটা ঝোপ, ব্যাঙের ছাতা, কচুপাতা ইত্যাদি। নীচে গভীর একটা গর্ত। গর্তের নীচে, মাটিতে গাঁথা রয়েছে চোখা করা ডগা সহ বাঁশ—ডগাগুলো বল্লমের মত তীক্ষ্ণ। পরিষ্কার বুঝল রানা, গর্তটার ভিতর সরাসরি পড়লে ফালানকে আর বাঁচতে হত না।

ফার্স্ট-এইড কিট খুলে তার ক্ষতটায় অ্যান্টিবায়োটিক মলম লাগাল রানা। ব্যান্ডেজ করবার জন্য নিজের শার্টটা ছিঁড়তে যাবে, বাধা দিয়ে ফালান বলল, 'না, মিস্টার রানা। আমার শার্ট। ওটা আপনার হাতের জন্যে লাগবে।'

ওদের শার্ট ছেঁড়ার আওয়াজ অকস্মাৎ কয়েক হাজার গুণ বেড়ে গেল, তারপর বিকট বিস্ফোরণে পরিণত হয়ে গোটা আকাশটাকে যেন ভরে তুলল।

আওয়াজটা কয়েক মাইল দূর থেকে ভেসে এল। আকাশে বিরাট একটা আগুনের বল দেখতে পেল ওরা। আগুনের গোলাটা কয়েক সেকেন্ড ঝুলে থাকল ওখানে, অবিশ্বাস্য উজ্জ্বলতা নিয়ে

জ্বলছে, তারপর পতন শুরু হলো ওটার। একটু পর প্রতিধ্বনি সহ আরেকটা বিস্ফোরণ ঘটল। তারপর নেমে এল নীরবতা।

নিজের ছেঁড়া শার্ট থেকে খসে পড়ল ফালানের হাত। 'প্রার্থনা করি মিস্টার চৌ চির আত্মা নির্বাণ লাভ করুক,' আবেগে কেঁপে গেল তার গলার স্বর।

বিস্ফোরণের পর আর কোনও শব্দ নেই—ম্যাচেটি দিয়ে কেউ ঝোপ কাটছে না, সার্চ পার্টিরও কোনও লক্ষণ নেই। তবু ওখান থেকে আরও গভীর জঙ্গলে সরে এসে নিজেদের ক্ষত ব্যান্ডেজ করল ওরা।

তারপর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথ করে নিয়ে এগোল দুজন। এখান থেকে লেমিয়েথনা এখনও বহু দূরে, সত্তর কিলোমিটার।

সতেরো

মশাদের কোরাসে কান ঝালাপালা। পচা পাতা, শ্যাওলা ও আগাছায় পুরু হয়ে থাকা জঙ্গলের মেঝে ওদের পায়ের চাপে দেবে যাচ্ছে। তীক্ষ্ণ ব্লেডের মত ধারাল পাতা ও কাঁটাবহুল ডালপালা খোঁচা মারছে মুখে। জোঁক ঘুরছে গায়ে, যেখানে খুশি ঢুকে গিয়ে কামড় দিচ্ছে লাল পিঁপড়ে। ওদের ছেঁড়া কাপড় ভিজে গেছে ঘামে।

প্রতি পদে নতুন ঝামেলা। প্রতিটি ধরাশায়ী কাণ্ড, কিংবা ডালপালার স্তূপ সম্ভাব্য ফাঁদ। এদিকে দিনের আলো দ্রুত কমতে

শুরু করছে।

এক জায়গায় থেমে খেয়ে নিল ওরা। দূর থেকে ভেসে আসা অস্পষ্ট আওয়াজ শুনে মনে হলো এদিকের জঙ্গলে মানুষ আছে।

'দেহাতি মানুষ? বাওয়ালি?' ফিসফিস করল রানা।

'হতে পারে,' বলল ফালান, চিন্তিত। 'দেখামাত্র গুলি করা উচিত হবে না।'

খাওয়া শেষ হতে আবার এগোল। গাছপালার ভিতর মাঝে মধ্যে আলোর ঝলক দেখতে পেল ওরা। টহল পার্টি?

দুজন এগোচ্ছে, নিঃশব্দ একজোড়া ছায়া; মাঝখানে কয়েক ফুট ব্যবধান। যে শব্দগুলো হচ্ছিল, পিছনদিকে মিলিয়ে গেছে সব।

সামনে পায়ে চলা সরু পথ দেখতে পেল ফালান। কিছুক্ষণ পর দেখল ওটার উপর দিয়ে গেছে আরেকটা পথ।

'হল্ট!'

শুনেই নিজের জায়গায় স্থির হয়ে গেল রানা। সন্দেহজনক কোনও নড়াচড়া দেখা যায়নি, একেবারে হঠাৎ অন্ধকার থেকে ফালানের সামনে বেরিয়ে এল টর্চের আলো। অন্ধ হয়ে গেল দুজনেই।

চোখে দেখতে না পেলে কী হবে, বার্মিজ ভাষায় ঝড় তুলছে ফালান, তবে গলা চড়াচ্ছে না। জবাবে কর্কশ শব্দে হেসে উঠল কে যেন, তারপর হুকুমের সুরে কিছু বলল।

এতক্ষণে দেখতে পাচ্ছে রানা কে ওদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছে। পরনের সবুজ ইউনিফর্মই বলে দিচ্ছে মিউচুয়াল ভেঞ্চারের গার্ড। খাটো, শক্ত-সমর্থ কাঠামো। এক হাতে রাইফেল, আরেক হাতে টর্চ। একপাশে সরে যাওয়ার সময় আবার কঠিন সুরে হুকুম দিল সে।

যেমন হাঁটছিল তেমনি হাঁটছে ফালান, ইতোমধ্যে আলোটা

সয়ে এসেছে তার চোখে। রীতিমত ঝাঁঝের সঙ্গে বলছে, 'নিজেদের লোকও যে চিনতে পারে না তাকে রীতিমত কঠিন শাস্তি দেওয়া উচিত। আসলেই তুমি মিউচুয়াল ভেঞ্চারের গার্ড, নাকি ভুয়া?'

পাশ কাটাবার সময় আচমকা দুই হাতে লোকটাকে আক্রমণ করল ফালান। এক হাত দিয়ে রাইফেলটা ধরে হ্যাঁচকা টান মারল, পরমুহূর্তে আরেক হাতের কিনারা দিয়ে কোপ মেরে থেঁতলে দিল কণ্ঠনালী।

হাতের অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে ভোঁতা একটা আওয়াজ করে ঢলে পড়ছে লোকটা, হাতের টর্চ মাটিতে ছিটকে পড়ে গড়াচ্ছে। ঝুঁকে রাইফেলটা তুলতে যাচ্ছে ফালান, অন্ধকার থেকে ওর পিঠ লক্ষ্য করে লাফ দিল আরেকজন গার্ড। ডাকাতের মত হা-রে-রে-রে আওয়াজ করছে লোকটা, ম্যাচেটি ধরা হাত মাথার উপর তোলা, মুহূর্তের মধ্যে ফালানের মাথাটাকে ঘাড় থেকে আলাদা করে দেবে।

লাফ দিল রানা। ওর পায়ের তলায় যেন স্প্রিং লাগানো আছে। লৌহকঠিন হাতে লোকটার ডান হাতের কব্জি ধরে টান দিল নীচের দিকে, একইসঙ্গে বাম হাতে ওর কনুইটা ঠেলে তুলল উপর দিকে। বেমক্কা মোচড় খেয়ে মার খাওয়া কুকুরের মত 'কেঁউ' করে আওয়াজ করল লোকটা। ম্যাচেটি ছেড়ে দিয়েছে আগেই, পরমুহূর্তে মড়াৎ করে ভেঙে গেল ওর কাঁধের হাড়। ইতিমধ্যে গড়িয়ে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে ফালান, লাফ দিয়ে সিধে হয়েই দেখল ওদের দিকে ছুটে আসছে আরেকজন গার্ড।

রানাও দেখেছে। হাত মুচড়ে-ধরা ডাকাত এখন ব্যথায় দু-ভাঁজ হয়ে গেছে। মাটিতে পড়ার আগেই এক কদম পিছিয়ে লাথি মারল রানা ওর কোমরে। ছুটন্ত লোকটার সামনে গিয়ে পড়ল ডাকাত, ফলে হোঁচট খেল সে। বাম পায়ের গোড়ালীর উপর

শরীরটা ঘুরিয়ে আরেক লাথি চালাল রানা দ্বিতীয় গার্ডের ঊরুসন্ধি লক্ষ্য করে। কুঁজো হয়ে গেল প্রতিপক্ষ, চোখজোড়া ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর ছেড়ে, স্পর্শকাতর নরম জায়গাটা দু-হাত দিয়ে চেপে ধরেছে। এই সুযোগে রাইফেলের বাঁট দিয়ে তার কানের নীচে প্রচণ্ড জোরে মারল ফালান।

ধুপ করে মাটিতে পড়ল লোকটা। ছটফট করল কিছুক্ষণ, তারপর স্থির হয়ে গেল। জ্ঞান হারাল, নাকি মারা গেল, দেখার সময় নেই; হাতে বেরিয়ে এসেছে পিস্তল, দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে ফালানের উদ্দেশে ইশারা করল রানা। পালাতে চায়।

নাহ্, যথাসম্ভব নীরবে সরে পড়তে চেয়েছিল, তা আর হলো না। হঠাৎ ঝোপের পিছন থেকে গর্জে উঠল একটা রাইফেল।

রানার কানের পিছনে, একটা বাঁশের গায়ে লাগল বুলেট, ফেটে চৌচির হয়ে গেল সেটা, মড়মড় শব্দে ভেঙে পড়ল একপাশে। পিস্তল তুলেই ঝোপের দিকে ফায়ার করল ও। চাপা আর্তচিৎকার শোনা গেল, তারপর পায়ের আওয়াজ—ওদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। দূর থেকে পরপর আরও তিনটে গুলিও হলো, বলা মুশকিল কাকে লক্ষ্য করে।

'ওটা সংকেত,' শান্ত স্বরে বলল রানা। 'কাছাকাছি ওদের আরও লোক আছে। চলো, তাড়াতাড়ি কেটে পড়ি। ওদিকে, বাঁশবাগানের ওই ফাঁক দিয়ে ঘাসের ভেতর।' ওটা যেহেতু পশ্চিম দিক, রানা ভাবছে শত্রুরা ধরে নেবে ওরা ওদিকে যায়নি। তা ছাড়া ঘাসগুলো যেমন উঁচু তেমনি ঘন, ভিতরে লুকালে চট্ করে কারও চোখে পড়বার ভয় নেই।

'জী, মিস্টার রানা!' ভক্তির আতিশয্যে একটা স্যালিউট দিয়ে ফেলল ফালান, তারপর রানার পিছু নিল।

ঘুর পথটা লেমিয়েথনায় পৌঁছাতে দেরি করিয়ে দেবে, তবে অবশ্যই পিছু নেওয়া শত্রুদের হাতে তুলে দেবে না ওদেরকে।

জানা কথা, আসবেই তারা।

ঠিকই এল। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে। প্রথম লক্ষণ, সরু ও শুকনো একটা ডাল ভাঙার আওয়াজ। তারপর কিছু খসখসে শব্দ, ঝোপের ভিতর সাবধানী ইঁদুরের হাঁটার মত। তবে এই ইঁদুরগুলো দু-পেয়ে, পুরোদস্তুর সশস্ত্র; তল্লাশি চালাচ্ছে। আর শব্দগুলো দ্রুত সরে যাচ্ছে ডানে-বাঁয়ে, ঘিরে ফেলা হচ্ছে ওদের।

আসলে কোনও আশা নেই, মারা যাওয়ার আগে কিছু লোককে মেরে রেখে যাবে, ব্যস—ঠিক করল রানা। কিন্তু সেটা আক্রান্ত হলে তবেই। তার আগে, বিপদ যত মারাত্মকই হোক, আত্মরক্ষার চেষ্টা করা দরকার।

সবচেয়ে ভাল কৌশল লম্বা ঘাসের ভিতর সম্পূর্ণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা।

এখন আর সময়ের কোনও মূল্য নেই।

খেপে আগুন হয়ে উঠেছিল জেনারেল উ নিমুচি। হারামজাদি বুড়ি তাকে চড় মেরেছে! কত বড় স্পর্ধা—সত্যি সত্যি মেরেছে তাকে! তবে সে, উ নিমুচি, সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েনি তার উপর।

চোয়াল ও গলা বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছিল, নোংরা হয়ে যাচ্ছিল তার টিউনিক, তাই তাড়াতাড়ি মুছে ফেলেছে ক্ষীণ স্রোতটা। বুড়ির আঙটি তার গাল কেটে দিয়েছে। শয়তানের সহচরী! সঙ্গে আজ এইড না থাকলে পাজী মেয়েলোকটা পালিয়েও যেতে পারত।

তবে এখন আর সে ভয় নেই।

ওয়াইন সেলারে নিয়ে এসে কাঠের তৈরি বিরাট একটা টেবিলে শুইয়ে রাখা হয়েছে ম্যাডাম ইরাবতিকে। তাঁরই কিচেন থেকে রশি এনে হাত-পা টেবিলটার সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা হয়েছে। উ নিমুচি একটা চেয়ার নিয়ে টেবিলের পাশে বসেছে, হাতে একটা চামড়ার বেল্ট।

তবে মারাত্মক একটা অপমান থেকে বেঁচে গেছেন ইরাবতি।

সাধারণত মেয়েদের উপর টরচার করবার সময় প্রথমে তাদের পরনের কাপড় খুলে নেয় নিমুচি। কাজটা সে নিজে করে না, এইডকে দিয়ে করায়। দুজনেই ব্যাপারটা উপভোগ করে। কিন্তু তারা সবাই তরুণী, বেশিরভাগ কুমারী। ইরাবতি বৃদ্ধা হওয়ায় নিমুচি তাকে শুধু বিবস্ত্র করবার ভয় দেখিয়েছে, সত্যি সত্যি তা করেনি।

'ম্যাডাম ইরাবতি। দেখতেই পাচ্ছেন আপনার জন্যে বিশেষ কিছু যন্ত্রপাতি আনিয়েছি আমি,' শান্তভাবে বলল জেনারেল নিমুচি, ইঙ্গিতে অন্য একটা নিচু টেবিলে রাখা কিছু ইকুইপমেন্ট দেখাল সে, সাধারণত সার্জেন ও ডেন্টিস্টরা ব্যবহার করে। 'ভেবে দেখুন, ওগুলো ব্যবহার করা হলে আপনার কী অবস্থা দাঁড়াবে। হাত আছে, কিন্তু তাতে যদি নখ বলে কিছু না থাকে? মুখ আছে, অথচ তাতে যদি কোনও দাঁত না থাকে, নাকটা যদি গায়েব হয়ে যায়?'

কথা না বলে তার দিকে ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ইরাবতি। তাঁর বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করছে।

'ভাবুন, ম্যাডাম। সব কথা আপনি আমাকে খুলে বলবেন, নাকি অপ্রীতিকর কাজগুলো শুরু করতে বাধ্য হব আমি? আমার হাতে সময় আছে, দিনের পর দিন টরচার করতে পারব। কিন্তু আপনি সেটা সহ্য করতে পারবেন তো? তারচেয়ে শায়লা শারমিন মারা যাবার আগে যে জিনিসটা দিয়ে গেছে, ওটা আপনি আমার হাতে তুলে দিন, আপনার সমস্ত বেয়াদবি ও অবাধ্যতা আমি ক্ষমা করে দেব।'

'একবার তো বলেছি, শারমিন আমার কাছে আসেনি,' বললেন ইরাবতি। 'আমি জানি না ওখানে ওটা কার লাশ। কে মাটি চাপা দিয়েছে তা-ও আমার জানা নেই।' কিছুক্ষণ আগে বেল্ট দিয়ে মারা

হয়েছে তাঁকে, ব্যথাটা এখন সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে, সেই সঙ্গে নিভু নিভু হয়ে আসছে আশার আলোটা। তাঁর সময় শেষ। এই পাষণ্ডের হাতেই তাঁর মৃত্যু লেখা আছে। আল্লাহ্, এই ত্যাগ স্বীকার কি অর্থবহ হচ্ছে? 'এত করে বলছি কেউ কিছু দেয়নি আমাকে, তাও আপনি বিশ্বাস করছেন না? শুনুন, আপনি বৃথাই...'

কথা শেষ হলো না, ইরাবতির বুকে ও পাঁজরে চাবুক মারার ভঙ্গিতে বেল্ট চালাল নিমুচি। ফুসফুস খালি হয়ে গেল বৃদ্ধার। 'আছে, একটা ডকুমেন্ট আছে!' হিসহিস করে বলল জেনারেল। 'বল্, বুড়ি বেশ্যা, কোথায় রেখেছিস সেটা?'

নীল পাজেরোর ব্যাকসিট, কম্বলের স্তূপে কাত হয়ে ঘুমাচ্ছে কর্নেল হুদা। কাঁধের ক্ষতটা নিশ্চয়ই ব্যথা করছে, তা না হলে ঘুমের মধ্যেও চোখে-মুখে কষ্টের ছাপ ফুটে থাকত না।

মাত্র এক ঘণ্টা ঘুমাতে দিয়ে ড্রাইভারের ঘুম ভাঙাল পিসিআই কর্মকর্তার বডিগার্ড। তাকে ড্রাইভিং সিট ছেড়ে দিয়ে প্যাসেঞ্জার সিটে ফিরে এল সে।

উঁচু-নিচু রাস্তা, দু'পাশে গভীর বনভূমি। কিছুক্ষণ আগে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। চোখে ঘুম ঘুম ভাব নিয়ে সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে ড্রাইভার। তবে কর্নেলের নির্দেশ ভোলেনি সে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছাতে হবে লেমিয়েথনায়। তাই ভালই স্পিড তুলেছে।

সামনে একটা বাঁক পড়ল।

বাঁকের ওদিকে কী আছে জানা নেই। হেডলাইট নিভিয়ে বাঁক ঘুরছে ড্রাইভার, যাতে সম্ভাব্য অ্যামবুশের সহজ টার্গেট হতে না হয়। স্পিড আগের চেয়ে কম।

বাঁক ঘোরা শেষ করল ড্রাইভার। সামনে ঘোর অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না, অথচ খুঁত খুঁত করছে মনটা। ড্রাইভার

সিদ্ধান্ত নিল, এবার হেডলাইট জ্বালা যায়।

তবে তার দরকার হলো না। ড্রাইভারের চোখের সামনে দিনের আলোর মত উদ্ভাসিত হয়ে উঠল রোডব্লকটা। পঁচিশ কি ত্রিশ গজ সামনে, রাস্তার দু'পাশে, খুঁটির মাথায় দুটো ফ্লাড লাইট জ্বলে উঠেছে।

রাস্তার উপর আড়াআড়িভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা কাভার্ড ডেলিভারি ভ্যান, ওটার সামনের ও পিছনের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে কয়েকটা রাইফেলের ব্যারেল, সেগুলোর পিছনে একটা করে মানুষের আংশিক মুখ।

মুখগুলো না বার্মিজ, না চিনা, এমনকী থাইও নয়–বাঙালী।

সঙ্গে সঙ্গেই ব্রেক করল ড্রাইভার। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল পাজেরো। ব্যথাবিঘ্নিত ঘুম ভেঙে যাওয়ায় অশ্রাব্য একটা খিস্তি বেরিয়ে এল কর্নেল হুদার মুখ থেকে। 'মাদারফাকা...!' একেবারে শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল সে, মাথা উঁচু করে উইন্ডশিল্ড দিয়ে সামনে তাকাতেই দেখতে পেল দৃশ্যটা।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে যাচ্ছে ড্রাইভার।

'না! কেন?' বুঝতে পেরে হুঙ্কার ছাড়ল হুদা। 'রাস্তার ডান পাশে গাছ নেই, শুধু ঝোপ দেখতে পাচ্ছি। গুলি করে পথ করে নেব। এক হাতে গাড়ি চালাও, আরেক হাতে গ্রেনেড চার্জ করো। জুবায়ের!' বডিগার্ডকে বলল সে। 'তুমি পিস্তল চালাও!'

ড্রাইভারের হাতে গ্রেনেড ও বডিগার্ডের হাতে পিস্তল বেরিয়ে এল।

'ফুল স্পিড!' নির্দেশ দিল হুদা, কম্বলের তলা থেকে একটা অটোমেটিক রাইফেল টেনে নিয়ে ব্যারেলটা জানালা দিয়ে বের করে দিল সে।

ড্রাইভারের মন সায় দিচ্ছে না। তবে ঘাড়ে তার দুটো মাথা নেই যে কর্নেলের নির্দেশ অমান্য করবে। কল্পনার চোখে নিজের

মৃত্যু দেখতে পেল লোকটা। বোধহয় চিত্তচাঞ্চল্যের কারণেই গ্রেনেডটা সময়ের আগেই ছুঁড়ে বসল। শুধু তাই নয়, স্পিড না বাড়িয়ে গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে ফেলেছে।

প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড। কাভার্ড ডেলিভারি ভ্যানের ডান দিক কিছুটা তুবড়ে গেল, কিছুটা গেল উড়ে। কিন্তু প্রতিপক্ষদের কেউ হতাহত হয়নি।

ড্রাইভারের দ্বিতীয় গ্রেনেড ভ্যানের পিছনদিক আরও খানিকটা উড়িয়ে দিল।

বডিগার্ডের পিস্তল ভ্যানটার গা ফুটো করছে।

ভ্যানের আড়ালে লুকানো প্রতিপক্ষকে দেখতে পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে কর্নেল হুদা। তবে শেষ পর্যন্ত মানুষ নয়, রাইফেলের ব্যারেল লক্ষ্য করে ফায়ার করল সে।

অবাক কাণ্ড, পাজেরোর আরোহীরা সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত হলো না। তারপর যখন হামলা শুরু হলো, ডেলিভারি ভ্যানের দিক থেকে একটা গুলিও করল না কেউ।

পাজেরো যেখানে থেমেছে, ঠিক তার দু'পাশ থেকে সাজিদ খন্দকারের নেতৃত্বে ফায়ার শুরু করল রানা এজেন্সির অপারেটাররা, প্রত্যেকে মোটাসোটা গাছের পিছনে গা ঢাকা দিয়ে আছে। সাজিদের নির্দেশ, সম্ভব হলে কর্নেল আজমল হুদাকে জীবিত ধরতে হবে।

মাথায় রাইফেলের বুলেট খেয়ে স্পেয়ার ফ্রন্ট সিটে ঢলে পড়ল হুদার বডিগার্ড। একই সঙ্গে কয়েকটা বুলেট খাবলা দিয়ে তুলে নিয়ে গেল ড্রাইভারের ঘাড় ও কাঁধের সের খানেক মাংস ও হাড়—এরপর আর বেচারা বাঁচে কীভাবে।

জানালার বাইরে থেকে রাইফেলের নলটা টেনে নিয়ে মাথা নিচু করল হুদা, কী ঘটছে বুঝতে বাকি নেই। যদিও হিংস্র, বেপরোয়া এক চিলতে হাসি লেগে রয়েছে ঠোঁটের কোণে, তবু

নিজেকে সন্ত্রস্ত ইঁদুর মনে হলো তার, বিড়ালের দল কোণঠাসা করে ফেলেছে। তিন দিকে শত্রু, সামনে রোডব্লক; রাস্তার মাঝখানে স্থির হয়ে আছে বাহন, সেই বাহনের ব্যাকসিটে লুকিয়ে আছে সে। এরচেয়ে খারাপ অবস্থা আর কী হতে পারে।

রাইফেল ছেড়ে দিয়ে হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করল হুদা, তারপর সিটের উপর দিয়ে ক্রল করে সামনে চলে এল। ব্যাপারটা খেয়াল করছে সে–প্রচুর গুলি হচ্ছে, অথচ একটা বুলেটও তার খুব কাছাকাছি আসছে না। মানেটা বোঝা কঠিন কিছু নয়।

বঙ্গালীরা তাকে জ্যান্ত ধরতে চায়।

ড্রাইভিং সিটে বসে ব্যাক গিয়ার দিল কর্নেল হুদা, কিছুটা পিছুও হটল। সামনে এগোতে তারপর শুরু করল, প্রতি মুহূর্তে স্পিড বাড়ছে। মরি বা বাঁচি, ভাবছে হুদা, বাধা উড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাবই আমি।

হামলাটা সরাসরি নয়, তারই সুযোগ নিচ্ছে কর্নেল হুদা, বুঝতে পেরে ডেলিভারি ভ্যানের আড়াল থেকে ফায়ার শুরু করল সাজিদের অপারেটাররা। কিন্তু ইতস্তত একটা ভাব দেরি করিয়ে দিয়েছে তাদেরকে, ডান পাশের ফাঁক গলে সাঁ করে বেরিয়ে গেল পাজেরো। রাইফেলের কয়েকটা বুলেট গাড়ির বডিতে শুধু কয়েকটা ফুটো তৈরি করতে পেরেছে, তার বেশি কিছু নয়।

আঠারো

ঘাসের ভিতর অনড় একজোড়া মূর্তি। ধূসর ও হালকা সবুজ ঘাস এতটাই নিশ্ছিদ্র, জানা না থাকলে রানা বলতে পারত না তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ফালান। চারদিক এখনও অন্ধকার হয়নি, তবে তার আর খুব বেশি দেরিও নেই।

সার্চ পার্টি ধীরে ধীরে কাছে চলে আসছে। একসময় বোঝা গেল কয়েকটা দিক থেকে খসখস আওয়াজ আসছে–বিশ, পনের ও দশ ফুট দূর থেকে। ভাগ্যটা অত্যন্ত ভাল, কিছুক্ষণ পর ওদের ডান ও বাম দিক ধরে দূরে চলে গেল লোকগুলো।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা, তবে শুকনো ঘাসে কাপড় ঘষা লাগার আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যাওয়ার পরও এক চুল নড়ছে না, দেখাদেখি ফালানও। এক এক করে তিন মিনিট কাটল।

শব্দ না করে নড়ে উঠল ফালান, রানার দিকে এগিয়ে এল। কিছু বলতে যাচ্ছে সে, নিজের ঠোঁটে আঙুল রেখে তাকে থামাল রানা। চোখের ইঙ্গিতে নড়াচড়া ও আওয়াজ করতে নিষেধ করল। নিচু হয়ে একটা মাটির ঢেলা তুলে নিল হাতে।

আরও তিন মিনিট পার হলো। যখন ফালানের মনে হলো, আর কোনও ভয় নেই; ঠিক সেই সময় কানে এল মৃদু খসখস, খসখস আওয়াজ!

অলস ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে শব্দটা। পনের ফুট, দশ ফুট, আট ফুট। পাঁচ...

হঠাৎ তাকে একটু দেখতে পেল রানা। মুখে কী যেন একটা ধরে রেখেছে, ছোট আকৃতির ব্লো-গান হতে পারে, কিংবা হুইসেল।

কাঁধ চেপে ধরে ফালানের সামনে বাড়ার ঝোঁকটাকে দমন করল রানা। কাজটা সম্পূর্ণ নিঃশব্দে হওয়া চাই।

কিছু হয়তো সন্দেহ করেছে লোকটা। দাঁড়িয়ে পড়েছে হঠাৎ। এমনি সময়ে থপ্ করে কী যেন পড়ল ওর পিছন দিকে। পাঁই করে পিছন ফিরল সে, কান পেতে শুনতে চেষ্টা করছে শব্দটা কীসের।

আরও দশ সেকেন্ড পার হলো। আরও পাঁচ সেকেন্ড। শুকনো ঘাসে মৃদু ছোঁয়া লাগার শব্দ করল পা। সামনে সতর্ক দৃষ্টি রেখে পিছু হটে চলে আসছে লোকটা ওদের দিকে। তিন ফুটের মধ্যে চলে এসেছে, তারপর দেড়।

এখনই!

ডানহাতটা লম্বা করল রানা, ভাঁজ করে ফিরিয়ে আনল দ্রুত, শত্রুর গলাটা আটকে নিয়েছে কনুইয়ের ভাঁজে—কয়েক গুচ্ছ খসখসে ঘাসও রয়েছে সঙ্গে। বাম বাহু ঠেকাল এবার ওর ঘাড়ের পিছনে। কী ঘটতে চলেছে বুঝতে পেরে চিৎকার করার জন্যে মুখ হাঁ করল লোকটা, কিন্তু কণ্ঠনালী চাপ খেয়ে থাকায় আওয়াজ বের হলো না। হ্যাঁচকা টান দিল রানা এবার ডানহাত।

মড়াৎ করে ভাঙল ঘাড়ের হাড়। বারকয়েক ঝাঁকি খেল লেকটার গোটা শরীর, তারপর নেতিয়ে পড়ল মাথাটা একপাশে।

লাশটা নিঃশব্দে মাটিতে নামিয়ে দিল রানা। ঘাস ছাড়া আর কোথাও লুকানোর জায়গা নেই, এখানেই রেখে যেতে হবে এটাকে।

আরও এক মিনিট নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, কান পেতে থাকল, তারপর সাবধানে এগোল।

ঘাসের ভিতর দিয়ে সরু একটা ট্রেইল চলে গেছে, সেটা ধরে এক ঘণ্টা নিশ্চিন্ত মনে হাঁটতে পারল ওরা। ঘাসের রাজ্য থেকে বেরিয়ে এসে আবার জঙ্গলে ঢোকার সময় ওরা দেখল পথটার

আর কোনও চিহ্ন নেই কোথাও।

ম্যাপের ভাঁজ খুলে, পেন্সিল টর্চের আলোয়, কোথায় পৌঁছেছে দেখে নিল রানা।

সামনে পড়বে জঙ্গল ঢাকা ঢাল, ধীরে ধীরে উঁচু হয়েছে। তারপর আরেক ঢাল বেয়ে নীচে নামতে হবে। ঢাল বেয়ে নামবার আগেই আকাশ ছোঁয়া কয়েকটা পাহাড় পড়বে বাম পাশে। ওগুলোর দিকে পিছন ফিরে হাঁটতে হবে ওদেরকে, কারণ ওই পাহাড়শ্রেণীর সামনের দিকেই ম্যাডাম ইরাবতির খামারবাড়ি।

তবে আরও পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে।

প্রায় দশ মিনিট হলো ঢাল বেয়ে উঠছে ওরা। চূড়া আর বেশি দূরে নয়, এই সময় একটা হেলিকপ্টারের আওয়াজ ভেসে এল। তারপর ওটার স্পটলাইট দেখতে পেল, মাঝারি আকারের যান্ত্রিক ফড়িংটা ল্যান্ড করবার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

সামনে কোথাও ল্যান্ড করল সবুজ রঙের কপ্টারটা। দ্রুত পা চালাল ওরা, আন্দাজ করল চূড়ায় উঠলে দেখা যাবে ওটাকে।

চূড়ায় ওঠার পর আরও কয়েক মিনিট হাঁটতে হলো ওদেরকে। জঙ্গলের কিনারায় যেখানে থামল সেখান থেকে সরাসরি সামনে বড়সড় ফাঁকা একটা জায়গা দেখতে পেল রানা, আট-দশটা মশালের লালচে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে। ওখানেই নেমেছে হেলিকপ্টার, গাঢ় সবুজ রঙের তিনটে তাঁবুর ঠিক মাঝখানে। কপ্টারের পিছন দিকে অস্পষ্টভাবে চারকোনা একটা আকৃতি দেখতে পেল রানা, মাঝখানে ত্রিশ গজের মত ব্যবধান। একটা ট্রাক।

জায়গাটা আসলে একটা ক্যাম্প। তাঁবুর সংখ্যা তিনটে হলেও, লোকজন খুব কম। পরনের সবুজ ইউনিফর্মই বলে দিচ্ছে ওরা মিউচুয়াল ভেঞ্চারের গার্ড।

লোকজন কম হওয়ার কারণটা আন্দাজ করতে পারল রানা,

ওদের খোঁজে ঘাসের রাজ্য ও জঙ্গলের ভিতর এখনও তল্লাশি চালাচ্ছে বাকি লোকজন।

ঝোপের ভিতর দিয়ে একটু এগিয়ে পাঁচ-সাত মিনিটের জন্য গায়েব হয়ে গেল থোন ফালান। কপ্টারের পাইলট ও তাঁবুর লোকদের আলাপ শুনে ফিরে এসে জানাল রানার ধারণা সত্যি, ঘাস ও জঙ্গলের ভিতর বাকি লোকজন ওদেরকে খুঁজছে।

ম্যাডাম ইরাবতির নিরাপত্তার কথা ভেবেও আতঙ্কিত হয়ে পড়ল সে। 'সর্বনাশ হয়ে গেছে, মিস্টার রানা!' চাপাস্বরে বলল ফালান, মনে হলো কেঁদে ফেলবে।

'কেন, কী হয়েছে?' ফিসফিস করল রানা।

'ম্যাডামকে ওরা জেরা করছে। হাত-পা বেঁধে...' ফুঁপিয়ে উঠল ফালান।

'শান্ত হও,' নরম সুরে বলল রানা। 'তোমার মত শক্ত মানুষ বিপদের সময় এভাবে ভেঙে পড়ে না। ওরা আর কী বলল শোনাও দেখি।'

চোখ মুছে দ্রুতই নিজেকে সামলে নিল ফালান। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'মিউচুয়াল ভেঞ্চারের ডিরেক্টর কর্নেল হুদা সেল ফোনে পাইলটকে নির্দেশ দিয়েছে, দেরি না করে ম্যাডাম ইরাবতির বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে এদিককার লোকজনকে,' বলল সে। 'হুদা ভয় পাচ্ছে, এখনও যখন আপনাকে ধরা যায়নি, ম্যাডামের বাড়িতে আপনার পৌঁছানো ঠেকানো কঠিন হবে, তাই ওখানকার সিকিউরিটি আরও জোরদার করতে চায় সে।'

'তার মানে কি ক্যাম্প তুলে নিয়ে যাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না, বিশজন থাকছে এখানে,' বলল ফালান। 'ওরা এখনও আমাদেরকে খুঁজছে। বাকি ষোলোজন এখনই রওনা হবে। দেখুন না, তাঁবু থেকে বের করে নিজেদের জিনিস-পত্র গোছগাছ শুরু করে দিয়েছে।'

‘কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব?’ জিজ্ঞেস করল রানা, ওর ধারণা ফালান ভুল শুনেছে। ‘কপ্টারটা তো বড় নয়, খুব বেশি হলে দশ-বারোজন লোকের জায়গা হবে।’

‘কী জানি, আমিও তো তাই ভাবছি।’ কাঁধ ঝাঁকাল ফালান। ‘দেখা যাক, কীভাবে কী করে ওরা।’

লাইন দিয়ে কপ্টারে চড়ছে গার্ডরা, দ্রুত চিন্তা চলছে রানার মাথায়। এরইমধ্যে একটা প্ল্যান তৈরি করে ফেলেছে। বৃদ্ধা ইরাবতির খামারবাড়িতে এত লোককে ভিড় করতে দেবে না।

‘তুমি আমাকে কাভার দাও,’ বলল রানা। ইতোমধ্যে পনেরজন গার্ড উঠে পড়েছে কপ্টারে। ‘বাধ্য না হলে আড়াল ছেড়ে বেরুবে না।’ ফালানকে মাথা ঝাঁকানোর সময়টুকুও দিল না, তার আগেই ঝপ করে নিচু হলো, ক্রল করে ফাঁকা জায়গাটার কিনারা থেকে জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়ল।

ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে তাঁবু ও কপ্টারের দিকে এগোল রানা।

সশস্ত্র গার্ডরা তাড়াহুড়ো করে উঠে পড়ল কপ্টারে। জঙ্গলে এখনও লোকজন আছে, কাজেই তাঁবু গুটানো হয়নি, মশালও নেভায়নি।

একটা তাঁবুর মুখে, গাঢ় ছায়ার ভিতর, শুয়ে রয়েছে একজন গানার। তার সামনে একটা মেশিনগান, তেপায়ার উপর ফিট করা। তাঁবুর বাইরে ধীরে ধীরে শূন্যে উঠছে কপ্টার, সেদিকে চোখ রেখে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালল সে, সিগারেট ধরাবে।

ধারাল ছুরি ফলা দিয়ে তাঁবুর পিছনটা কেটে ভিতরে ঢুকেছে রানা, রোটরের শব্দ বাকি সব আওয়াজকে চাপা ফেলে দিচ্ছে। নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এসে লোকটার পিঠের বাম দিকে ছুরি গাঁথল ও, পাঁজরের একজোড়া হাড়ের মাঝখান দিয়ে ঢুকে হৃৎপিণ্ডে পৌঁছে গেল ফলাটা।

লাথি মেরে মেশিনগানের পিছন থেকে লোকটাকে সরিয়ে দিয়ে ঝুঁকল রানা, দু'হাতে তুলে নিল ভারী মেশিনগানটা।

মাটি ছেড়ে ধীর ভঙ্গিতে শূন্যে উঠে গেছে সবুজ যান্ত্রিক ফড়িং। আরও খানিক উঠে রওনা দেবে লেমিয়াথনার দিকে।

ভারী মেশিনগান বাগিয়ে ধরে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এল রানা, কপ্টারের দিকে ব্যারেল তাক করে শুরু করল ব্রাশ ফায়ার।

ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে কপ্টার। কোত্থেকে গুলি হচ্ছে দেখবার জন্য জানালা দিয়ে মাথা বের করল পাইলট, তার কপাল ফুটো হয়ে গেল। গোত্তা খেয়ে নীচে নেমে আসছে কপ্টার।

ঠাস ঠাস আওয়াজ শুনে রানা বুঝল, ওকে কাভার দিচ্ছে থোন ফালান। অন্তত দু'জন গার্ডের কাতর চিৎকার শুনতে পেল ও।

রানা এখন মেশিনগান চালাচ্ছে। কপ্টারের ভিতর গার্ডরা আতঙ্কে চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছে। তবে কেউ কিছু করবার সময় পেল না, মাটির উপর মুখ থুবড়ে পড়ল তাদের বাহন। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো পেট্রল ট্যাঙ্ক। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল কপ্টারে। ওই আগুন থেকে কার সাধ্য বেরিয়ে আসে।

ট্রাক স্টার্ট নেওয়ার আওয়াজ শুনল রানা। তারপরই থোন ফালানের চিৎকার ভেসে এল। 'মিস্টার রানা, সার, কুইক!'

মেশিনগানের ম্যাগাজিন খালি হয়ে গেছে আগেই, সেটা ফেলে ছুটল রানা।

উনিশ

মাতালের মত মাথা নাড়ছেন ইরাবতি। সারা শরীরে এত ব্যথা, মনে হচ্ছে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন।

তবু তাঁর মন নিশ্চয়ই কাজ করছে। কখনকার ব্যাপার, এক মিনিট আগের, নাকি এক ঘণ্টার? ওয়াইন সেলারে তাঁর সঙ্গে শুধু জেনারেল নিমুচি ও এইড ছিল। এখন আরেক লোককে দেখা যাচ্ছে। বেশ লম্বা-চওড়া, সুদর্শন। তবে চেহারায় কোথায় যেন কর্কশ একটা ভাব লুকিয়ে আছে।

থোন ফালানের বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে লোকটা কি তাঁদেরকে সাহায্য করতে এসেছে! কিন্তু তারপরেই হতাশা গ্রাস করল তাঁকে।

জেনারেল নিমুচির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত আলাপ করছে আগন্তুক।

'আমার জানি, শারমিন খালি হাতে আসেনি, জেনারেল,' বলল লোকটা। 'এই বুড়ির কাছেই রেখে গেছে পেন ড্রাইভটা।'

গুঙিয়ে উঠলেন ইরাবতি। জ্ঞান হারালেন।

'এই বুড়ি হারামজাদিকে নিয়ে কী করা যায় বলুন,' জানতে চাইল জেনারেল নিমুচি।

ঠিক এই সময় চোখ মেলে তাকালেন ইরাবতি। দৃষ্টিতে তিরস্কার ও ঘৃণা। তবে এই মুহূর্তে তাঁর দিকে কেউ তাকিয়ে নেই।

'ইন্টারোগেট করার কাজটা আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন,' বলল হুদা। 'খুব অল্প সময়েই জেনে নিচ্ছি কোথায় আছে পেন ড্রাইভটা। ওটা হাতে পাওয়ার পর প্রতিশোধ নেব।'

'কীসের প্রতিশোধ?'

'এই বুড়ির স্বামী পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর সঙ্গে বেঈমানী করেছে,' বলল হুদা। 'তাকে পাচ্ছি না, এমনকী তার লাশও মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, অগত্যা বুড়িকেই তার খেসারত দিতে হবে।'

জেনারেলের চোখ দুটোয় অশুভ একটা আলো জ্বলে উঠল। 'কীভাবে প্রতিশোধ নেবেন? কী খেসারত দিতে হবে বুড়িকে?'

'ওয়াটার ট্রিটমেন্ট,' সংক্ষেপে বলল হুদা।

'ও, যা ভেবেছি।'

'এবার এখানকার সিকিউরিটি সম্পর্কে একটা ধারণা দিন। সব মিলিয়ে কতজন এরা? কোথায় কোথায় পজিশন নিয়েছে?' জানতে চাইল হুদা।

'অনেকক্ষণ হলো কপ্টার পাঠানো হয়েছে,' বলল জেনারেল। 'যে-কোন মুহূর্তে আঠারো-বিশজনের একটা গ্রুপ পৌঁছে যাবে। এই মুহূর্তে বাড়ির ভেতর আমার দুজন এইড আছে। একজন আমাদের সঙ্গে ওয়াইন সেলারেই আছে। আরেকজন সার্ভিস হলে। গ্রাউন্ডে ডিউটি দিচ্ছে নয় জন: সার্জেন্ট, করপোরাল ও সাতজন সৈনিক। বুঝতেই পারছেন, আমাদের সব গার্ডের মত এরাও মার্সেনারি—সবাই সেনাবাহিনীতে ছিল।'

'কে কোথায় আছে?' আবার জানতে চাইল হুদা।

'সেটা সার্জেন্ট ভাল বলতে পারবে। আমি যতটুকু জানি, দুজন মেইন গেটের কাছে, একজন পেছন দিকে, একজন উত্তর-পশ্চিম দিকে টহল দিচ্ছে, একজন দক্ষিণ-পশ্চিমে...'

তবে খামারবাড়ির উত্তর-পশ্চিমে যে লোকটার টহল দেওয়ার কথা, সে তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে।

লোকটা এমনকী আত্মরক্ষাতেও ব্যর্থ। অন্ধকার থেকে ছুরি ধরা একটা হাত এগিয়ে এল, অথচ কিছুই টের পায়নি সে। ছুরির তীক্ষ্ণ ফলাটা দ্রুত ঘষা খেল উন্মুক্ত গলায়, কণ্ঠনালী বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। পড়ে গেল সে, লাফ দিয়ে তাকে টপকাল রানা। ওর পিছু নিয়ে থোন ফালানও।

আরও আধমাইলটাক এগিয়ে মুখ খুলল রানা। 'জেনারেল নিমুচি যখন তোমার ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করতে আসে, তার সঙ্গে সাধারণত কজন সৈনিক থাকে?' নিচু গলায় জানতে চাইল ও। 'তারা নিশ্চয়ই এভাবে, মানে এতটা দূরে টহল দেয় না?'

'না। এই প্রথম দেখছি। আলাপ করতে এলে তার সঙ্গে এক কি দুজন থাকে, ড্রাইভার সহ,' বলল থোন ফালান। 'শুধু ধান নিতে আসার সময় বিশ-পঁচিশজন থাকে। তবে রাতে কখনও আসে না তারা, টহলও দেয় না। এটা খুব সিরিয়াস ব্যাপার।'

'ওরা জানে আমরা ধরা পড়িনি,' বলল রানা। 'কাজেই সাবধান তো হবেই।'

'প্রথমে আমি চেষ্টা করে দেখি আমার নিজের লোকজন কিছু বলতে পারে কি না,' বলল ফালান। 'সাহায্য চাইলে পাওয়া যাবে।'

'তা হয়তো লাগবেও,' বলল রানা। তারপর জানতে চাইল, 'পাহাড়ের ওদিকে ওগুলো কীসের আলো, ফালান?'

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল ফালান। 'কী জানি,' বলল সে, চিন্তিত মনে হলো তাকে। 'আগে কখনও ওদিকে এরকম আলো দেখিনি।'

রানার মনে পড়ল ওর বন্ধু, চিনা এসপিওনাজ কর্মকর্তা হুনান হো, পাইলট চৌ চির মাধ্যমে ওদেরকে জানিয়েছে লেমিয়েথনায়

যাওয়ার পথে মিউচুয়াল ভেঞ্চারের গার্ডরা সব মিলিয়ে ক্যাম্প ফেলেছে তিনটে। দুটোকে ইতোমধ্যে পিছনে ফেলে এসেছে ওরা, বাকিটা থাকবার কথা হাইওয়েতে। এটা কি তা হলে জেনারেল উ নিমুচির সৈন্যদের ক্যাম্প?

নাকি মিউচুয়াল ভেঞ্চারের রিজার্ভ গার্ডদের?

'সেনা ক্যাম্প কি না জানা দরকার,' বলল রানা, তারপর বিনকিউলারটা বের করে চোখে তুলল। রাত গভীর হলেও, ফ্লাডলাইটের আলোয় ইউনিফর্ম দেখে বার্মিজ সৈন্যদের চিনতে পারল রানা। ছাউনির চারপাশে জিপ নিয়ে টহল দিচ্ছে মিলিটারি পুলিশ।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'সৈন্যরাই ক্যাম্প ফেলেছে।'

'এখন তা হলে আমরা কী করব, মিস্টার রানা?' জানতে চাইল ফালান।

'আগের প্ল্যানই ঠিক থাকবে,' বলল রানা। 'বাড়িটাকে ঘিরে চক্কর দেব একবার, দেখব আর কারা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। কাউকে সন্দেহ হলে অজ্ঞান করা হবে, প্রয়োজনে খুনও।'

একটা বাগানের ভিতর দিয়ে এগোচ্ছে ওরা, সরু পথটা বাড়ির পিছন দিকের গেটে পৌঁছেছে। ওদের সামনের দিকে কোথাও নিস্তেজ একটা আলো জ্বলছে। কয়েক মিনিট পর বাঁক নিল পথ, গাছপালা কমে এল। এতক্ষণে নিজেদের বাম দিকে কয়েকটা দালান দেখতে পেল রানা। নিস্তেজ, চৌকো আলোটা বেরিয়ে আসছে বড় আকারের জানালা থেকে।

'এগুলো প্রায় সবই গোলাঘর, গুদাম হিসাবে ব্যবহার করা হয়,' ফিসফিস করল ফালান। 'আরও কিছুটা পেছনে পুরুষ কামলাদের থাকার জায়গা। তবে আলোটা আসছে কিচেন থেকে। রাত তিনটের সময় ওখানে কারও থাকার কথা নয়।'

আলোটার তিনদিকে ছড়িয়ে থাকা ছোট-বড় দালান ও গোলাঘরের অস্পষ্ট আভাস দেখে আন্দাজ করতে অসুবিধে হয় না খামারবাড়িটা বিশাল। বিড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা, তারপর সাবধানে উঁকি দিল।

সরু তারের জাল দিয়ে ঘেরা জানালাটা। গাউন ও ব্লাউজ পরা এক তরুণীকে দেখল রানা; দু'হাতের উপর চিবুক রেখে চেয়ারে বসে আছে, টেবিলের উপর কনুই, চোখ থেকে টপ টপ করে পানি পড়ছে।

'নাহিদা!' রানার পাশ থেকে নিঃশ্বাস ফেলল ফালান।

'শ্‌শ্‌শ্‌!'

কিচেনের পিছনদিক থেকে পায়ের আওয়াজ ভেসে এল। সবুজ ইউনিফর্ম পরা মিউচুয়াল ভেঞ্চারের এক গার্ডকে কিচেনে ঢুকতে দেখল রানা। নাহিদার দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাল গার্ড, ঠোঁটে নোংরা হাসি। কয়েক সেকেন্ড নড়ল না, তারপর হাত দুটো নাহিদার দিকে লম্বা করে সামনে এগোল। তার হিপ হোলস্টারে একটা পিস্তল দেখা যাচ্ছে, গালে নখ দিয়ে আঁচড়ানোর লালচে দাগ।

এক হাতে নাহিদার নিচু করা চিবুক ধরে উঁচু করল গার্ড, অপর হাত মুচড়ে ধরল তার ব্লাউজের সামনেটা। রানা দেখল, সেটা এর আগেই ছেঁড়া হয়েছে।

ওর পাশে নড়ে উঠল ফালান, কী যেন বলল বিড়বিড় করে।

'এখন নয়,' চাপা গলায় সাবধান করল রানা। জানালার পাশ থেকে সরে এল ও, ফালানকেও সরে আসার ইঙ্গিত করল। 'প্রথমে আমরা জানব আর কজন আছে।'

বাড়িটাকে চক্কর দিয়ে আর কাউকে পেল না ওরা। তবে সামনের দিকের একটা টেরেসে উঠে ড্রাইভওয়ের দিকে তাকাতে পাশাপাশি দুটো গাড়ি দেখতে পেল রানা, নীল মার্সিডিজ ও হুড

খোলা ভ্যান। নীরব গাড়ি দুটোর কয়েক গজ পিছনে একজন গার্ড পায়চারি করছে, তার চোখ মূল বাড়ির দিকে। জানালা দিয়ে বেরুনো আলোতে বাড়ির সামনেটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে।

'নামো,' ফিসফিস করল রানা।

টেরেস থেকে নেমে এসে একটা দালানের পাশ দিয়ে আবার গুদামগুলোর দিকে এগোচ্ছে ওরা। 'এখানে আসতে দুটো গাড়ি লেগেছে তাদের,' বলল রানা। নিশ্চয়ই খামারবাড়ির চারদিকে ছড়িয়ে আছে বাকি সবাই। তোমার লোকজনকে খুঁজে বের করো।'

'কিন্তু নাহিদা?'

'জানি। প্রথমে লোকজন, তারপর নাহিদা। দেখতে হবে সবাই যাতে বাঁচার সুযোগ পায়। নাহিদাসহ। তোমার ম্যাডামও।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে তাড়াতাড়ি এগোল ফালান, এক সারি গোলাঘরকে পাশ কাটিয়ে ছোট একটা গ্রামের দিকে যাচ্ছে।

কয়েক মিনিট পর তারার নিস্তেজ আলোয় পাথরের তৈরি কয়েকটা ঘর-বাড়ি, বেড়া দিয়ে ঘেরা সবজি বাগান, লম্বা ঘাস ঢাকা মাঠ ও ইঁট বিছানো একটা চৌরাস্তা দেখতে পেল রানা।

চৌরাস্তায় টহল দিচ্ছে একজন গার্ড। তবে হাতে সাব মেশিনগান থাকলে একজনই গ্রামের সব লোককে আটকে রাখতে পারে, বিশেষ করে তারা যদি জানে একটা গুলির আওয়াজ বাকি গার্ডদের ডেকে নিয়ে আসবে।

লোকটাকে ঘায়েল করবার জন্য পুরানো কৌশলই ব্যবহার করল রানা, ইয়াংগন সৈকতে কর্নেল হুদার বিরুদ্ধে যেটা কাজে লেগেছিল, ঘাসের রাজ্যে সতর্ক গার্ডের বিরুদ্ধেও। ছোট একটা নুড়ি পাথর খুঁজে নিয়ে অন্ধকার ঘরগুলোর দিকে ছুঁড়ল ও। পাথরের নিরেট দেয়ালে লেগে মাটিতে ছিটকে পড়ল সেটা।

হাতের আগ্নেয়াস্ত্র ঝট্ করে কাঁধে উঠে গেল, দ্রুত ঘুরল গার্ড, পাথুরে বাড়ির দিকে তাকিয়ে শব্দটার উৎস খুঁজছে।

ইতোমধ্যে রওনা হয়ে গেছে ফালান, চারপায়ে ছুটছে ঠিক যেন একটা গরিলা। লম্বা ঘাসের ভিতর ঢুকে যখন দেখল পায়ের নীচে মাটি খুব নরম, সিধে হলো সে। ধীর পায়ে হেঁটে তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে গার্ড।

তার উপর চোখ রেখে অন্য আরেক দিক থেকে এগোচ্ছে রানা। ওর হাতে শক্ত করে ধরা একটা অস্ত্র, কোনও কারণে ফালান ব্যর্থ হলে কাজে লাগবে।

ঘাসের রাজ্য অর্ধেকটা পেরিয়েছে ফালান, এই সময় আপনমনে মাথা নাড়ল গার্ড, তারপর নিঃসাড় বাড়িগুলোর দিকে পিছন ফিরল। আঁতকে ওঠার আওয়াজ শুনল রানা, তারপর দেখল ইউনিফর্ম পরা মূর্তিটার হাতে ঝোলানো অস্ত্র দ্রুত কাঁধে উঠে যাচ্ছে।

থোন ফালানের পেশল হাতজোড়া সামনে বাড়ানো, কারাতে হামলার জন্য তৈরি।

তবে কাজটা করতে গিয়ে নিজেরও মারা পড়ার আশঙ্কা আছে ফালানের। গুলির শব্দ হবে; সাত-আট গজ দূরত্ব, পার হতে কয়েক সেকেন্ড লেগে যাবে।

অভ্যস্ত হাতে অস্ত্রটা ছুঁড়ল রানা।

গায়ে তারার আলো লাগায় ইস্পাত-নীল ঝিলিক তুলে ছুটল ওটা, লক্ষ্যভেদ করে জন্ম দিল একটা রোমহর্ষক দৃশ্যের। রানার মনে হলো ফালান ও গার্ড যেন লাফ দিয়ে তিনদিকে সরে গেল। তবে, ফালান আসলে যেখানে ছিল সেখানেই জমে গেছে, লাফ দিয়ে সরে গেছে শুধু গার্ড—কুৎসিত ভাবে বিচ্ছিন্ন দুটো আলাদা মাংসের অস্থির টুকরো হয়ে। রানার ম্যাচেটি মাটিতে পড়ল মাথার আগে, আর মাথাটা পড়ল ধড়টা ভীতিকর স্লো মোশনে কাত

হওয়ার পর।

বমির ভাবটা চেপে রেখে ফালানের কাছে এসে দাঁড়াল রানা, এখনও সে লাফ দিতে যাওয়ার ভঙ্গিতে স্থির হয়ে আছে। তারার আলোয় বিচ্ছিন্ন মাথাটা বীভৎস দেখাচ্ছে। রানা দেখল ফালানের হতচকিত চেহারা কয়েক ডিগ্রি কম ভয়ঙ্কর লাগছে। অনুভব করল ওর নিজের চেহারাও বিকৃত হয়ে আছে। সাব মেশিনগানটা মাটি থেকে তুলে ফালানের দিকে বাড়িয়ে ধরল ও।

'দুঃখিত,' বিড়বিড় করল রানা। 'আর কিছু করার ছিল না আমার। এটা ধরো। একান্ত বাধ্য না হলে ব্যবহার করো না।'

'জী, মিস্টার রানা,' কর্কশ আওয়াজ বেরুল ফালানের গলা থেকে।

'ফিরছি আমি, বাড়ির পেছনদিকে থাকব। যত তাড়াতাড়ি পার তোমার লোকজনের সঙ্গে কথা শেষ করে চলে এসো ওখানে। সঙ্গে ওদের কাউকে রেখো—আপাতত একজনের বেশি নয়। অবশ্যই পুরোপুরি বিশ্বস্ত হতে হবে তাকে। আর জলদি!'

দুজন আলাদা হয়ে যে যার নিজের কাজে চলে গেল।

নাহিদা মেয়েটি এখনও কিচেনে রয়েছে, তবে চেয়ারে নয়। জানালার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে একটা জানোয়ারের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে সে। মোটাসোটা গার্ড শরীর দিয়ে ঠেসে ধরেছে তাকে, মুখ বাড়িয়ে এরইমধ্যে ফুলে ওঠা ঠোঁটের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করছে আবার, একই সঙ্গে টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলছে ব্লাউজ ও গাউন।

প্রায় নিঃশব্দে লড়ে যাচ্ছে মেয়েটি। গার্ডের চোখে নখ ঢোকাবার চেষ্টা করছে সে, পা দিয়ে লাথি ও হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারছে। তারপর সুযোগ পেয়ে গার্ডের ঠোঁট কামড়ে ধরল।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পিছু হটল গার্ড, হাসছে। হাত দিয়ে ট্রাউজারের সামনে কিছু একটা করল সে, তারপর নতুন উদ্যমে

ভারী শরীরটা নিয়ে নাহিদার দিকে এগোল। হঠাৎ ঝুঁকল সে, বাম হাত দিয়ে নাহিদার গাউন ধরে কোমর থেকে নামাবার চেষ্টা করছে।

জানালার পাশ থেকে সরে এসেছে রানা। ইস্পাতের সরু ও লম্বা একটা টুকরো দিয়ে প্রায় নিঃশব্দেই দরজার তালা খুলছে ও। কিচেনের ভিতর থেকে ভারী কিছু পড়ে যাওয়ার আওয়াজ ভেসে এল, তারপর শোনা গেল ভোঁতা একটা চিৎকার।

মৃদু প্রতিবাদ করে ভিতর দিকে খুলে গেল দরজা। কোনও শব্দ না করে ছোট একটা হল ধরে দ্রুত এগোল রানা। হলে তিনটে দরজা, সবগুলোই খোলা। ডান দিকে প্যান্ট্রি, বাম দিকে কিচেন। সামনে মেইন প্যাসেজ, প্যাসেজের একদিকে এক সারি দরজা–স্টোর রুম, ওয়াইন সেলার, ড্রেসিং রুম ইত্যাদি। আরও সামনে বাঁক নিয়েছে প্যাসেজ, চলে গেছে গেস্ট রুমের দিকে। তারপর উপরে ওঠার সিঁড়ি।

মেইন প্যাসেজটা ভাল করে দেখল রানা, কেউ কোথাও নেই। পিছু হটে ফিরে এল হল-এ, তারপর কিচেনের দিকে এগোল।

মিউচুয়াল ভেঞ্চারের গার্ড কিচেনের মেঝেতে এত ব্যস্ত যে ভিতরে কেউ ঢুকল কি না হুঁশ নেই তার। তার মোটাসোটা শরীর দিয়ে নাহিদাকে ঢেকে ফেলেছে সে। নাহিদা নিজেকে ছাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টায় ছটফট করছে, হাঁপাচ্ছে, গোঙাচ্ছে; আর তার উপরে এক্সারসাইজের প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে গার্ড।

খুব বাজে একটা সময়ে বাধা দিতে যাচ্ছে রানা, সন্দেহ নেই, তবে এত জরুরি যে, এই মুহূর্তে তা না দিলেও নয়। দেরি করলে মেয়েটির জন্য ব্যাপারটা আরও বেশি অপ্রীতিকর হয়ে উঠতে পারে।

কিচেনের মেঝেতে কোনও শব্দ করছে না রানার পা। জোড়া

লাগা শরীর দুটোর পাশে এসে থামল ওগুলো। কারাতে হামলার প্রস্তুতি নিল ও। ডান হাতের কিনারা শক্ত লোহা হয়ে উঠল, কোপ মারবার মারাত্মক অস্ত্র। হাঁটু দুটোকে পরস্পরের কাছ থেকে খানিকটা সরিয়ে ভাঁজ করল, সামনের দিকে ঝুঁকল একটু, তারপর প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত হানল লোকটার উন্মুক্ত ঘাড়ে—প্রথমে ডান হাত, পরমুহূর্তে বাম হাত দিয়ে।

ঘাড়ের হাড় ভাঙল, থেঁতলে গেল করটেড আর্টেরি, ফলে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে।

দু'হাতে কলার ধরে মেয়েটির উপর থেকে লাশটা তুলল রানা। ফোঁপানোর আওয়াজ ঢুকল কানে। লাশটা কয়েক ফুট দূরে নামিয়ে রাখল ও। ওটার হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে নিয়ে ঘুরল, দেখল লজ্জা ঢাকার জন্য একটা গড়ান দিয়ে উপুড় হয়েছে নাহিদা, ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। একটা পাতিলের ঢাকনি খুলে পিস্তলটা তার ভিতর রাখল রানা।

ওকে এগিয়ে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়েটি, দু'হাত দিয়ে শরীর ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করছে, চোখে-মুখে আতঙ্ক। 'না! না!' ফোঁপাচ্ছে সে।

হঠাৎ উপলব্ধি করল রানা মেয়েটির চোখে কেমন দেখাচ্ছে ওকে—স্রেফ একটা জংলি, কাপড়ে শুকনো কাদা ও রক্ত লেগে রয়েছে, সঙ্গে একগাদা অস্ত্র।

'নাহিদা, চুপ!' নরম সুরে ফিসফিস করল রানা। 'ফালানের বন্ধু আমি। শান্ত হও, প্লিজ। আমি ফালানের সঙ্গে এসেছি। কী বলছি বুঝতে পারছ? আমরা ম্যাডাম ইরাবতিকে রক্ষা করতে এসেছি।'

আহত পাখির মত থরথর করে কাঁপছে নাহিদা, শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

'আমি ফালানের সঙ্গে সাহায্য করতে এসেছি,' বার্মিজ ভাষায়

আবার বলল রানা। 'তুমি ভয় পেয়ো না।'

ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে নাহিদার চেহারা। চোখে-মুখে মিনতি ও আবেদন ফুটে উঠল। 'ফালান ভাই? কোথায়... কোথায় তিনি?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল সে।

'তোমাদের লোকদের সঙ্গে কথা বলতে গেছে,' বলে সাবধানে মেয়েটির একটা হাত ধরল রানা, ধীর ভঙ্গিতে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসাল। 'নাহিদা, ব্যাপারটা জরুরি। দু'একটা প্রশ্নের উত্তর দরকার আমার। প্রথমে বলো, ম্যাডাম ইরাবতি কোথায়?'

'ম্যাডাম! ও আল্লাহ, ম্যাডাম!' হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল নাহিদা। 'তাঁকে তো ওয়াইন সেলারে আটকে রেখেছে ওরা, জেরা করার জন্যে...আর কিছু তো আমি জানি না।'

'ওরা কারা? কজন?'

এখনও কাঁপছে নাহিদা। 'দুজন। না, তিনজন। প্রথমে জেনারেল আর সার্জেন্টকে দেখেছি, তারপর আরেকজন বিদেশী এসেছে।'

বিদেশী? রানার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। কর্নেল হুদা ছাড়া আর কে!

'ওয়াইন সেলারটা ওইদিকে...' শুরু করল নাহিদা।

'শ্‌শ্‌!' ঠোঁটে আঙুল তুলে কথা বলতে নিষেধ করল রানা। পিছনের হলে একটা শব্দ হয়েছে, অথচ দ্বিতীয়বার শোনা গেল না। আন্দাজ করল, দরজার বাইরে নড়াচড়া করছে কেউ। এদিকে কিচেনের মেঝেতে একটা লাশ পড়ে রয়েছে।

পিস্তলের বাঁটে চলে গেল রানার হাত।

'আমি, ফালান।' খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল দীর্ঘদেহী বুলডগ, মেঝেতে পড়ে থাকা লাশের দিকে সন্তুষ্টচিত্তে একবার

তাকাল। তার পিছনের ছোটখাট মানুষটা দাঁড়িয়ে পড়েছে, স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সেদিকে। 'এর নাম থুয়েমুয়ে। একে আমরা বিশ্বাস করতে পারি।'

'অস্ত্র চালাতে জানে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সাবেক বার্মিজ সৈনিক, সার,' নিজেই জবাব দিল থুয়েমুয়ে।

'নাহিদা, বোন আমার...' মেয়েটির কাঁধে ভারী হাত রাখল ফালান। 'এত দেরি হওয়ায় দুঃখিত। ম্যাডাম কোথায়?'

'ওয়াইন সেলারে,' দ্রুত বলল রানা। 'ভেতরে তাঁর সঙ্গে তিনজন লোক আছে। তাঁকে সম্ভবত টরচার করা হচ্ছে। তোমার সাব মেশিনগানটা থুয়েমুয়েকে দাও, ফালান। আর ওই পাতিলে একটা পিস্তল আছে।' হাত তুলে দেখাল ও। 'নাহিদাকে নিয়ে এখানেই থাকুক সে, লাশটা চোখের আড়ালে কোথাও সরিয়ে ফেলুক।'

'শুধু আমরা দুজন ওয়াইন সেলারে যাব?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'মেইন প্যাসেজ ছাড়া ওখানে ঢোকার আর কোনও পথ আছে?'

'না, ওটাই একমাত্র দরজা,' বলল ফালান, রাগে শক্ত হয়ে আছে তার চোয়াল। 'জেনারেল যদি আমার ম্যাডামের গায়ে হাত তুলে থাকে, আমি শালার ভুঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে লাফাব...'

'সে দেখা যাবে, কিন্তু ওরা যদি আমাদেরকে প্রথমেই দেখে ফেলে তা হলে তো কাজ হবে না। বাড়িতে আর কোনও লোকজন আছে, নাহিদা?'

মাথা ঝাঁকাল নাহিদা। হাত তুলে লাশটা দেখাল। 'শুধু ওটা ছিল।'

'এসো, ফালান, পথ দেখাও,' বলল রানা।

মাথা ঝাঁকাল ফালান। তার বাড়ানো হাত থেকে সাব মেশিন-গানটা নিল থুয়েমুয়ে।

তাকে দ্রুত কিছু নির্দেশ দিল ফালান, তারপর রানার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল।

সার্ভিস হলের পাথুরে মেঝের উপর দিয়ে নিঃশব্দে এগোচ্ছে দুজন। কোথাও একটা বিড়ালও চোখে পড়ল না, বেরিয়ে এল মেইন প্যাসেজে। বার্মিজ টিক-এর ভারী দরজার সামনে থামল ওরা। তামার হাতল চকচক করছে। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল, ভিতর থেকে কোনও শব্দ আসছে না।

'কবজায় তেল দেয়া হয়?' ফিসফিস করল রানা।

মাথা ঝাঁকিয়ে ভারী হাতলটা ধরল ফালান। চাপ দিতে ঘুরছে ওটা। এতটুকু শব্দ না করে ভিতর দিকে খুলে গেল ভারী কবাট। ওদের নীচে কোনও ধাপ নেই, প্রায় খাড়াভাবে শুধু একটা র‍্যাম্প নেমে গেছে ক্ষতবিক্ষত পাথুরে মেঝেতে। আলোটা চোখে লাগছে, সম্ভবত দুশো ওয়াট-এর বালব।

কোথাও থেকে কারও গলার আওয়াজ ভেসে আসছে, তবে কে কী বলছে বোঝা যাচ্ছে না। র‍্যাম্প বেয়ে মাত্র কয়েক পা নামল রানা। দেখল দু'দিকের দেয়ালই সিলিং ছুঁয়েছে, অর্থাৎ এটা আসলে একটা ঢালু টানেল। টানেলের নীচে খিলান আকৃতির ফাঁক রয়েছে, তারপর মেঝে।

গলার আওয়াজ এখন আর দুর্বোধ্য নয়।

'না, জেনারেল, ব্যাপারটাকে আমি হালকাভাবে নিতে পারছি না,' ইংরেজিতে বলল একজন, উচ্চারণে পাঞ্জাবী টান স্পষ্ট। 'আরও অন্তত আধ ঘণ্টা আগে ফিরে আসা উচিত ছিল আপনার কপ্টারের। সেটা ফেরেনি, গার্ডরাও যোগাযোগ করছে না। অফ-কোর্স দেয়ার ইজ সামথিং রঙ।'

কর্নেল আজমল হুদার কণ্ঠস্বর। আগে মাত্র একবার শুনলেও, চিনতে রানার কোনও অসুবিধে হলো না।

হাসির আওয়াজ ভেসে এল।

‘জেনারেল উ নিমুচি,’ রানার কানের কাছে ফিসফিস করল ফালান। ‘শালার গলায় পা দিয়ে হাসিটা যদি থামাতে পারতাম!’

‘আপনি হাসছেন, জেনারেল?’ হাসি শুনে কর্নেল হুদা বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চাইল।

‘হাসছি, ডিয়ার ফ্রেন্ড, কারণ কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছি আপনার প্রাণের দুশমন মাসুদ রানা লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে,’ বলল উ নিমুচি। ‘পোয়া মোয়া বনে এই মুহূর্তে একশো গার্ড তল্লাশি চালাচ্ছে। হাইওয়ে ও সম্ভাব্য অন্য রাস্তাগুলোয় টহল দিচ্ছে আরও দেড় শোর মত গার্ড। একটা ইঁদুর গলবে, সে সুযোগও রাখা হয়নি। আপনি কি তাকে সত্যিই এত বোকা মনে করেন, এ-সব জানার পরেও মরার জন্যে লেমিয়েথনায় আসতে সাহস করবে সে?’

‘আপনি তাকে চেনেন না, তার রেকর্ড জানেন না, তাই তাকে নিয়ে এভাবে কথা বলতে পারছেন,’ বলল হুদা, গলার স্বরে অসন্তোষ চাপা থাকছে না। ‘আজ রাতেই ভাগ্যগুণে তার হাত থেকে বেঁচে গেছি আমি, এখানে আসার জন্যে রওনা হবার আগে কাঁধ থেকে বুলেট বের করতে হয়েছে। আমার সিক্সথ্ সেন্স বলছে, গার্ডরা তাকে ঠেকাতে পারেনি, তাদের জাল ছিঁড়েখুঁড়ে চলে এসেছে। আমরা সময় নষ্ট করছি, জেনারেল। এবার, প্লিজ, লেফটেন্যান্টকে ডেকে গার্ডদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলুন।’

‘আর সেই ফাঁকে আপনি বুড়ি হারামজাদির ওপর ওয়াটার ট্রিটমেন্ট চালাবেন?’

রানার পাশে আড়ষ্ট হয়ে গেল ফালান। একটা হাত ধরে তাকে থামাল রানা, ওদের আরও কথা শুনতে চাইছে।

‘হ্যাঁ,’ বলল হুদা।

‘বেশ।’

‘ভাল কথা, গার্ডরা ফিরে এলে বাড়ির চারদিকের পাহারা

আরও কড়া করতে বলবেন।'

'ওকে,' বলল জেনারেল উ নিমুচি।

র‍্যাম্প বেয়ে কয়েক পা নেমেছিল, দ্রুত আবার উঠে এল ওরা। দরজাটা আস্তে করে বন্ধ করে দিল রানা। চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে ওর মাথার ভিতর। এটা যুদ্ধক্ষেত্র নয়, কাজেই সামরিক বাহিনীর কোনও কর্মকর্তাকে খুন করে পার পেয়ে যাওয়ার আশা করাটা স্রেফ পাগলামি। ওর মনে পড়ে গেল খামারবাড়ির কাছাকাছি অস্থায়ী একটা সেনা ছাউনি দেখে এসেছে ওরা। না, ঝোঁকের মাথায় কিছু করা যাবে না। বিশেষ করে ফালানকে সামলে রাখতে হবে।

'কিচেনে ফিরে আমার জন্যে অপেক্ষা করো, ফালান,' অস্ফুটে বলল ও। 'ভেতরে কাউকে ঢুকতে দেবে না।'

বিনা তর্কে মাথা ঝাঁকিয়ে দ্রুত চলে গেল ফালান। মেইন প্যাসেজের আরেক প্রান্তে চলে গেল রানা, থামল ছায়ার ভিতর একটা কোণে। পাশেই বড় একটা দরজা, বাড়ির সামনে ড্রাইভওয়েতে রাখা গাড়ির কাছে যেতে হলে এই দরজা পার হতে হবে জেনারেলকে।

টানেলের দরজা দড়াম করে খুলে গেল, বিরাট ভুঁড়ি নিয়ে প্যাসেজে বেরিয়ে এল উ নিমুচি। ঢ্যাঙা এক লোক তার পিছু নিয়ে আসছে, পরনে ভাঁজ নষ্ট হওয়া ইউনিফর্ম।

'লেফটেন্যান্ট উলুয়ে! লেফটেন্যান্ট উলুয়ে!' হাঁক-ডাক শুরু করল জেনারেল, এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজছে। 'শয়তানটা গেল কোথায়? ওই শালা, বানচোত, কোথায় গেলি?' রাগে মেঝেতে পা ঠুকল সে।

কেউ সাড়া দিচ্ছে না।

'সার্জেন্ট! গর্দভের লেজটাকে খুঁজে বের করো, বলো ওয়াইন সেলারের দরজায় ডিউটি দিতে হবে–খেয়াল রাখতে হবে কর্নেল

হুদার কখন কী লাগে। এ-ও জানাও যে আমার সঙ্গে দেখা হলে লাথ মেরে আমি তার কিডনি ফাটিয়ে দেব, নিজের পোস্টে না থাকার অপরাধে। যাও, বলো গিয়ে!'

হনহন করে কিচেনের দিকে চলে গেল সার্জেন্ট।

ভারী শরীর নিয়ে দুপদাপ শব্দে রানার দিকে এগিয়ে আসছে জেনারেল।

বিশ

অপেক্ষা করবে রানা, যতক্ষণ না ওকে পাশ কাটিয়ে কয়েক ইঞ্চি সামনে এগোবে জেনারেল। তারপর তার বুলেট আকৃতির মাথায় ভাঁজ করা আঙুল দিয়ে প্রচণ্ড গাট্টা মারবে, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাবে সে।

কিন্তু পাঁচ ফুট দূর থাকতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল জেনারেল, ষষ্ঠইন্দ্রিয় সতর্ক করে দিয়েছে। এমন ভঙ্গিতে পজিশন নিল ঠিক যেন একজন ব্যান্টামওয়েট বক্সার, চোখ সরু করে গাঢ় ছায়ার ভিতর কী যেন খুঁজছে।

এক সেকেন্ড পর বোঝা গেল, আনআর্মড কমব্যাটের ভঙ্গিটা আসলে এক ধরনের অভিনয়, প্রতিপক্ষকে বোকা বানাবার চেষ্টা। কারণ অকস্মাৎ হিপ হোলস্টারে হাত চলে গেল তার। ছায়ার ভিতর রানাকে দেখে ফেলেছে সে।

রানার শরীরেও বিদ্যুৎ খেলে গেল, বাম বাহুতে স্ট্র্যাপ দিয়ে

আটকানো ছুরিটা হাতে চলে এল এক পলকে। লোকজন চলে আসবে, তাই আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে চায় না ও।

হোলস্টার থেকে বেরিয়ে আসছে পিস্তল, ছুরিটা ছুঁড়ল রানা। ব্যথায় ককিয়ে উঠল জেনারেল, অস্ত্রটা খসে পড়ল হাত থেকে। কবজি এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিয়েছে ছুরিটা।

ছুরির হাতল ধরে সবেগে টান দিল নিমুচি, ব্যথাটা সহ্য করবার চেষ্টায় বাঘের মত গর্জে উঠল। ছায়ার ভিতর থেকে লাফ দিয়ে রানাকে বেরিয়ে আসতে দেখল সে, অমনি ধারাল অস্ত্রটা ছুঁড়ল ওর দিকে।

উড়ন্ত অবস্থাতেই শরীর বাঁকিয়ে ছুরিটা এড়াল রানা। পিঠের নীচ দিয়ে চলে গেল ওটা অন্ধকারে। পজিশন বদলে যাওয়ায় নিমুচির পেটে লাথি মারার সুযোগটা হারাল ও।

রানার উরুর ধাক্কা খেয়ে প্যাসেজের পাথুরে মেঝেতে ধপাস করে পড়ল নিমুচি। রানা পড়ল ঠিক তার পাশেই। দুজনেই চিৎ হয়ে। একমুহূর্ত পর শুরু হলো ধস্তাধস্তি। দুজনেই সুবিধাজনক অবস্থানে পৌঁছতে চায়।

অল্পক্ষণেই টের পেল রানা, তাবড় ভুঁড়ি থাকলে কী হবে, লোকটার শরীরে অসুরের শক্তি। তার বিদ্যুৎগতি হামলার মুখে অসহায় হয়ে পড়ল ও, পাল্টা কিছু করবার সুযোগ না পেয়ে তাকে ধরে ঝুলে থাকবার চেষ্টা করছে। কনুইয়ের গুঁতো, ঘুসি, লাথি সব যেন একসঙ্গে চালাচ্ছে নিমুচি, গলা ফাটিয়ে হাঁক-ডাকও ছাড়ছে।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে রানার মাথার পাশে মোক্ষম এক ঘুসি মারল জেনারেল। রানার অনুভূতি হলো দুনিয়াটা বিপজ্জনকভাবে দোল খাওয়ায় বমি পাচ্ছে ওর। থেঁতলানো শরীরের সমস্ত ব্যথা যেন মাথায় উঠে এল, মনে হচ্ছে অন্ধকার একটা গভীরতায় নেমে যাচ্ছে ও।

চেতনা ধরে রাখবার চেষ্টা করছে রানা। বুঝতে পারছে,

নিজের লোকজনকে ডাকছে জেনারেল। যে-কোনও মুহূর্তে কর্নেল হুদাসহ বাকি সবাই চলে আসবে। ব্যস, সব শেষ। আশ্চর্য, ফালান আর থুয়েমুয়ে করছেটা কী?

কিন্তু, রানা, তুমিই বা কী করছ? নিজেকে প্রশ্ন করল ও। পেটমোটা এক লোককে কাবু করতে সাহায্য দরকার হয় তোমার!

সেলারে নামবার দরজাটা খুলে গেল, ভিতর থেকে প্যাসেজে বেরিয়ে এল চকচকে একটা গান ব্যারেল।

দূর থেকে চকচকে ভাবটা দেখতে পেল রানা, শুনতে পেল হুঙ্কার দিয়ে কী যেন বলল কেউ—দৃশ্য ও শব্দ, দুটোই অস্পষ্ট; কেউ যেন ওকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করছে।

আরও জরুরি সমস্যা রয়েছে ওর। হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গি করল ও, তারপর লাফ দিল নিমুচিকে লক্ষ্য করে। আবার শুরু হলো ধস্তাধস্তি। জেনারেলের পাঁজরের ঠিক নীচে একটা হাঁটু গাঁথতে পেরেছে রানা। সাহায্যের জন্য চিৎকারটা বদলে গেল, নিমুচি এখন কাতর আর্তনাদ ছাড়ছে। সেই সুযোগে ডান হাতের কিনারা দিয়ে তার চিবুকের নীচে কোপ মারল ও।

রানার শরীরের নীচে ছটফট করছে নিমুচি। লোকটার নাকে-মুখে দুই হাতে ঘুসি মারল রানা একটানা পাঁচ সেকেন্ড। বেমক্কা মার খেয়ে দিশা হারিয়ে ফেলেছে নিমুচি।

ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ পেল রানা। তারপর একটা গুলি হলো। ভারী কী যেন পড়ল ধপ্ করে।

মোচড় খাচ্ছে নিমুচির দেহটা, দরদর করে রক্ত ঝরছে কবজি থেকে। তার টিউনিক ধরে যখন নিজের দিকে টানল রানা, দেখল, ল্যাগব্যাগ করছে মাথাটা ঘাড়ের উপর। ডান হাত পিছিয়ে এনে যত জোরে পারা যায় তার কণ্ঠনালীতে আঘাত করল রানা, তারপর ছেড়ে দিল টিউনিক।

জ্ঞান হারিয়ে স্থির হয়ে গেল জেনারেল।

গড়িয়ে তার উপর থেকে নীচে নামছে রানা, আরেকটা গুলি হলো। এমনভাবে ঝাঁকি খেল শরীরটা, যেন ওকেই লেগেছে বুলেটটা। আসলে ওর মাথার পিছনের দেয়ালে লেগেছে।

অজ্ঞান উ নিমুচির পায়ের কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কর্নেল হুদা, হাতে ধরা পিস্তল থেকে সামান্য ধোঁয়া বেরুচ্ছে, চোখে খুনের নেশা। তার পিছনে মেঝেতে পড়ে রয়েছে থোন ফালানের নিথর দেহ। ফালানের পিছনে আড়ষ্ট ও অনিশ্চিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার বন্ধু থুয়েমুয়ে, সাবমেশিন গানটা হাতের সঙ্গে সাঁটা।

পিস্তল বের করার সময় নেই রানার।

ডাইভ দিল ও, অবশিষ্ট শক্তি সবটুকু ব্যবহার করে। শরীর যেন একটা তীর, সেই তীরের মাথা আঘাত করল গিয়ে কর্নেল হুদার পেটে।

ভুশ্‌শ্‌ করে নিঃশ্বাস ছাড়ল পাঞ্জাবী খুনি, হোঁচট খেয়ে পিছু হটছে, মেঝেতে ঘষা লেগে দূরে সরে যাচ্ছে তার হাত থেকে সদ্য ছিটকে পড়া পিস্তলটা। ক্ষীণ উল্লাস অনুভব করল রানা। প্রচণ্ড এক রদ্দা চালাল হুদার ঘাড় লক্ষ্য করে। পাশ ফিরে মার থেকে বাঁচার চেষ্টা করল লোকটা, ফলে আঘাতটা লাগল তার আহত বাম কাঁধে।

তীব্র ব্যথাটা আরও যেন আরও শক্তি এনে দিল হুদাকে। একেই বুঝি বলে মরণ পণ চেষ্টা। লম্বা হাত দুটো তুলে রানার গলা টিপে ধরল সে।

গলা থেকে হাত ছাড়াবার চেষ্টা না করে হুদার অপলক, ক্রুদ্ধ চোখে তর্জনী সেঁধিয়ে দিল রানা। চেঁচিয়ে উঠে গলা ছেড়ে দিল হুদা। তারপর শুরু হলো ধস্তাধস্তি, দুজনেই মরিয়া হয়ে চরম আঘাত করবার সুযোগ খুঁজছে। এক সময় শরীরটাকে গড়িয়ে দিল হুদা, তার সঙ্গে রানাও গড়াচ্ছে।

হঠাৎ দড়াম করে একটা দরজা খোলার আওয়াজ শুনল রানা। তারপর সদর দরজার ওদিক থেকে ছুটন্ত পায়ের শব্দ ভেসে এল, ওর দিকেই আসছে। কর্কশ ও দুর্বোধ্য স্বরে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল। হুদার পাঁজর লক্ষ্য করে কনুই চালাল ও। গুঁতো খেয়ে গুঙিয়ে উঠল হুদা, তবে রানার ঘাড়ে হাত পেঁচিয়ে টান দিল নিজের দিকে।

পরমুহূর্তে ওয়াইন সেলার-এর ঢালু র‍্যাম্প বেয়ে গড়াতে শুরু করল হুদা, তার সঙ্গে রানাও। প্রথমে একটা গুলির শব্দ শুনল ও। সঙ্গে সঙ্গে আরও এক পশলা। তারপর উপরটা নীরব হয়ে গেল।

টানেলের পাথুরে দেয়াল, নীচের কর্কশ আলো ও নিজের সঙ্গে সেঁটে থাকা হুদার মুখ ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না রানা। দেয়ালে বাড়ি খেল মাথাটা, ঝাপসা হয়ে গেল দৃষ্টি। গড়িয়ে আরও তিন কি চার ফুট নামল ওরা। খুনিটার হাত আবার ওর গলা পেঁচিয়ে ধরে চাপ দিচ্ছে।

অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে রানা। ভাবল, আমি তা হলে মারা যাচ্ছি। তা সত্ত্বেও ট্রেনিং পাওয়া মস্তিষ্ক হাল ছাড়তে দিতে রাজি নয়, সমস্ত ইচ্ছাশক্তি এক করতে বলছে ওকে, পরামর্শ দিচ্ছে কানের কাছে ঝিনঝিন অনুভূতিটাকে গ্রাহ্য না করতে।

হাত মুঠো করে হুদার আহত বাম কাঁধে আবার একটা ঘুসি মারল রানা। মনে হলো, ঘুসিটায় জোর ছিল না। তবে গলায় একটু ঢিল অনুভব করল রানা। একই জায়গায় আবার মারল। গুঙিয়ে উঠল হুদা। কাঁচা ক্ষতে টোকা দিলেই জান বেরিয়ে যায়, সেখানে রানা লোহার মত শক্ত মুঠো দিয়ে ঘুসি মারছে। আবার মারল রানা। আবার।

রানার গলায় হুদার হাত নিস্তেজ, নির্জীব হয়ে পড়ল। এবার দুই হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে তার কণ্ঠা চেপে ধরল রানা। ক্রমশ চাপ বাড়াতে শুরু করল স্পর্শকাতর করটেড আর্টেরিতে, নিঃশব্দে

প্রার্থনা করছে চাপটা যেন যতক্ষণ প্রয়োজন দিতে পারে। ওর দিকে উন্মত্ত ভাব নিয়ে তাকিয়ে থাকা মুখটা বদলে যেতে দেখছে ও, ধীরে ধীরে ভাবলেশহীন হয়ে উঠল। দীর্ঘদেহী পিসিআই কর্মকর্তার শক্তিশালী শরীরটা হঠাৎ করেই রানার হাতের তলায় নিস্তেজ হয়ে গেল। গায়ের উপর থেকে তাকে ঠেলে ফেলে দিল রানা।

ঠাণ্ডা দেয়ালে হেলান দিল রানা। নিজেকে একটা ফাটা বেলুনের মত লাগছে। রক্ত-মাংসের বেলুন, ফুটো করে ফাটিয়ে দেওয়ার আগে নৃশংসভাবে থেঁতলানো হয়েছে।

সেলারের আলো যেন বার বার জ্বলছে আর নিভছে। এই মুহূর্তে এক ইঞ্চি নড়বার শক্তিও যেন অবশিষ্ট নেই রানার শরীরে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে গোঙানোর আওয়াজ বেরুচ্ছে।

তারপর হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেল।

জ্ঞান ফেরার পর নিজের চারপাশে লোকজনের কথা শুনতে পেল রানা। সাবধানে চোখ খুলে উপরে তাকাল ও। র‍্যাম্পের মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে থোন ফালান ও থুয়েমুয়ে, হাত ও মুখ নেড়ে কী আলাপ করছে বোঝা যাচ্ছে না। থুয়েমুয়ে মেশিন গান নেড়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছে, তাকে যেন শান্ত করবার চেষ্টা করছে ফালান।

ফালানের মাথার একপাশে কুৎসিত একটা ক্ষত দেখল রানা, বাম গাল রক্তে ঢাকা।

শরীরের ব্যথা অগ্রাহ্য করে মাথাটা উঁচু করল রানা, অস্পষ্টভাবে স্মরণ করতে পারছে কেউ একজন সদর দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকেছিল, বোধহয় কিছু গোলাগুলিও হয়েছে।

গড, ইয়েস! সব মনে পড়ে যেতেই সটান সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা। কে ফোঁপাচ্ছে খোঁজ নিতে হবে না? সেলারের কোথাও থেকেই ভেসে আসছে আওয়াজটা। কোনও মহিলার গলা।

নিশ্চয়ই ম্যাডাম ইরাবতি।

দেয়াল ধরে টানেলের নীচে নামছে রানা। স্থির পড়ে থাকা কর্নেল হুদাকে টপকে এসে পাশে হাঁটু গাড়ল, পালস দেখবে।

পেল না।

ওয়াইন সেলারটা খুব বড় নয়। টেবিলটা অবশ্য বড়। বৃদ্ধা ইরাবতিকে তাতে শুইয়ে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। টেবিলের একধারে রাখা মাঝারি আকারের একটা কেটলি রানার দৃষ্টি কেড়ে নিল। ওটার ভিতরে গরম কিছু আছে, নলের মুখ থেকে একটু একটু বাষ্প বেরুতে দেখল ও। কেটলির পাশে একটা গ্লাস।

ইরাবতির দিকে চোখ ফেরাল রানা, সামান্য টলছে। হাঁটু ঢাকা গাউন পরে আছেন তিনি। গাউনের মত ব্লাউজটাও ভাল কোনও দর্জিকে দিয়ে সেলাই করা। মোজা পরা পা খালি নয়, কালো ও নরম চামড়ার মোকাসিন দিয়ে ঢাকা। মাথায় জড়ানো একটা সিল্ক স্কার্ফ।

ফালানের মুখ থেকে আগেই শুনেছে, তাই জিনিসটা দেখামাত্র চিনে ফেলল ও। কালো চামড়ার বেল্টটা বৃদ্ধার দামি ড্রেসের সঙ্গে মানাচ্ছে না।

রানা দেখল ওর দিকে আতঙ্ক ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন বৃদ্ধা। কেন, তাঁর বুঝতে পারা উচিত নয় যে সাহায্য করতে এসেছে সে? ও, আচ্ছা, ওর মুখ!

রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে হাসল রানা। 'ম্যাডাম ইরাবতি,' নরম সুরে বলল ও। 'আমি রানা এজেন্সি থেকে আসছি। আমার নাম মাসুদ রানা, সিতওয়ে আরাকানীর বন্ধু। তিনি আপনাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।'

ইরাবতির চেহারায় কোনও পরিবর্তন নেই।

আবার বলল রানা, 'এখানে আমাকে নিয়ে এসেছে থোন ফালান...'

এবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া হলো। ‘ফালান!’ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন তিনি। তারপর রানাকে হতভম্ব করে দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললেন।

ছুটে রানার পাশে চলে এল ফালান। ‘ম্যাডাম! ওহ্, ম্যাডাম!’ ইউনিফর্মের আস্তিন দিয়ে চোখ মুছল সে, ছুরি বের করে ইরাবতির হাত ও পায়ের বাঁধন কেটে দিচ্ছে। ‘আপনার খাস নওকর হাজির, ম্যাডাম, আপনি তাকে হুকুম করুন। জী, ম্যাডাম, হুকুম করুন!’

দুর্বল হাতটা ফালানের দিকে বাড়ালেন বৃদ্ধা, দু’চোখ থেকে পানি গড়াচ্ছে। ‘তুমি বাছা জখম হয়েছ,’ ফিসফিস করলেন তিনি, জরাগ্রস্ত আঙুল দিয়ে তার গাল স্পর্শ করলেন।

একুশ

ভোর চারটে।

পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স কর্মকর্তা কর্নেল আজমল হুদা, বার্মিজ জেনারেল উ নিমুচি, তার দুজন এইড ও মিউচুয়াল ভেঞ্চারের নয়জন গার্ড, সব মিলিয়ে তেরোজন। তা থেকে বিয়োগ হবে হুদা, বাড়ির ভিতর যে দুজন ছিল, যে দুজন বাড়ির বাইরে টহলে ছিল ও মাথাগরম এক গার্ড—গুলির আওয়াজ শুনে ছুটে এসে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়েছিল।

জেনারেল উ নিমুচি ওদের হাতে বন্দি। রশি দিয়ে হাত-পা

বেঁধে ম্যাডাম ইরাবতির বোন মায়াবতী গাইনের বাড়িতে রেখে আসা হয়েছে। তাকে নিয়ে কী করা হবে এখনও ঠিক করেনি রানা। হুদার পিস্তল হাতে জেনারেলকে পাহারা দিচ্ছে অসুস্থ ফারজানা লিমার স্বামী দৌলত, দুপাশে লাঠি হাতে তার দুই ভাই। লিমা খামারবাড়ির দোতলার একটা কামরায় শুয়ে আছে।

কর্নেল হুদা সহ বাকি সবার লাশ খেতে নিয়ে গিয়ে মাটিচাপা দেওয়া হয়েছে। খামারবাড়ি থেকে রক্তের সমস্ত চিহ্নও মুছে ফেলা হয়েছে।

রানার সমস্যা বাকি ছয়জন মার্সেনারি গার্ড। জঙ্গল ও হাইওয়েতে থাকা তাদের কয়েক শো সঙ্গীর কথাও ভোলেনি ও। যে-কোনও মুহূর্তে লেমিয়েথনায় চলে আসতে পারে তারা।

আপাতত কাজ চালাবার মত একটা সমাধান দিল রানা, খামারবাড়ির সুস্থ-সবল পুরুষরা যার কাছে যা আছে তাই নিয়ে চারদিকে পাহারা দিক। দেখা গেল বেশিরভাগ লোকের কাছে লাঠি ছাড়া আর কিছু নেই, অন্য কিছুর ব্যবহার তারা জানে না।

ম্যাডাম ইরাবতি এই মুহূর্তে বিছানায় শুয়ে ব্যথায় কাতরাচ্ছেন। তাঁর দেখাশোনা করছে নাহিদা।

আধ ঘণ্টা আগে, ম্যাডাম ইরাবতির সামনেই, কালো বেল্টের ফাঁপা অংশে লুকানো পেন ড্রাইভটা বের করেছে রানা। ইন্টারনেট কানেকশন সহ পামটপ কমপিউটার আছে, কাজেই পিসিআই অফিস থেকে শায়লা শারমিনের নিয়ে আসা ডকুমেন্টটা আসলে কী তা জানতে ওর কোনও সমস্যা হয়নি।

এরকম স্বয়ংসম্পূর্ণ ডকুমেন্ট খুব কমই দেখেছে রানা। বঙ্গোপসাগরের ম্যাপ দিয়ে শুরু—সাগরের কতটুকু বাংলাদেশের অংশে পড়েছে, সাগরের গভীরতা কোথায় কতটা গভীর, আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমা আইন কী বলে ইত্যাদি খুঁটিনাটি তথ্য সবই ছক ও নকশাসহ পরিবেশন করা হয়েছে।

গোটা ব্যাপারটা বাংলাদেশকে নিয়ে গভীর এক চক্রান্ত। বাংলাদেশের অরক্ষিত সমুদ্রসীমার ভিতর, সাগরের নীচে, সঞ্চিত রয়েছে বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেল। পঞ্চাশ বছর আগে, সেই সময়কার সেরা বিশেষজ্ঞরা, এই সম্পদ আবিষ্কার করেছেন। রক্ষণশীল হিসাবে বলা হয়েছে ওই পরিমাণ তেল দিয়ে বাংলাদেশ বহু বছর চলতে পারবে, বাড়তি লোকসংখ্যার চাপ সত্ত্বেও রপ্তানী করতেও পারবে।

ডকুমেন্টটা দ্বিতীয়বার চোখ বুলাবার সময় আপনমনে বিড়বিড় করল রানা: 'ওহ্, গড, আমরা দেখছি বড়লোক হয়ে যাচ্ছি! অবশ্য আগেই এসে যেত সচ্ছলতা, যদি একের পর এক অসৎ, অদক্ষ, অক্ষম সরকার এসে চুরি, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের স্বর্গ না বানাত দেশটাকে!'

শুনে ইরাবতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমার শারমিনের আত্মত্যাগ তা হলে বৃথা যায়নি। আল্লাহর কাছে হাজার শোকর।'

'তার কাছে আমরা সবাই ঋণী হয়ে থাকলাম,' আন্তরিক সুরে বলল রানা।

এই মুহূর্তে ডকুমেন্টের একটা করে কপি পামটপ কমপিউটার ও ইনটারনেট কানেকশনের সাহায্যে জাতিসংঘের নতুন কর্ণধার বান কি মুন, বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান, ও মায়ানমারের প্রধান সামরিক প্রশাসক জেনারেল থুইতাম মিনায়া-র নামে রাজধানী ইয়াংগনে পাঠাচ্ছে রানা।

কাজটা শেষ হওয়ার এক ঘণ্টা পর, ভোর সাড়ে পাঁচটায়, বার্মিজ মিলিটারি পুলিশের হাতে অ্যারেস্ট হয়ে গেল রানা।

ফাঁকা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে দশ-পনেরোজন সৈন্যের একটা গ্রুপ গটগট করে ঢুকল বাড়ির ভিতর, নেতৃত্ব দিচ্ছে একজন

ক্যাপটেন। সে জানাল, বাড়ির ভিতর ও বাইরে সবাইকে নিরস্ত্র করা হচ্ছে, তাদের কাজে কেউ বাধা দিলে তার পরিণতি ভাল হবে না।

তার কথা শুনে বোঝা গেল বাড়ির বাইরেও একটা গ্রুপ পজিশন নিয়েছে।

রানার কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে সবাই যে যার অস্ত্র নামিয়ে রাখল মেঝেতে।

তারপর ক্যাপটেন জানতে চাইল, 'জেনারেল উ নিমুচি কোথায়?'

'তিনি পালিয়েছেন,' কেউ সত্যি কথাটা বলে ফেলার আগে তাড়াতাড়ি জবাব দিল রানা। বিমা হিসাবে নিমুচিকে যতক্ষণ পারা যায় নিজেদের হাতে রাখতে চাইছে ও।

'আপনি কে?' রানার দিকে কটমট করে তাকাল ক্যাপটেন।

'মাসুদ রানা, বাংলাদেশী...' শুরু করল রানা।

'আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসক জেনারেল থামুয়া মোয়েন-এর নির্দেশে আপনাকে অ্যারেস্ট করা হলো,' বলল ক্যাপটেন। 'চলুন, আমাদের সঙ্গে সেনা ছাউনিতে যেতে হবে আপনাকে—কাছেই।' তার ইঙ্গিতে একজন মিলিটারি পুলিশ এগিয়ে এল রানার হাতে হাতকড়া পরাবার জন্য।

হাত না বাড়িয়ে রানা জানতে চাইল, 'আমার অপরাধ?'

'অসংখ্য। তার মধ্যে একটা হলো, আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসক জেনারেল উ নিমুচির সঙ্গে দুর্ব্যবহার।'

'অভিযোগটা কে করল, ক্যাপটেন?' জানতে চাইল রানা। 'উ নিমুচি তো পালিয়েছে।'

'আপনি বেশি কথা বলেন!' গর্জে উঠল ক্যাপটেন। তারপর ফালানের দিকে তাকিয়ে আবার বলল, 'খামারবাড়ির বাকি সবাইকেও গৃহবন্দি করা হলো। ভুলেও কেউ যেন পালাতে চেষ্টা

না করে।' আবার রানার দিকে তাকাল সে। 'নিন, হাত বাড়ান!'

হঠাৎ চারদিকে মহা শোরগোল শুরু হয়ে গেল। প্রথমে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল মায়ানমার এয়ারফোর্সের এক জোড়া জেট ফাইটার। সেটার পিছু নিয়ে এল চার-পাঁচটা হেলিকপ্টার গানশিপ, ওদের কাছ থেকে একটু দূরে ল্যান্ড করল সেগুলো।

'স্টপ ফায়ার! বার্মিজ আর্মি এসে গেছে! যে যার অস্ত্র ফেলে দিন,' লাউড হেইলারে বারবার ঘোষণা করা হচ্ছে। 'বিশেষ করে জেনারেল উ নিমুচির প্রতি অনুগত সৈন্যদের বলা হচ্ছে, তোমরা সারেন্ডার করো। সাবধান, যার কাছে অস্ত্র থাকবে তাকেই গুলি করা হবে।'

যে যার অস্ত্র ফেলে দেওয়ার পর হেলিকপ্টার গানশিপ থেকে সৈন্যরা নেমে এল, নেতৃত্ব দিচ্ছেন একজন ব্রিগেডিয়ার। 'মাসুদ রানা কে এখানে?' জানতে চাইলেন তিনি।

রানা ভাবল, স্বীকার করলে যদি গুলি করে? তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'আমি।'

রানা ও উপস্থিত সবাইকে হতচকিত করে দিয়ে ব্রিগেডিয়ার ভদ্রলোক কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে স্যালুট করলেন রানাকে। 'আপনি, মিস্টার মাসুদ রানা, সার, অনেক অপমান থেকে বাঁচিয়েছেন মায়ানমার সরকারকে। সামরিক প্রশাসকের প্রধান জেনারেল থুইতাম মিনায়া-র তরফ থেকে আপনাকে আন্তরিক ও আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ জানাতে এসেছি আমরা...'

হ্যান্ডশেকের জন্য হাতটা বাড়িয়ে দিল রানা। সেটা ধরলেন ব্রিগেডিয়ার, তারপর টান দিয়ে আলিঙ্গন করলেন ওকে।

***